রি-[illegible] ক্লাসিকস

ইছামতী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

। ১৯৫০-৫১ সালের রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ই

ন্সপূ

ICHHAMATI

a novel by

Bibhutibhusan Banerjee

Published by Mitra & Ghosh
Publishers Private Limited
10 S. C. De Street, Cal.-73
Price Rs. 9·00

পেপার-ব্যাক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৬

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও উপেন্দ্র প্রিণ্টিং প্রেস, ১৬ ভীম ঘোষ লেন, কলি-৬ হইতে সত্যহরি পান কর্তৃক মুদ্রিত

য় টাকা

উৎসর্গ

কল্যাণী

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর-সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদ্‌রি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।

মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত—দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হল্‌দে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই চখা বালির ঘাট, বন-কুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলী-মুখর বনান্তস্থলী। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু'দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েচে। ক্বচিৎ উঁচু শিমুল গাছের আঁকাবাঁকা শুক্‌নো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে, স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুল; লম্বা ধরনের ঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির বেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা; আসবাবপত্রের মধ্যে

দেখা যাবে ভাঙা নড়বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্ম-দিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়ত আকন্দঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েচে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এই সব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।

১০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েচে সবে।

পথঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখী বসে আছে বাবলা গাছের ফুলে-ভর্তি ডালে।

নালু পাল মোল্লাহাটির হাটে যাবে পান-সুপুরি নিয়ে মাথায় করে। মোল্লাহাটি যেতে নীলকুঠির আমলের সাহেবদের বটগাছের ঘন ছায়া পথে পথে। শ্রান্ত নালু পাল মোট নামিয়ে একটা বটতলায় বসে গামছা ঘুরিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

নালুর বয়স কুড়ি-একুশ হবে। কালো রোগা চেহারা। মাথার চুল বাবরি-করা, কাঁধে রঙিন্ রাঙা গামছা—তখনকার দিনের শৌখিন বেশভূষা পাড়াগাঁয়ের। এখানো বিয়ে করে নি, কারণ মামাদের আশ্রয়ে এতদিন মানুষ হচ্ছিল, হাতেও ছিল না কানাকড়ি। সম্প্রতি আজ বছর খানেক হোল নালু পাল মোট মাথায় করে পান-সুপুরি বিক্রি করে হাটে হাটে। সতেরো টাকা মূলধন তার এক মাসীমা দিয়েছিলেন যুগিয়ে। এক বছরে এই সতেরো টাকা দাঁড়িয়েছে সাতান্ন টাকায়। খেয়ে দেয়ে। নিট লাভের টাকা।

নালুর মন এজন্যে খুশি আছে খুব। মামার বাড়ির অনাদরের ভাত গলা দিয়ে ইদানীং আর নামতো না। একুশ বছর বয়সের পুরুষমানুষের শোভা পায় না অপরের গলগ্রহ হওয়া। মামীমার সে কি মুখনাড়া একপলা তেল বেশী মাথায় মাখবার জন্যে সেদিন।

মুখনাড়া দিয়ে বললেন—তেল জুটবে কোত্থেকে অত? আবার বাবরি চুল রাখা হয়েচে, ছেলের শখ কত—অত শখ থাকলে পয়সা রোজগার করতে হয় নিজে।

নালু পাল হয়তো ঘুমিয়ে পড়তো বটগাছের ছায়ায়, এখনো হাট বসবার অনেক দেরি, একটু বিশ্রাম করে নিতে সে পারে অনায়াসে—কিন্তু এই সময় ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক যেতে যেতে ওর সামনে থামলো।

নালু পাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—রায় মশায়, ভালো আছেন? পেন্নাম—

—কল্যাণ হোক। নালু যে, হাটে চললে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু সোজা হয়ে বসো। শিপটন্ সাহেব ইদিকি আসচে—

—বাবু, রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে যাবো? বড্ড মারে শুনিচি।

—না না, মারবে কেন? ও সব বাজে। বোসো এখানে।

—ঘোড়ায় যাবেন?

—না, বোধ হয় টমটমে। আমি দাঁড়াবো না।

মোল্লাহাটি নীলকুঠির বড় সাহেব শিপ্টন্কে এ অঞ্চলে বাঘের মত ভয় করে লোকে। লম্বাচওড়া চেহারা, বাঘের মত গোল মুখখানা, হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে। এ অঞ্চলের লোক চাবুকের নাম রেখেছে 'শ্যামচাঁদ'। কখন কার পিঠে 'শ্যামচাঁদ' অবতীর্ণ হবে তার কোন স্থিরতা না থাকাতে সাহেব রাস্তায় বেরুলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

এমন সময়ে আর একজন হাটুরে দোকানদার সতীশ কলু, মাথায় সর্ষে তেলের বড় ভাঁড় চ্যাঙারিতে বসিয়ে সেখানে এসে পড়লো। রাস্তার ধারে নালুকে দেখে বললে—চলো, যাবা না?

—বোসো। তামাক খাও।

—তামাক নেই।

—আমার আছে। দাঁড়াও, শিপ্টন্ সাহেব চলে যাক আগে।

—সায়েব আসচে কেডা বললে?

—রায় মশায় বলে গ্যালেন—বোসো—

হঠাৎ সতীশ কলু সামনের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখে বাড়া আর শেওড়া ঝোপের পাশ দিয়ে নিচের ধানের ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল। যেতে যেতে বললে —চলে এসো, সায়েব বেরিয়েচে—

নালু পাল পানের মোট গাছতলায় ফেলে রেখেই সতীশ কলুর অনুসরণ করলে। দূরে ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ শোনা গেল টমটমের ঘোড়ার। একটু পরে সামনের রাস্তা কাঁপিয়ে সাহেবের টমটম কাছাকাছি এসে পড়লো এবং থামবি তো থাম্,

একেবারে নালু পালের আশ্রয়স্থল ওদের বটতলায়, ওদের সামনে।

বটতলায় পানের মোট মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সাহেব হেঁকে বললে—এই! মোট কাহার আছে?

নালু পাল ও সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে কাঠ হয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। কেউ উত্তর দেয় না।

টমটমের পেছন থেকে নফর মুচি আরদালি হাঁকল—কার মোট পড়ে রে গাছতলায়?

সাহেব বললে—উট্টর ডাও—কে আছে?

নালু পাল কাঁচুমাঁচু মুখে জোড় হাতে রাস্তায় উঠে আসতে আসতে বললে—সায়েব, আমার।

সাহেব ওর দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। কোনো কথা বললে না।

নফর মুচি বললে—তোমার মোট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করছিলে ধানক্ষেতে?

—আজ্ঞে --আজ্ঞে—

সাহেব বললে—আমি জানে। আমাকে ডেখে সব লুকায়। আমি সাপ আছি না বাঘ আছি। হ্যাঁ?

প্রশ্নটা নালু পালের মুখের দিকে তাকিয়েই, সুতরাং নালু পাল ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—না সায়েব।

—ঠিক। মোট কিসের আছে?

—পানের, সায়েব।

—মোল্লাহাটির হাটে নিয়ে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—কি নাম আছে টোমার?

—আজ্ঞে, শ্রীনালমোহন পাল।

—মাথায় করো। ভবিষ্যতে আমায় ডেখে লুকাবে না। আমি বাঘ নই, মানুষ

খাই না। যাও—বুঝলে!

—আজ্ঞে—

সাহেবের টমটম চলে গেল। নালু পালের বুক তখনো টিপ্ টিপ্ করছে। বাবাঃ, এক ধাক্কা সামলানো গেল বটে আজ। সে শিস দিতে দিতে ডাকলে—ও সতীশ খুড়ো!

সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তা থেকে আরও দূরে চলে গিয়েছিল। ফিরে কাছে আসতে আসতে বললে—যাই।

—বাবাঃ, কতদুর পালিয়েছিলে? আমায় ডাকতে দেখে বুঝি দৌড় দিলে ধানবন ভেঙে?

—কি করি বলো। আমরা হলাম গরীব-গুরবো নোক। শ্যামচাঁদ পিঠে বসিয়ে দিলে করচি কি তাই বলো দিনি। কি বললে সায়েব তোমারে?

—বললে ভালোই।

—তোমারে রায় মশাই কি বলছিল?

—বলছিল, সায়েব আসচে। সোজা হয়ে বসো।

—তা বলবে না? ওরাই তো সায়েবের দালাল। কুটি-র দেওয়ানি করে সোজা রোজগারটা করেচে রায় মশাই! অতবড় দোমহলা বাড়িটা তৈরী কবলে সে বছর।

রায় মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়েরখাঁই ও প্রজাপীড়নের জন্যে এদেশের লোকে যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু মুখে কারো কিছু বলবার সাহস নেই। নিকটবর্তী পাঁচপোতা গ্রামে বাড়ি।

বিকেলের সূর্য বাগানের নিবিড় সবুজের আড়ালে ঢলে পড়েচে, এমন সময় রাজারাম রায় নিজের বাড়িতে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামলেন। নফর মুচির এক খুড়তুতো ভাই ভজা মুচি এসে ঘোড়া ধরলে। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চেয়ে দেখলেন অনেকগুলো লোক সেখানে জড়ো হয়েচে। নীলকুঠির দেওয়ানের

চণ্ডীমণ্ডপে অমন ভিড় বারো মাসই লেগে আছে। কত রকমের দরবার করতে এসেচে নানা গ্রামের লোক, কারো জমিতে ফসল ভেঙে নীল বোনা হয়েচে জোর-জবরদস্তি করে, কারো নীলের দাদনের জন্যে যে জমিতে দাগ দেওয়ার কথা ছিল তার বদলে অন্য এবং উৎকৃষ্টতর জমিতে কুঠির আমীন গিয়ে নীল বোনার জন্যে চিহ্নিত করে এসেচে—এই সব নানা রকমের নালিশ।

নালিশের প্রতিকার হোত। নতুবা দেওয়ানের চণ্ডীমণ্ডপে লোকের ভিড় জমতো না রোজ রোজ। তার জন্যে ঘুষ-ঘাষের ব্যবস্থা ছিল না। রাজারাম রায় কারো কাছে ঘুষ নেবার পাত্র ছিলেন না, তবে কার্য অন্তে কেউ একটা রুই মাছ, কি বড় একটু মানকচু কিংবা দু'ভাঁড় খেজুরের নলেন্ গুড় পাঠিয়ে দিলে ভেটস্বরূপ, তা তিনি ফেরত দেন বলে শোনা যায় নি।

রাজারামের স্ত্রী জগদম্বা এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন, পরনে, লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হতে বাউটি পৈঁছে, লোহার খাড়ু ও শাঁখা, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, দোহারা চেহারার গিন্নিবান্নি মানুষটি।

জগদম্বা এগিয়ে এসে বললেন—এখন বাইরে বেরিও না। সন্দে-আহ্নিক সেরে নাও আগে।

রাজারাম হেসে স্ত্রীর হাতে ছোট একটা থলি দিয়ে বললেন—এটা রেখে দাও। কেন, কিছু জলপান আছে বুঝি?

—আছেই তো। মুড়ি আর ছোলা ভেজেচি।

—বাঃ বাঃ, দাঁড়াও আগে হাত পা ধুয়ে নিই। তিলু বিলু নিলু কোথায়?

—তরকারি কুটচে।

—আমি আসচি। তিলুকে জল দিতে বলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রাজারাম আহ্নিক করতে বসলেন রোয়াকের একপ্রান্তে। তিলু এসে আগেই সেখানে একখানা কুশাসন পেতে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন—ঘণ্টাখানেক প্রায়। অনেক কিছু স্তব-স্তোত্র পড়লেন।

এত দেরি হওয়ার কারণ এই, সন্ধ্যা-গায়ত্রী শেষ করে রাজারাম বিবিধ

দেবতার স্তবপাঠ করে থাকেন। দেবদেবীর মধ্যে প্রতিদিন তুষ্ট রাখা উচিত মনে করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ও মা মনসাকে। এদের কাউকে চটালে চলে না। মন খুঁতখুঁত করে। এঁদের দৌলতে তিনি করে খাচ্ছেন। আবার পাছে কোন দেবী শুনতে না পান, এজন্যে তিনি স্পষ্টভাবে টেনে টেনে স্তব উচ্চারণ করে থাকেন।

তিলু এসে বললে—দাদা, ডাব খাবে এখন ?

—না। মিছরির জল নেই ?

—মিছরি ঘরে নেই দাদা।

—ডাব থাক, তুই জলপান নিয়ে আয়।

তিলু একটা কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ও ছোলাভাজা সর্ষের তেল দিয়ে জবজবে করে মেখে নিয়ে এলো—সে জামবাটিতে অন্তত আধ কাঠা মুড়ি ধরে। বিলু নিয়ে এলো একটা কাঁসার থালায় একথালা খাজা কাঁটালের কোষ। নিলু নিয়ে এলো এক ঘটি জল ও একটা পাথরের বাটিতে আধ পোয়াটাক খেজুর গুড়।

রাজারাম নিলুকে সস্নেহে বললেন—বোস নিলু, কাঁটাল খাবি ?

—না দাদা। তুমি খাও, আমি অনেক খেয়েচি।

—বিলু নিবি ?

—তুমি খাও দাদা।

জগদম্বা এতক্ষণে আহ্নিক সেরে এসে কাছে বসলেন—তুমি সারাদিন খেটে-খুটে এলে, খাও না জলপান। না খেলে বাঁচবে কিসে ? পোড়ারমুখো সায়েবের কুঠিতে তো ভূতোনন্দী খাটুনী।

রাজারাম বললে—কাঁচালঙ্কা নেই ? আনতে বলো।

—বাতাস করবো ? ও তিলু, তোর ছোট বৌদিদির কাছ থেকে কাঁচালঙ্কা চেয়ে আন—ডালে ধরা গন্ধ বেরুলো কেন ছাখো না, ও নেত্যপিসি ? ছোট বউ, গিয়ে ছাখো তো—

জগদম্বা কাছে বসে বাতাস করতে করতে বললেন—ওগো, জলপান খেয়ে বাইরে যেও না, একটা কথা আছে—

—কি ?

—বলচি। ঠাকুঝিরা চলে যাক।

—চলে গিয়েচে। ব্যাপার কি ?

—একটি সুপাত্র এসেচে এই গ্রামে। ঠাকুরঝিদের বিয়ের চেষ্টা ত্মাখো।

—কে বলো তো ?

—সন্নিসি হয়ে গিইছিল। বেশ সুপুরুষ। চন্দ্র চাটুয্যের দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। সে কাল চলে যাবে শুনচি—একবার যাও সেখানে—

—তুমি কি করে জানলে ?

—আমাকে দিদি বলে গেলেন যে। দুবার এসেছিলেন আমার কাছে।

—দেখি।

—দেখি বললে চলবে না। তিলুর বয়েস হোল তিরিশ। বিলুর সাতাশ। এর পরে আর পাত্তর জুটবে কোথা থেকে শুনি ? নীলকুঠির কিচিরমিচির একদিন বন্ধ রাখলেও খেতি হবে না।

—তাই যাই তবে। চাদরখানা ত্মাও। তামাক খেয়ে তবে বেরুবো।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে গেলেন না, যাওয়ার উপায় থাকবে না মহরালি মণ্ডলের সম্পত্তি ভাগের দিন, তিনিই ধার্য করে দিয়েচেন। ওরা এতক্ষণ ঠিক এসে বসে আছে—রমজান, সুকুর, প্রহ্লাদ মণ্ডল, বনমালী মণ্ডল প্রভৃতি মুসলমান পাড়ার মাতব্বর লোকেরা। ও পথে গেলে এখন বেরুতে পারবেন না তিনি।

চন্দ্র চাটুয্যে গ্রামের আর একজন মাতব্বর লোক। সত্তর-বাহাত্তর বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমির আয় থেকে ভালো ভাবেই সংসার চলে যায়। পাঁচপোতা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার কেউই চাকরি করেন না। কিছু না কিছু জমিজমা সকলেরই আছে। সন্ধ্যার পর নিজ নিজ চণ্ডীমণ্ডপে পাশা-দাবার আড্ডায় রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাটানো এঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস।

চন্দ্র চাটুয্যে রাজারামকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে বললেন—বাবাজি এসো। মেঘ না চাইতেই জল! আজ কি মনে করে ? বোসো বোসো। একহাত হয়ে যাক।

নীলমণি সমাদ্দার বলে উঠলেন—দেওয়ানজি যে, এদিকে এসে মন্ত্রীটা সামলাও তো দাদাভাই—

ফণী চক্কত্তি বললেন—আমার কাছে বোসো ভাই, এখানে এসো। তামাক সাজবো ?

রাজারাম হাসিমুখে সকলকেই আপ্যায়িত করে বললেন—বোসো দাদা। চন্দর কাকা, আপনার এখানে দেখচি মস্ত আড্ডা—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—এসো না তো বাবাজি কোনোদিন! আমরা পড়ে আছি একধারে, ছাখো না তো চেয়ে।

রাজারাম শতরঞ্চির ওপর পা দিতে না দিতে প্রত্যেকে আগ্রহের সঙ্গে সরে বসে তাঁকে জায়গা করে দিতে উদ্যত হোল। নীলমণি সমাদ্দার অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থার গৃহস্থ, সকলের মন রেখে কথা না বললে তাঁর চলে না। তিনি বললেন—দেওয়ানজি আসবে কি, ওর নিজের চণ্ডীমণ্ডপে রোজ সন্দেবেলা কাছারি বসে। আসামী ফরিয়াদীর ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় না। ও কি দাবার আড্ডায় আসবার সময় করতে পারে ?

ফণী চক্কত্তি বললেন—সে আমরা জানি। তুমি নতুন করে কি শোনালে কথা।

নীলমণি বললেন—দাবায় পাকা হাত। একহাত খেলবে ভায়া ?

রাজারাম এগিয়ে এসে হুঁকো নিলেন ফণী চক্কত্তির হাত থেকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ চন্দ্র চাটুয্যের সামনে তামাক খাবেন না বলে চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরের ঘরে হুঁকো হাতে ঢুকে গেলেন এবং খানিক পরে এসে নীলমণির হাতে হুঁকো দিয়ে পূর্বস্থানে বসলেন।

দাবা খেলা শেষ হোল। রাত দশটারও বেশি। লোকজন একে একে চলে গেল।

চন্দ্র চাটুয্যেকে রাজারাম তাঁর আগমনের কারণ খুলে বললেন। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ উজ্জ্বল দেখালো।

রাজারামের হাত ধরে বললেন—এইজন্যে বাবাজির আসা ? এ কঠিন কথা কি! কিন্তু একটা কথা বাবা। ভবানী সন্নিসি হয়ে গিইছিল, তোমাকে

সে কথাটা আমার বলা দরকার।

—বাড়ি গিয়ে আপনার বৌমাদের কাছে বলি। তিলুকে জানাতে হবে। ওরাই জানাবে—

—বেশ।

পরে স্বর নিচু করে বললেন—একটা কথা বলি। ভবানীকে এখানে বাস করাবো এই আমার ইচ্ছে। তুমি গিয়ে তোমার তিনটি বোনের বিয়েই ওর সঙ্গে দ্যাও গিয়ে—বালাই চুকে যাক। পাঁচবিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি যতুক দেবে। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্চি—

রাজারাম চিন্তিত মুখে বললেন—বাড়ি থেকে না জিগ্যেস করে কোনো কিছুই বলতে পারবো না কাকা। কাল আপনাকে জানাবো।

—তুমি নির্ভয়ে বিয়ে দাও গিয়ে। আমার ভাগ্নে বলে বলচিনে। কাটাদ' বন্দিঘাটির বাঁরুরি, এক পুরুষে ভঙ্গ, ঘটকের কাছে কুলুজি শুনিয়ে দেবো এখন। জলজলে কুলীন, একডাকে সকলে চেনে।

—বয়েস কতো হবে পাত্তরের?

—তা পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমার বোনদেরও তো বয়েস কম নয়। ভবানী সন্নিসি না হয়ে গেলি এতদিনে সাতছেলের বাপ। দ্যাখো আগে তাকে —নদীর ধারে রোজ এক ঘণ্টা সন্দে-আহ্নিক করে, তারপর আপন মনে বেড়ায়, এই চেহারা! এই হাতের গুল্!

—ভবানী রাজী হবেন তিনটি বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করতে?

—সে ব্যবস্থা বাবাজি, আমার হাতে। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

একটু অন্ধকার হয়েছিল বাঁশবনের পথে। জোনাকি জ্বলছে কুঁচ আর বাবলা গাছের নিবিড়তার মধ্যে। ছাতিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বনের দিক থেকে।

অনেক রাত্রে তিলোত্তমা কথাটা শুনলে: কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে নদীর দিকের বাঁশঝাড়ের পেছন দিয়ে। ছোট বোন বিলুকে ডেকে বললে—ও বিলু, বৌদিদি তোকে কিছু বলেচে?

—বলবে না কেন ? বিয়ের কথা তো ?

—আ মরণ, পোড়ার মুখ, লজ্জা করে না ?

—লজ্জা কি ? ধিঙ্গি হয়ে থাকা খুব মানের কাজ ছিল বুঝি ?

—তিনজনকেই একক্ষুরে মাথা মুড়তে হবে, তা শুনেচ তো ?

—সব জানি।

—রাজী ?

—সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে আমার কথা এই যে হয় তো হয়ে যাক্।

—আমারও তাই মত। নিলুর মতটা কাল সকালে নিতে হবে।

—সে আবার কি বলবে, ছেলেমানুষ, আমরা যা করবো সেও তাতে মত দেবেই।

তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশ বছর তার বয়েস হয়েচে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না ; সত্যিই তার বিয়ে হবে ? স্বামীর ঘরে সে যাবে ? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি ? ঘরে ঘরে তো এমনি হচ্চে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেচে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন ?

উৎসাহে পড়ে রাত্রে তিলুর ঘুম এল না চক্ষে। কি ভীষণ মশার গুঞ্জন বনে ঝোপে !

তিলু যে সময় ছাদে একা বসে রাত জাগছিল, সে সময় নালু পাল মোল্লা-হাটির হাট থেকে ফিরে নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে তবিল মিলিয়ে শুয়ে পড়েচে সবে।

নালু এক ফন্দি এনেচে মাথায়।

ব্যবসা কাজ সে খুব ভাল বোঝে এ ধারণা আজই হল। সাত টাকা ন' আনার পান-সুপুরি বিক্রি হয়েচে আজ। নিট লাভ এক টাকা তিন আনা। খরচের মধ্যে কেবল দু' আনার আড়াই সের চাল, আর দু' পয়সার গাঙের টাটকা

খয়রামাছ একপোয়া। আধসের মাছই নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অত মাছ ভাজবার তেল নেই। সর্ষের তেল ইদানীং আক্রা হয়ে পড়েচে বাজারে, তিন আনা সের ছিল, হয়ে দাঁড়িয়েচে চোদ্দ পয়সা; কি করে বেশি তেল খরচ করে সে?

হাতের পুঁজি বাড়াতে হবে। পান-সুপুরি বিক্রি করে উন্নতি হবে না। উন্নতি আছে কাটা কাপড়ের কাজে। মুকুন্দ দে তার বন্ধু, মুকুন্দ তাকে বুঝিয়ে দিয়েচে। ত্রিশটা টাকা হাতে জমলে সে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করে দেবে।

নালু পালের ঘুম চলে গেল। মামার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকার দায় থেকে সে বেঁচেছে! এখন সে আর ছেলেমানুষ নয়, মামীমার মুখনাড়ার সঙ্গে ভাত হজম করবার বয়েস তার নেই। নিজের মধ্যে সে অদম্য উৎসাহ অনুভব করে। এই ঝিঁঝিঁপোকার-ডাকে-মুখর জ্যোৎস্নালোকিত ঘুমন্ত রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত যেন সে দেখতে পাচ্চে। জীবনের কত দূরের পথ।

রাজারাম সকালে উঠেই ঘোড়া করে নীলকুঠিতে চলে গেলেন। নীলকুঠি যাবার পথটি ছায়াস্নিগ্ধ, বনের লতাপাতায় শ্যামল। যজ্ঞিডুমুর গাছের ডালে পাখীর দল ডাকচে কিচ্ কিচ্ করে, জ্যৈষ্ঠের শেষে এখনো ঝাড়-ঝাড় সোদালি ফুল মাঠের ধারে।

নীলকুঠির ঘরগুলি ইছামতী নদীর ধারেই। বড় থামওয়ালা সাদা কুঠিটা বড়সাহেব শিপ্‌টনের। রাজারাম শিপ্‌টনের কুঠির অনেক দূরে ঘোড়া থেকে নেমে ঝাউগাছে ঘোড়া বেঁধে কুঠির সামনে গেলেন, এবং উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে পায়ের জুতো জোড়া খুলে রেখে ঘরের মধ্যে বড় হলে প্রবেশ করলেন।

শিপ্‌টন্ ও তাঁর মেম বাদে আর একজন কে সাহেব হলে বসে আছে। শিপ্‌টন্ বললেন—দেওয়ান এডিকে এসো—Look here, Grant, this is our Dewan Roy—

অন্য সাহেবটি আহেলা বিলিতি। নতুন এসেচেন দেশ থেকে। বয়েস ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, পাদ্রিদের মত উঁচু কলার পরা, বেশ লম্বা দোহারা গড়ন। এঁর নাম কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট, দেশভ্রমণ করতে ভারতবর্ষে এসেচেন। খুব ভালো

ছবি আঁকেন এবং বইও লেখেন। সম্প্রতি বাংলার পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে বই লিখচেন। মিঃ গ্র্যাণ্ট মুখ তুলে দেওয়ানের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—Yes, he will be a fine subject for my sketch of a Bengalee gentleman, with his turban—

শিপ্‌টন্‌ সাহেব বললেন—That is a Shamla, not turban –

—I would never manage it. Oh!

—You would, with his turban and a good bit of roguery that he has—

—In human nature I believe so far as I can see him—no more.

—All right, all right—please yourself—

মিসেস্‌ শিপ্‌টন্‌—I am not going to see you fall out with each other—wicked men that you are!

মিঃ গ্র্যাণ্ট হেসে বললেন—So I beg your pardon, madam!

এই সময় ভজা মুচির দাদা শ্রীরাম মুচি বেয়ারা সাহেবদের জন্যে কফি নিয়ে এল। সাহেবদের চাকর বেয়ারা সবই স্থানীয় মুচি বাগ্দী প্রভৃতি শ্রেণী থেকে নিযুক্ত হয়। তাদের মধ্যে মুসলমান নেই বললেই হয়, সবই নিম্নবর্ণের হিন্দু। দু-একটি মুসলমান থাকেও অনেক সময়, যেমন এই কুঠিতে মাদার মণ্ডল আছে, ঘোড়ার সহিস।

রাজারাম দাঁড়িয়ে গলদ্ঘর্ম হচ্ছিলেন। শিপ্‌টন্‌ বললেন—টুমি যাও ডেওয়ান। তোমাকে ডেখে ইনি ছবি আঁকিটে ইচ্ছা করিটেছেন। টোমাকে আঁকিটে হইবে।

—বেশ হুজুর।

—ডাডন খাটাগুলো একবার ডেখে রাখো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দপ্তরখানায় কার্যরত রাজারামকে শ্রীরাম মুচি এসে ডাকলে—রায় মশায়, আপনাকে ডাকছে। সেই নতুন সায়েব আপনাকে দেখে

ছবি থাকবে—ওই দেখুন দুপুরে রোদে নদীর ধারে বিলিতি গাছতলায় কি সব টেঙিয়েছে। গিয়ে দেখুন রগড়! রায় মশায়, বড় সাহেবকে বলে মোরে একটা ট্যাকা দিতে বলুন। ধানের দর বেড়েচে, ট্যাকায় আট কাঠার বেশি ধান দেচ্ছে না। সংসার চলচে না।

—আচ্ছা, দেখবো এখন। বড় সাহেবকে বল্লি হবে না। ডেভিড সাহেবকে বলতি হবে।

রাজারাম রায় বিপন্ন মুখে নদীর ধারে গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন। গাছটা হোল ইণ্ডিয়ান-কর্ক গাছ। শিপ্‌টন্ সাহেবের আগে যিনি বড় সাহেব ছিলেন, তিনি পাটনা জেলার নারাণগড় নীলকুঠিতে প্রথমে ম্যানেজার ছিলেন। শখ করে এই গাছটি সেখান থেকে এনে বাংলার মাটিতে রোপণ করেন। সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। এখন গাছটি খুব বড় হয়েচে, ডালপালা বড় হয়ে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েচে। এ অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষ অদৃষ্টপূর্ব, সুতরাং জনসাধারণ এর নাম দিয়েচে বিলিতি গাছ।

রাজারাম তো বিলিতি গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নাঃ, মজা ঢ্যাখো একবার। এ সব কি কাণ্ড রে বাপু। ওটা আবার কি খাটিয়েচে? ব্যাপার কি? রাজারাম হেসে ফেলতেন, কিন্তু শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম ওখানে উপস্থিত। মাগী কি করে এখানে, ভালো বিপদ!

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট এক টুকরো রঙিন পেন্সিল হাতে নিয়ে টাঙানো ক্যানভাসের এপাশে ওপাশে গিয়ে দুবার কি দেখলেন। মেমসাহেবকে বললেন —Will he be so good as to stand erect and stand still, say for ten minutes, madam?

মেম বললেন—সোজা হইয়া ডাঁড়াও ডেওয়ান!

—আচ্ছা হুজুর।

রাজারাম কাঁচুমাচু মুখে খাড়া হয়ে পিঠ টান করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেই গ্র্যাণ্ট সাহেব বললেন—No, no, your Dewan wears a theatrical mask, madam. Will he just stand at ease?

মেমসাহেব হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—অটখানি লম্বা হয় না। বুক ঠিক করো।

রাজারাম এ অদ্ভুত বাংলার অর্থগ্রহণ করতে না পেরে আরও পিঠ টান করে বুক চিতিয়ে উল্টোদিকে ধনুক করে ফেলবার চেষ্টা করলেন দেহটাকে।

গ্র্যাণ্ট সাহেব হেসে উঠলেন—Oh, no my good man! This is how—বলে নিজেই রাজারামের কাছে গিয়ে তাকে হাত দিয়ে ঠেলে সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকিয়ে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

—I hope to goodness, he will stick to this! God's death!

তখনি মেমসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—I ask your pardon madam, for my words a moment ago.

মেমসাহেব বললেন—Oh, you wicked man!

রাজারাম এবার ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন। ছবিওয়ালা সাহেবটা প্রাণ বের করে দিয়েছে, মেমসাহেবের সামনে, বাবাঃ! আবার ছুঁয়ে দিল! ভেবেছিলেন আজ আর নাইবেন না। কিন্তু নাইতেই হবে। সাহেব-টায়েব ওরা ম্লেচ্ছ, অখাদ্য কুখাদ্য খায়। না নাইলে ঘরে ঢুকতেই পারবেন না।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি রেহাই পেয়ে বাঁচলেন। বা রে, কি চমৎকার করেচে সাহেবটা। অবিকল তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এখনো মুখ চোখ হয় নি। ওবেলা আবার আসতে বলেচে। আবার ওবেলা ছোঁবে না কি? অবেলায় তিনি আর নাইতে পারবেন না।

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট বিকেলে পাঁচ-পোতার বাঁওড়ের ধারের রাস্তা ধরে বড় টম্‌টমে বেড়াতে বার হলেন। সঙ্গে ছোট সাহেব ডেভিড ও শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম। রাস্তাটি সুন্দর ও সোজা। একদিকে স্বচ্ছতোয়া বাঁওড় আর একদিকে ফাঁকা মাঠ, নীলের ক্ষেত, আউশ ধানের ক্ষেত। গ্র্যাণ্ট সাহেব শুধু ছবি-আঁকিয়ে নয়, কবি ও লেখকও। তাঁর চোখে পল্লী-বাংলার দৃশ্য এক নতুন জগৎ খুলে দিলে। বন্ধনহীন উদাস মাঠের ফুল-ভর্তি সোঁদালি গাছের রূপ,

ফুল ফোটা বন-ঝোপে অজানা বন-পক্ষীর কাকলী—এসব দেখবার চোখ নেই ওই হাঁদামুখো ডেভিডটার কি গোঁয়ার-গোবিন্দ শিপ্‌টনের। ওরা এসেচে গ্রাম্য ইংলণ্ডের চাষাভুষো পরিবার থেকে। ওয়েস্টার্ন মিডল্যাণ্ডের ব্লাই ও ফেয়ারিং-ফোর্ড গ্রাম থেকে। এখানে নীলকুঠির বড় ম্যানেজার না হোলে ওরা পানটকস্ ম্যানরের জমিদারের অধীনে লাঙল চষতো নিজের নিজের ফার্ম হাউসে। দরিদ্র কালা আদমীদের ওপর এখানে রাজা সেজে বসে আছে। হায় ভগবান! তিনি এসেছেন দেশ দেখতে শুধু নয়, একখানা বই লিখবেন বাংলা দেশের এই জীবন নিয়ে। এখানকার লোকজনের, এই চমৎকার নদীর, এই অজানা বনদৃশ্যের ছবি আঁকবেন সেই বইতে। ইতিমধ্যে সে বইয়ের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসে গিয়েচে। নাম দেবেন, "Anglo-Indian life in Rural Bengal"। অনেক মাল-মশলা যোগাড়ও করে ফেলেচেন।

ঠিক সেই সময় নালু পাল মোল্লাহাটির হাট থেকে মাথায় মোট নিয়ে ফিরচে। আগের হাটের দিন সে যা লাভ করেছিল, আজ লাভ তার দ্বিগুণ। বেশ চেঁচিয়ে সে গান ধরেছে—

'হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে—'

এমন সময় পড়ে গেল গ্রান্ট সাহেবের সামনে। গ্রাণ্ট সাহেব ডেভিডকে বললেন—লোকটাকে ভাল করে দেখি। একটু থামাও। বাঃ বাঃ, ও কি করে?

ডেভিড সাহেব একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েচে কথাবার্তার ধরনে। ঠিক এ দেশের গ্রাম্য লোকের মত বাংলা বলে। অনেকদিন এক জায়গাতে আছে। সে মেমসাহেবের দিকে চেয়ে হেসে বললে—He can have his old yew cut down, can't he, madam?

পরে নালু পালের দিকে চেয়ে বললে—বলি ও কর্তা, দাঁড়াও তো দেখি—

নালু পাল আজ একেবারে বাঘের সামনে পড়ে গিয়েচে। তবে ভাগ্যি ভালো, এ হলো ছোট সায়েব, লোকটি বড় সায়েবের মত নয়, মারধোর করে না। মেমটা কে? বোধ হয় বড় সায়েবের।

নালু পাল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে—আজ্ঞে, সেলাম। কি বলচেন?

—দাঁড়াও ওখানে।

গ্র্যাণ্ট সাহেব বললেন—ও কি একটু দাঁড়াবে এখানে? আমি একটু ওকে দেখে নিই।

ডেভিড বললে—দাঁড়াও এখানে। তোমাকে দেখে সাহেব ছবি আঁকবে।

গ্র্যাণ্ট সাহেব বললে—ও কি করে? বেশ লোকটি! খাসা চেহারা। চলো যাই।

—ও আমাদের হাটে জিনিস বিক্রি করতে এসেছিল। You won't want him any more?

—No, I want to thank him David, or shall I—

গ্র্যাণ্ট সাহেব পকেটে হাত দিতে যেতেই ডেভিড তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে নালু পালের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—নাও, সাহেব তোমাকে বক্‌শিশ করলেন—

নালু পাল অবাক হয়ে আধুলিটা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—সেলাম, সায়েব! আমি যেতে পারি?

—যাও।

সুন্দর বিকেল সেদিন নেমেছিল পাঁচপোতার বাঁওড়ের ধারে। বন্যপুষ্প-সুরভিত হয়েছিল ঈষত্তপ্ত বাতাস। রাঙা মেঘের পাহাড় ফুটে উঠেছিল অস্ত আকাশপটে দূরবিস্তৃত আউশ ধানের সবুজ ক্ষেতের ও-প্রান্তে। কিচমিচ করছিল গাঙশালিক ও দোয়েল পাখীর ঝাঁক। কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট কতক্ষণ একদৃষ্টে অস্তদিগন্তের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে একটি শান্ত গভীর রসের অনুভূতি জেগে উঠলো। বহুদূর নিয়ে যায় সে অনুভূতি মানুষকে। আকাশের বিরাটত্বের সচেতন স্পর্শ আছে সে অনুভূতির মধ্যে। দূরাগত বংশীধ্বনির সুস্বরের মত করুণ তার আবেদন।

গ্র্যাণ্ট সাহেব ভাবলেন, এই তো ভারতবর্ষ। এতদিন ঘুরে মরেছেন বোম্বাই, পুনা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের পোলো খেলার মাঠে আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ক্লাবে। এরা এক অদ্ভুত জীব। এদেশে এসেই এমন অদ্ভুত জীব হয়ে পড়ে যে

কেন এরা! যে ভারতবর্ষের কথা তিনি 'শকুন্তলা' নাটকের মধ্যে পেয়েছিলেন (মনিয়ার উইলিয়ামসের অনুবাদে), যে ভারতবর্ষের খবর পেয়েছিলেন এডুইন আর্নল্ডের কাব্যের মধ্যে, যা দেখতে এতদূরে তিনি এসেছিলেন—এতদিন পরে এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীতীরের অপরাহ্ণটিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মহাকবিত্বময় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছেন। সার্থক হোল তাঁর ভ্রমণ।

রাজারামের ভগ্নী তিনটির বয়স যথাক্রমে ত্রিশ, সাতাশ ও পঁচিশ। তিলুর বয়স সবচেয়ে বেশি বটে কিন্তু তিন ভগ্নীর মধ্যে সে-ই সবচেয়ে দেখতে ভালো, এমন কি তাকে সুন্দরী-শ্রেণীর মধ্যে সহজেই ফেলা যায়। রঙ অবিশ্যি তিন বোনেরই ফর্সা, রাজারাম নিজেও বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তিলুর মধ্যে পাকা সবরি কলার মত একটু লাল্‌চে ছোপ থাকায় উনুনের তাতে কিংবা গরম রৌদ্রে মুখ রাঙা হয়ে উঠলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। তন্বী, সুঠাম, সুকেশী,—বড় বড় চোখ, চমৎকার হাসি। তিলুর দিকে একবার চাইলে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। তবে তিলু শান্ত পল্লীবালিকা, ওর চোখে যৌবনচঞ্চল কটাক্ষ নেই, বিয়ে হোলে এতদিন ছেলেমেয়ের মা ত্রিশ বছরের অর্ধপ্রৌঢ়া গিন্নী হয়ে যেতো তিলু। বিয়ে না হওয়ার দরুন ওদের তিন বোনেই মনে-প্রাণে এখনো সরলা বালিকা।—আদরে-আবদারে, কথাবার্তায়, ধরণ-ধারণে—সব রকমেই।

জগদম্বা তিলুকে ডেকে বললেন—চাল কোটার ব্যবস্থা করে ফেলো ঠাকুরঝি।

—তিল?

-দীনু বুড়িকে বলা আছে। সন্দেবেলা দিয়ে যাবে। নিলুকে বলে দাও বরণের ডালা যেন গুছিয়ে রাখে। আমি একা রান্না নিয়েই ব্যস্ত থাকবো।

—তুমি রান্নাঘর ছেড়ে যেও না। যজ্ঞিবাড়ির কাণ্ড। জিনিসপত্তর চুরি যাবে।

তিন বোনে মহাব্যস্ত হয়ে আছে নিজেদের বিয়ের যোগাড় আয়োজনে। ওদের বাড়িতে প্রতিবেশিনীরা যাতায়াত করচেন। গাঙ্গুলীদের মেজ বৌ বল্লে ও ঠাকুরঝি, বলি আজ যে বড্ড ব্যস্ত, নিজেরা বাসরঘর সাজিও কিন্তু।

বলে দিচ্ছি ও-কাজ আমরা কেউ করবো না। আচ্ছা দিদি, তিলু-ঠাকুরঝিকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে! বিয়ের জল গায়ে না পড়তেই এই, বিয়ের জল পড়লে না জানি কত লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয় আমাদের তিলু-ঠাকুরঝি!

গাঙ্গুলীদের বিধবা ভগ্নী সরস্বতী বললে—বৌদিদির যেমন কথা। মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে হয় ওর নিজের সোয়ামীরই ঘোরাবে, অপর কারে আবার খুঁজে বার করতে যাচ্চে ও?

সবাই হেসে উঠলো।

পরদিন ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে শুভ গোধূলি-লগ্নে তিন বোনেরই একসঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, পাত্রও সুপুরুষ বটে। বয়স পঞ্চাশই বোধ হয় হবে কিন্তু মাথার চুলে পাক ধরেনি, গৌরবর্ণ সুন্দর সুঠাম সুগঠিত দেহ। দিব্যি একজোড়া গোঁফ। কুস্তীগিরের মত চেহারার বাঁধুনি।

বাসরঘরে মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ করে চলে যাওয়ার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—তিলু, তোমার বোনেদের সঙ্গে আলাপ করাও।

তিলোত্তমার গৌরবর্ণ সুঠাম বাহুতে সোনার পৈঁছে, মনিবন্ধে সোনার খাড়ু, পায়ে গুজরীপঞ্চম, গলায় মুড়কি মাতুলি— লাল চেলি পরনে। পৈঁছে নেড়ে বললে—আপনি ওদের কি চেনেন না?

—তুমি বলে দাও নয়!

—এর নাম স্বরবালা, ওর নাম নীলনয়না।

—আর তোমার নাম কি?

—আমার নাম নেই।

—বলো সত্যি। কি তোমার নাম?

—তি-লো-ত্ত মা।

—বিধাতা বুঝি তিলে তিলে তোমায় গড়েচেন?

তিলু, বিলু ও নীলু একসঙ্গে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো। তিলু বললে—না গো মশাই, আপনি শাস্তরও ছাই জানেন না—

Chandra State Central Library
West

বিলু বললে—বিধাতা পৃথিবীর সব সুন্দরীর—

নিলু বললে—রূপের ভাল ভাল অংশ—

তিলু বললে—নিয়ে—একটু একটু করে—

ভবানী হেসে বললেন—ও বুঝেচি! তিলোত্তমাকে গড়েছিলেন।

তিলু হেসে বললে—আপনি তাও জানেন না।

নিলু ও বিলু একসঙ্গে বলে উঠলো—আমরা আপনার কান মলে দেবো—

তিলু বোনেদের দিকে চেয়ে বললে—ও কি? ছিঃ—

বিলু বলে—"ছিঃ" কেন, আমরা বলবো না? সতীদিদি তো কান মলেই দিয়েছে আজ। দেয়নি?

ভবানী গম্ভীর মুখে বল্লেন—সে হলো সম্পর্কে শ্যালিকা। তোমরা তো তা নও। তোমরা কি তোমাদের স্বামীর কান মলে দেবার অধিকারী? বুঝেসুজে কথা বলো।

নিলু বললে—আমরা কি, তবে বলুন।

তিলু বোনের দিকে চোখ পাকিয়ে বললে—আবার!

ভবানী হেসে বল্লেন—তোমরা সবাই আমার স্ত্রী। আমার সহধর্মিণী।

বিলু বললে—আপনার বয়েস কত?

ভবানী বললেন—তোমার বয়েস কত?

—আপনি বুড়ো।

তিলু চোখ পাকিয়ে বোনের দিকে চেয়ে বললে—আবার!

ভবানী বাঁড়ুয্যে বাস করবেন রাজারাম-প্রদত্ত জমিতে। ঘরদোর বাঁধবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েচে, আপাতত তিনি শ্বশুরবাড়িতেই আছেন অবিশ্যি। এ এক নূতন জীবন। গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে. কত তীর্থে তীর্থে ঘুরে এসে শেষে এমন বয়সে কিনা পড়ে গেলেন সংসারের ফাঁদে।

খুব খারাপ লাগচে না! তিলু সত্যি বড় ভালো গৃহিণী, ভবানী ওর কথা চিন্তা করলেই আনন্দ পান। তাঁকে যেন ও দশ হাত বাড়িয়ে ঘিরে রেখেচে

জগদ্ধাত্রীর মত। এতটুকু অনিয়ম, এতটুকু অস্থবিধে হবার জো নেই।

রোজ ভবানী বাঁড়য্যে একটু ধ্যান করেন। তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনের অভ্যাস এটি, এখনো বজায় রেখেচেন। তিলু বলে দিয়েচে,—ঠাণ্ডা লাগবে, সকাল করে ফিরবেন। একদিন ফিরতে দেরি হওয়াতে তিলু ভেবে নাকি অস্থির হয়ে গিয়েছিল। বিলু নিলু ছেলেমানুষ ভবানী বাঁড়ুয্যের চোখে, ওদের তিনি তত আমল দিতে চান না। কিন্তু তিলুকে পাশ্বার জো নেই।

সেদিন বেরুতে যাচ্চেন ভবানী, নিলু এসে গম্ভীর মুখে বললে—দাঁড়ান ও রসের নাগর, এখন যাওয়া হবে না—

—আচ্ছা, ছ্যাবলামি করো কেন বলো তো? আমার বয়েস বুঝে কথা কও নিলু।

—রসের নাগরের আবার রাগ কি!

নিলু চোখ উল্টে কুঁচকে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করলে।

ভবানী বললেন—তোমাদের হয়েচে কি জানো? বড়লোক দাদা, খেয়ে-দেয়ে আদরে-গোবরে মানুষ হয়েচো। কর্তব্য-অকর্তব্য কিছু শেখোনি। আমার মনে কষ্ট দেওয়া কি তোমার উচিত? যেমন তুমি, তেমনি বিলু। দুজনেই ধিঙ্গি, ধুরন্ধর। আর দেখ দিকি তোমাদের দিদিকে?

—ধিঙ্গি, ধুরন্ধর—এসব কথা বুঝি খুব ভালো?

—আমি বলতাম না। তোমরাই বলালে!

—বেশ করেচি। আরও বলবো।

—বলো। বলচই তো। তোমাদের মুখে কি বাধে শুনি?

এমন সময়ে তিলু একরাশ কাপড় সাজিমাটি দিয়ে কেচে পুকুরঘাট থেকে ফিরচে দেখা গেল। পেয়ারাতলায় এসে স্বামীর কথার শেষের দিকটা ওর কানে গেল। দাঁড়িয়ে বললে—কি হয়েচে?

ভবানী বাঁড়ুয্যে যেন অকূলে কূল পেলেন। তিলুকে দেখে মনে আনন্দ হয়। ওর সঙ্গে সব ব্যাপারের একটা সুরাহা আছে।

—এই দ্যাখো তোমার বোন আমাকে কি-সব অশ্লীল কথা বলচে!

তিলু বুঝতে না পারার সুরে বললে—কি কথা ?

—অশ্লীল কথা। যা মুখ দিয়ে বলতে নেই এমনি কথা।

নিলু বলে উঠলো—আচ্ছা দিদি, তুইই বল্। পাঁচালির ছড়ায় সেদিন পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীতে বলেনি 'রসের নাগর'? আমি তাই বলেছি। দোষটা কি হয়েচে শুনি? বরকে বলবো না?

ভবানী হতাশ হওয়ার সুরে বল্লেন—শোন কথা!

তিলু ছোটবোনের দিকে চেয়ে বললে—তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে হবে নিলু?

ভবানী বললেন—ও দুই-ই সমান, বিলুও কম নাকি?

তিলু বললে—না, আপনি রাগ করবেন না। আমি ওদের শাসন করে দিচ্চি। কোথায় বেরুচ্চেন এখন?

—মাঠের দিকে বেড়াতে যাবো।

—বেশিক্ষণ থাকবেন না কিন্তু—সন্দের সময় এসে জল খাবেন। আজ বৌদিদি আপনার জন্যে মুগতক্তি করচে—

—ভুল কথা। মুগতক্তি এখন হয় না। নতুন মুগের সময় হয়, মাঘ মাসে।

—দেখবেন এখন, হয় কি না। আসবেন সকাল সকাল, আমার মাথার দিব্যি—

নিলু বললে—আমারও—

তিলু বললে—যা, তুই যা।

ভবানী বাড়ির বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। শরৎকাল সমাগত, আউশ ধানের ক্ষেত শূন্য পড়ে আছে ফসল কেটে নেওয়ার দরুন। তিৎপল্লার হলদে ফুল ফুটেচে বনে বনে ঝোপের মাথায়। ভবানীর বেশ লাগে এই মুক্ত প্রসারতা। বাড়ির মধ্যে তিনটি স্ত্রীকে নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে হয়। তার ওপর পরের বাড়ি। যতই ওরা আদর করুক, স্বাধীনতা নেই—ঠিক সময়ে ফিরে আসতে হবে। কেন রে বাবা!

ভবানী অপ্রসন্ন মুখে নদীর ধারে এক বটতলায় গিয়ে বসলেন। বিশাল

বটগাছটি, এখানে-সেখানে সব জায়গায় ঝুরি নেমে বড় বড় গুঁড়িতে পরিণত হয়েচে। একটা নিভৃত ছায়াভরা শান্তি বটের তলায়। দেশের পাখী এসে জুটেছে গাছের মাথায়; দূরদূরান্তর থেকে পাখারা যাতায়াতের পথে এখানে আশ্রয় নেয়, যাযাবর শামকূট, হাঁস ও সিল্লির দল। স্থায়ী বাসস্থান বেঁধেচে খোড়ো হাঁস, বক, চিল, দু'চারটি শকুন। ছোট পাখীর ঝাঁক—যেমন শালিক, ছাতারে, দোয়েল, জলপিপি—এ গাছে বাস করে না বা বসেও না।

ভবানী এ গাছতলায় এর আগে এসেচেন এবং এসব লক্ষ্য করে গিয়েচেন। দু-একটা সন্ধ্যামণির জংলা ফুল ফটেচে গাছতলায় এখানে-ওখানে। ভবানী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছতলায় গিয়ে চুপচাপ বসলেন। একটু নিজন জায়গা চাই। চাষীলোকেরা বড় কৌতুহলী, দেখতে পেলে এখানে এসে উঁকিঝুঁকি মারবে আর অনবরত প্রশ্ন করবে, তিনি কেন এখানে বসে আছেন তিনি একা বসে রোজ এ-সময়ে একটু ধ্যান করে থাকেন—তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনের বহুদিনের অভ্যাস।

আজও তিনি ধ্যানে বসলেন। একটা সন্ধ্যামণি ফুলগাছের খুব কাছেই। খানিকটা সময় কেটে গেল। হঠাৎ একটা অপরিচিত ও বিজাতীয় কণ্ঠস্বরে ভবানী চমকে উঠে চোখ খুলে তাকালেন। একজন সাহেব গাছের গুঁড়ির ওদিকে একটা মোটা ঝুরি ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাহেবটি আর কেউ নয়, কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট—তিনি বটগাছের শোভা দূর থেকে দেখে ভাল করে দেখবার জন্যে কাছে এসে আরও আকৃষ্ট হয়ে গাছের তলায় ঢুকে পড়েন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ ধ্যানরত ভবানীকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, An Indian Yogi!

সাহেবের টম্‌টম্ দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে; সঙ্গে কেউ নেই। ভজা মুচি সহিস টম্‌টমেই বসে আছে ঘোড়া ধরে।

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট ভবানীর সামনে এসে আশ্বাসের সুরে বললেন—Oh, I am very sorry to disturb you. Please go on with your

meditations! ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি সাহেবকে দু'একদিন এর আগে যে না দেখেচেন এমন নয়, তবে এত কাছে থেকে আর কখনো দেখেননি।

—I offer you my salutations—I wish I could speak your tongue.

বটতলায় কি একটা ব্যাপার হয়েচে বুঝে ভজা মুচি টম্‌টমের ঘোড়া সামলে ওখানে এসে হাজির হোল। সেও ভবানীকে চেনে না। এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—পেরনাম হুই বাবাঠাকুর! ও সাহেব ছবি আঁকে কিনা, তাই দেখুন সক্কালবেলা কুঠি থেকে বেরিয়ে মোরে নিয়ে সারাদিন বন-বাদাড় ঘোরচে। আপনাকে দেখে ওর ভাল লেগেচে তাই বলচে। ভবানী হাত জুড়ে সাহেবকে নমস্কার করলেন ও একটু হাসলেন।

গ্র্যাণ্টও দেখাদেখি সেভাবে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, হোল না! বল্লেন—Let me not disturb you—I sincerely regret, I have trespassed into your nice sanctuary. May I have the permission to draw your sketch?—You man, will you make him understand? ভজা মুচিকে গ্র্যাণ্ট সাহেব হাত-পা নেড়ে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ভজা মুচি ভবানীর দিকে চেয়ে বলল—ও বলচে আপনার ছবি আঁকবে। মুই জানি কি না, এই সাহেবটা ওই রকম করে—একটুখানি চুপটি মেরে বসুন—

কি বিপদ! একটু ধ্যান করতে বসতে গিয়ে এ আবার কোন্ হাঙ্গামা এসে হাজির হোল ছাখো। কতক্ষণ বসতে হবে? মরুক গে, দেখাই যাক্ রগড়। ভবানী বসেই রইলেন।

গ্র্যাণ্ট সাহেব ভজা মুচিকে বললেন—Don't you stand agape,—just go on and bring my sketching things from the cart—

পরে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—যাও—

এতদিনে ঐ কথাটি গ্র্যাণ্ট ভালো করে শিখেচেন।

দেরি হোল বাড়ি ফিরতে, সুতরাং ভবানী নিজের ঘরটিতে ঢুকে দেখলেন তিলু দোরের চৌকাঠে কি একটা নেকড়া দিয়ে পুঁছচে। ভবানী বললেন—কি ওখানে ?

তিলু মুখ না তুলেই বললে—রেড়ির তেল পড়ে গেল, পিদিমটা ভাঙলো, জল পড়লো মেজেতে।

এ-সময়ে সমস্ত পল্লীগ্রামে দোতলা প্রদীপ বা সেজ ব্যবহার হোত—তলায় জল থাকতো, ওপরের তলায় তেল। এতে নাকি তেল কম পুড়তো। ভবানী দেখলেন তাঁর খাটের তলায় দোতলা পিদিমটা ছিট্‌কে ভেঙে পড়ে আছে।

—সবই আনাড়ি। ভাঙলে তো পিদিমটা ?

—আমি ভাঙিনি।

—কে ? নিলু বুঝি ?

—আজ্ঞে মশাই, না। চুপ করুন। কথা বলবো না আপনার সঙ্গে।

—কেন, কি করিচি ?

—কি করিচি, বটে! আমার কথা শোনা হোল ? সন্দের সময় এসে জল খেতে বলেছিলুম না ?

—শোনো, আসবো কি, এক মজা হয়েচে, বলি। কি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম যে!

তিলু কৌতূহলের দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বিপদ ? সাপ-টাপ তাড়া করেনি তো ? খড়ের মাঠে বড্ড কেউটে সাপের ভয়—

—না গো। সাপ নয়, এক পাগলা সায়েব। টম্‌টমের সইস বললে নীলকুঠির সায়েবদের বন্ধু, দেশ থেকে বেড়াতে এসেচে। আমি বটতলায় বসে আছি, আমার সামনে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়েছে। কি সব হিট্ মিট্ টিট্ বলতে লাগলো। সইসটা বললে—আপনার ছবি আঁকবে—

—ও, সেই ছবি-আঁকিয়ে সাহেব! হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদার মুখে শুনিচি বটে।

আপনার ছবি আঁকলে ?

—আঁকলে বইকি। ঠায় বসে থাকতে হোল এক দণ্ড।

—মাগো!

—এখন বোঝো কার দোষ।

পরক্ষণেই তিলুর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে! নিখুঁত সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু অপূর্ব রূপ ওর। যেমন হাসি-হাসি মুখ, তেমনি নিটোল বাহুদুটি। গলায় খাঁজকাটা দাগগুলি কি চমৎকার—তেমনি গায়ের রঙ। সন্দেবেলা দেখাচ্ছে ওকে যেন দেবীমূর্তি।

বললেন—তোমার একটা ছবি আঁকতো সাহেব, তবে বুঝতো যে রূপখানা কাকে বলে।

—যান্। আপনি যেন—

পরে হেসে বললে—দাঁড়ান, খাবার আনি—সন্দে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই ?

—হুঁ।

—ও নিলু, শোন্ ইদিকি—আসনখানা নিয়ে আয়—

নিলু এসে আসন পেতে দিলে। গঙ্গাজলের কোশাকুশি দিয়ে গেল। তিলু যত্ন করে আঁচল দিয়ে সন্দে-আহ্নিকের জায়গাটা মেজে দিলে।

ভবানী মনে মনে যা ভাবছিলেন, আহ্নিকের সময়েও ভাবছিলেন, তা হচ্চে এই ; কালও সাহেব তাঁকে বটতলায় যেতে বলেচে। সাহেবের হুকুম, যেতেই হবে। রাজার মত ওরা। তিলুকে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? অপূর্ব সুন্দরী ও। ওর একটা ছবি যদি সায়েব আঁকে, তবে বড় ভালো হয়। কিন্তু নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। যদি কেউ টের পেয়ে যায়—তবে গাঁয়ে শোরগোল উঠবে। একঘরে হতে হবে সমাজে তাঁর শ্যালক রাজারাম রায়কে।

তিলু একখানা রেকাবীতে খাবার নিয়ে এল, নারকেলের সন্দেশ, চিঁড়ে-ভাজা আর মুগতক্তি। হেসে বললে—কেমন! মুগতক্তি যে বড় হয় না এ সময়ে! এখন কি দেবেন তাই বলুন—

নিলু বললে—এখন কান মলে দেবো যে—

—দূর! তুই যে কি বলিস কাকে, ছি! ও-কথা বলতে আছে?

বিলু আড়াল থেকে বার হয়ে এসে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। ভবানী বিরক্তির সুরে বললেন—আর এই এক নষ্টের গোড়া! কি যে সব হাসো! যা-তা মুখে কথাবার্তা তোমাদের দুজনের, বাধে না। ছিঃ!

বিলু বললে—অত ছিঃ ছিঃ করতে হবে না বলে দিচ্চি—

নিলু বললে—হ্যাঁ। আমরা অত ফেল্‌না নই যে সব্বদা ছিছিক্কার শুনতে হবে।

তিলু বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না। ওরা বড্ড আদুরে আর ছেলেমানুষ—দাদা ওদের কক্ষনো শাসন করতেন না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেচেন—

নিলু বললে—হাঁ গো বৃন্দে। তোমাকে আর আমাদের ব্যাখ্যানা কত্তে হবে না, থাক্।

বিলু বললে—দিদি সুয়ো হচ্ছে ভাতারের কাছে, বুঝলি না?

ভবানী বললে—ছিঃ ছিঃ, আবার অশ্লীল বাক্য!

বিলু রাগের সুরে বললে—হাঁ গো, সব অশ্লীল বাক্য আর অশ্লীল বাক্য! তবে কি কথা বলবো শুনি? দুটো কথা বলেচো কি না, অমনি অশ্লীল বাক্য হয়ে গেল! বেশ করবো আমরা অশ্লীল বাক্য বলবো। আপনি কি করবেন শুনি?

তিলু ধমকে বললে—যা এখান থেকে। দুজনেই যা! পান নিয়ে এসো। —আর মুগতক্তি দেবো? কেমন লাগলো? বৌদিদি আপনার জন্যে মুগতক্তি রসে ফেলচে। ভাত খাবার সময় দেবে।

—একটা কথা বলি তিলু—

—কি?

—কেউ নেই তো এখানে? দেখে এসো।

—না, কেউ নেই। বলুন—

—কাল একবার আমার সঙ্গে বটতলায় যেতে পারবে?

—কেন?

—সায়েবকে দিয়ে তোমার ছবি আঁকাবো। ঢাকাই শাড়ীখানা পরে যেও পারবে ?

—ও মা !

—কেন কি হয়েচে ?

—সে কি হয় ? দিনমানে আপনার সঙ্গে কি করে বেরুবো ? এই দেখুন আপনার সামনে দিনমানে বার হই বলে কত নিন্দে করচে লোকে। গাঁয়ে সেই বাস্তির ছাড়া দেখা করার নিয়ম নেই। আমাকে বেরুতে হয় বাধ্য হয়ে, বৌদিদি পেরে ওঠেন না একা সবদিক ভাংড়াতে।

—শোনো। ফন্দি করতে হবে। আমাকে যেতে হবে বিকেলে। আজ যে সময় গিয়েছিলুম সে সময়। তুমি নদীর ঘাটে গা ধুতে যেও ঘড়া গামছা নিয়ে। ওখান থেকে নিয়ে যাবো, কেউ টের পাবে না। লক্ষ্মীটি তিলু, আমার বড্ড ইচ্ছে।

—আপনার আজগুবী ইচ্ছে। ওসব চলে কখনো সমাজে? আপনি সন্নিসি হয়ে দেশ-বিদেশ বেড়িয়েচেন বলে সমাজের কোনো খবর তো রাখেন না। আমার যা ইচ্ছে করবার জো নেই—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিলুকে যেতে হোল। স্বামীর মনে ব্যথা দেওয়ার কষ্ট সে সইতে পারবে না। ঢাকাই শাড়ি পরে ঘড়া নিয়ে ঘাটের পথ আলো করে যাবার সময় তাকে কেউ দেখেনি, কেবল বাদা বোষ্টমের বৌ ছাড়া।

বোষ্টম-বৌ বললে—ও দিদিমণি, এ কি, এমন সেজেগুজে কোথায় ? রূপে যে ঝলক তুলেচো ?

—যাঃ, ঘাটে গা ধোবো। শাড়িখানা কাচবো। তাই—

তিলুর বুকের মধ্যে দুরদুর করছিল। অপরাধীর মত মিথ্যা কৈফিয়ৎটা খাড়া করলে। ভাগ্যিস যে বোষ্টম-বৌ দাঁড়ালো না, চলে গেল। আর ভাগ্যিস, ঘাটে শেষবেলায় কেউ ছিল না।

গ্র্যাণ্ট সাহেব দূর থেকে তিলুকে দেখে তাড়াতাড়ি টুপি খুলে সামনে এসে সম্ভ্রমের স্বরে বললেন—Oh, she is a queenly beauty ! Oh ! I am

grateful to you, sir,—

তারপর তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিলুর সলজ্জ মুখের ও অপূর্ব কমনীয় ভঙ্গির একটা আল্‌গা রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করলেন।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্টের 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্ রুর‍্যাল বেঙ্গল' নামক বইয়ের চুয়ান্ন ও সাতান্ন পৃষ্ঠায় 'এ বেঙ্গলী উম্যান' ও 'অ্যান্ ইণ্ডিয়ান ইয়োগী ইন্ দি উড্‌স্' নামক দুখানা ছবি যথাক্রমে তিলু ও ভবানী বাঁড়ুয্যের রেখাচিত্র।

গ্রামে কেউ টের পায়নি। মুশকিল ছিল, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। এ মাঠ দিয়ে ও মাঠ দিয়ে ঘুরে তিলু স্বামীকে নিয়ে এল; ভবানী বিদেশী লোক, গ্রামের রাস্তাঘাট চিনতেন না। ভজা মুচি সইস্‌কে ভবানী সব খুলে বলে বারণ করে দিয়েছিলেন। তিলু বল্লে—বাবা, কি কাণ্ড আপনার! শিশির পড়চে। ঠাণ্ডা লাগাবেন না। সায়েবটা বেশ দেখতে! আমি এত কাছ থেকে সায়েব কখনো দেখিনি। আপনি একটি ডাকাত।

—ও সব অশ্লীল কথা স্বামীকে বলতে আছে, ছি:—

রাজারাম রায়কে ছোট সাহেব ডেকে পাঠিয়েচেন। কেন ডেকে পাঠিয়েছেন রাজারাম তা জানেন। কোন প্রজার জমিতে জোর করে নীলের মার্কা মেরে আসতে হবে। রাজারাম দুর্ধর্ষ দেওয়ান, প্রজা কি করে জব্দ করা যায় তাঁকে শেখাতে হবে না। আজ আঠারো বছর এই কুঠিতে তিনি আছেন, বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েচেন শুধু এই প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।

পাঁচু সেখের বাড়ি তেঘরা সেখহাটি। সেখানকার প্রজারা আপত্তি জানিয়ে বলেচে,—দেওয়ানজি, আপনাদের খাসের জমিতে নীল বুনুন, প্রজার জমিতে এবার আমরা নীল বুনতি দেবো না।

রাজারাম জোর করে নীলের দাগ মেরে এসেচেন পাঁচু সেখের ও তার শ্বশুর বিপিন গাজি ও নবু গাজির জমিতে। এরা সে গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, বিপিন গাজির বাড়িতে আটটি ধান-বোঝাই গোলা, বিশ-পঁচিশটি হালের বলদ,

ছ' জোড়া লাঙল। তার ভাই নবু গাজি তেজারতি কারবারে বেশ ফেঁপে উঠেচে আজকাল। কম পক্ষেও একশো বিঘে আউশ ধানের চাষ হয় দুই ভায়ের জোতে। গ্রামের সব লোকে ওদের সমীহ করে চলে, এরাও বিপদে-আপদে সব সময় বুক দিয়ে পড়ে।

নবু গাজি আজ ছোট সাহেবের কাছে এসে নালিশ করেচে। তাই বোধ হয় ছোট সাহেব ডেকেচেন। কি জানি। রাজারাম ভয় খান না। নবু গাজি কি করতে পারে করুক।

ছোট সাহেব অনেকদিন এদেশে থেকে এদেশের গ্রাম্যলোকের মত বাংলা বলতে পারে। রাজারামকে ডেকে বললে—কি বলছিল নবু গাজি, ও রাজারাম!

—কি বলুন হুজুর—

—ওর তামাকের জমিতে নাকি দাগ মেরে এসেচ।

—না মারলি ও গাঁ জব্দ রাখা যাবে না হুজুর।

—ও বলচে ওদের পীরির দরগার সামনের জমিও নিয়েচ?

—মিথ্যে কথা হুজুর। আপনি ডাকান ওকে।

নবু গাজি বেশ জোয়ান মর্দ লোক, ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকও সে নিতান্ত নয়। কিন্তু ছোট সাহেব ও দেওয়ানজির সামনে সে নিরীহের মত এসে দাঁড়ালো। নীলকুঠির চতুঃসীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথা বলবার সাধ্য নেই কোনো রায়তের।

ছোট সাহেব বললে,—কি নবু গাজি, এবার গুড়-পাটালি করেছিলে?

নবু গাজি বিনম্রস্বরে বললে—না সাহেব, মোরা এবার গাছ ঝুড়িনি এখনো।

—পাটালি হলি খাতি দেবা না?

—আপনাদের দেবো না তো কাদের দেবো বলুন।

—দেবা ঠিক?

—ঠিক সাহেব।

—রাজারাম, তুমি এদের দরগাতলার জমিতে দাগ মেরেচ?

—না হুজুর। জমির নাম দরগাতলার জমি, এই পর্যন্ত। পুরানো খাতাপত্রে

তাই আছে। সেখানে পীরের দরগা বা মসজিদ আছে কি না ওকেই জিগ্যেস করুন না। আছে সেখানে তোমাদের দরগা?

—ছেল আগে। এখন নেই দেওয়ানবাবু।

—তবে? তবে যে বড্ড মিথ্যে কথা বললে সাহেবকে?

—বাবু, আপনি একটু দয়া করুন, ও জমিতি মোরা হাজৎ করি। অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির দিন পীরের নামে রেঁধে বেড়ে খাই। হয়-না-হয় আপনি একদিন দেখে আসবেন। মুই মিথ্যে কথা কেন বলবো আপনারে, আপনারা হলেন দেশের রাজা। আমার জমিটা ছেড়ে ছান দয়া করে।

ছোট সাহেব রাজারামের দিকে চেয়ে সুপারিশের সুরে বললে—যাক গে, দাও ছেড়ে জমিটা। ওরা কি যে করে বলচে—

নবু গাজি বললে—হাজৎ।

—সেটা কি আবার?

—ওই যে বললাম সায়েব, খোদার নামে ভাত গোস্ত রেঁধে ফকির মিচকিনিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যা থাকে মোরা সবাই মেলে খাই।

ছোট সাহেব খুশি হয়ে বলে উঠলো—বেশ, বেশ। আমারে একদিন দেখাতি হবে।

—তা দেখাবো সাহেব।

—বেশ। রাজারাম, ওর জমিটা ছেড়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করে চলে গেল। কিন্তু সে বোকা লোক নয়, দেওয়ান রাজারামকে সে ভালো ভাবেই চেনে। বাইরে গিয়ে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাজারাম ছোট সাহেবকে বললেন—হুজুর, আপনি কাজ মাটি করলেন একেবারে।

—কেন?

—ও জমি এক নম্বরের জমি। বিঘেতে সাড়ে তিনমণ গুঁড়ো পড়তা হবে। ও জমি ছেড়ে দিতে আছে? আর আপনি যদি অমন করে আস্কারা ছান

প্রজাদের, তবে আমারে আর কি কেউ মানবে?—না কোনো কথা আমার কেউ শুনবে ?

ছোট সাহেব শিস্ দিতে দিতে চলে গেল। রাজারাম রাগে অভিমানে ফুলে উঠলেন। তখনি সদর আমিন প্রসন্ন চক্কত্তির ঘরে গিয়ে কি পরামর্শ করলেন ত্তজনে। প্রসন্ন চক্কত্তির বয়েশ চল্লিশের ওপরে, বেশ কালো রং, দোহারা গড়ন, খুব বড় এক জোড়া গোঁফ আছে, চোখগুলো গোল গোল ভাঁটার মত। সকলে বলে অমন বদমাইশ লোক নীলকুঠির কর্মচারীদের মধ্যে আর ত্তটি নেই। হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করার ওস্তাদ। আমীনদের হাতে অনেক ক্ষমতাও দেওয়া আছে। সরল গ্রাম্য প্রজারা জরিপ কার্যের জটিল কর্মপ্রণালী কিছুই বোঝে না, রামের জমি শ্যামের ঘাড়ে এবং শ্যামের জমি যত্নর ঘাড়ে চাপিয়ে মিথ্যে মাপ মেপে নীলের জমি বার করে নেওয়াই আমীনের কাজ। প্রজারা ভয় করে, স্নতরাং ঘুষও দেয়। রাজারামের অংশ আছে ঘুষের ব্যাপারে। প্রসন্ন চক্কত্তি খেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বললে —এ রকম কল্লি তো আমাদের কথা কেউ শোনবে না, ও দেওয়ানজি !

রাজারাম সেটা ভালই বোঝেন। বললেন—তা এখন কি করা যায় বলো, পরামর্শ দাও।

—বড় সায়েবকে বলুন কথাটা।

—সে বাঘের ঘরে এখন যাবে কেডা ?

—আপনি যাবেন, আবার কেডা ?

বড় সাহেব শিপ্‌টন্ বেজায় রাশভারী জবরদস্ত লোক। ছোট সাহেবের মন একটু উদার, লোকটা মাতাল কিনা। সবাই তো তাই বলে। বড় সাহেবের কাছে যেতে সাহস হয় না যার তার। কিন্তু মানের দায়ে যেতে হোল রাজারামকে। শিপ্‌টন্ মুখে বড় পাইপ টানছেন বসে, হাতখানেক লম্বা পাইপ। কি সব কাগজপত্র দেখচেন। তক্তপোশের মত প্রকাণ্ড একটা ভারী টেবিলের ধারে কাঁটাল কাঠের একটা বড় চেয়ার। সাতবেড়ের মুসাব্বর মিস্ত্রিকে দিয়ে টেবিল চেয়ার বড় সাহেবই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, নিজের

হাতে পালিশ আর রং করেচেন। টেবিলের একধারে মোটা চামড়া-বাঁধানো একরাশ খাতা। দেওয়ালে অনেকগুলো সাহেব-মেমের ছবি। এই ঘরের এক কোণে ফায়ার-প্লেস, তেমন শীত না পড়লেও কাঠের মোটা মোটা ডালের আগুন মাঘের শেষ পর্যন্ত জ্বলে।

বড় সাহেব চোখ তুলে দেয়ালের দিকে চেয়ে বললেন—গুড্ মর্ণিং।

রাজারাম পূর্বে একবার সেলাম করেছেন, তখন সাহেব দেখতে পাননি ভেবে আর একবার লম্বা সেলাম করলেন। জিভ শুকিয়ে আসচে তার। ছোট সাহেবের মত দিলখোলা লোক নয় ইনি। মেজাজ বেজায় গম্ভীর, দুর্দান্ত বলেও খ্যাতি যথেষ্ট। না-জানি কখন কি করে বসে। সাহেবসুবো লোককে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। ভালো ছিল সেই ছবি আঁকিয়ে পাগলা সাহেবটা। তিলুর ও ভবানী ভায়ার ছবি এঁকেছিল লুকিয়ে। যাবার সময় সেই কথার উল্লেখ করে রাজারাম পাগলা সাহেবটার কাছে পঁচিশ টাকা বক্‌শিশ আদায় করেও নিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভবানী তার কিছু জানে না। যেমন সেই পাগলা সাহেব, তেমনি ভবানী, দুই-ই সমান। আপন খেয়াল মত চলে দুজনেই।

রাজারাম বললেন—আপনার আশীর্বাদে হুজুর ভালোই আছি।

—কি ডরকার আছে এখানে? বিশেষ কোনো কাজ আছে? আমি এখন খুব বিজী আছি। সময় কম আছে।

—অন্য কিছু না হুজুর। আমি তেঘরার একটা প্রজার জমিতে দাগ মেরেছিলাম, ছোট সাহেব তাকে মাপ করে দিয়েচেন।

শিপ্‌টন্ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—যা হুকুম ডিয়াছেন, টাহাই হইবে। ইহাটে টোমার কি অমান্য আছে।

বড় সাহেব এমন উল্টোপাল্টা কথা বলে, ভালো বাংলা না জানার দরুন। ভালো বালাই সব! রাজারামের হয়েছে মহাপাপ, এই সব অদ্ভুত চীজ নিয়ে ঘর করা। সাহেবের ভুল সংশোধন করে দেওয়া চলবে না, চটে যাবে। বালাইয়ের দল যা বলে তাই সই। তিনি বললেন—আজ্ঞে না, অন্যায় আর কি আছে?

তবে এমন করলে প্রজা শাসন করা যায় না।

—কি হবে না ?

—প্রজা জব্দ করা যাবে না। নীলের চাষ হবে না হুজুর।

—নীলের চাষ হবে না টবে টোমাকে কি জন্য রাখা হইল ?

—সে তো ঠিক হুজুর। আমাকে প্রজাদের সামনে অপমান করা হোলে আমার কাজ কি করে হয় বলুন হুজুর—

—অপমান ? ওগো, ইউ আর ইন্ ডিসগ্রেস ইউ ওল্ড স্কাউণ্ড্রেল, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। টোমাকে কি করিটে হইবে ?

—আপনি বুঝুন হুজুর। নবু গাজি বলে একজন বদমাইশ প্রজার জমিতে দাগ মেরেছিলাম, উনি হুকুম দিয়েচেন জমি ছেড়ে দিতে। ও গাঁয়ে আর কোনো জমিতে হাত দেওয়া যাবে না। নীলের চাষ হবে কি করে ?

—কটো জমি এ বছর ডাগ দিয়াছ, আমাকে কাল ডেখাটে হইবে। ইমপ্রেশন্ রেজিস্টার টৈরি করিয়াছ ?

—হাঁ হুজুর।

—যাও। না ডেখাইতে পারিলে জরিমানা হইবে। কাল লইয়া আসিবে।

বাস্, কাজ মিটে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তির কাছে মুখ ভারী করে ফিরে গেলেন রাজারাম।—না কিছুই হোল না। ওরা নিজের জাতের মান-অপমান আগে দেখে। পাজি শূওরখোর জাত কিনা। তোমার আমার অপমানে ওদের বয়েই গেল।

প্রসন্ন চক্কত্তি ঘুঘু লোক। আগেই জানতেন কি হবে। তামাক টানতে টানতে বললেন অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে—ছেলেবেলায় চাণক্য-শ্লোকে পড়েছিলাম দেওয়ানজি। ওদের কাছে এসে মান-অপমান দেখতে গেলে চলবে না। তা যান, আপনি আপনার কাজে যান—

—আবার উল্টে জরিমানার ব্যবস্থা—

—সে কি ! জরিমানা করে দিলে নাকি ?

—সেজন্যে জরিমানা নয়। দাগের খতিয়ান হাল সনের তৈরি হয়েচে কিনা,

কাল দেখাতি হবে, না দেখাতি পারলে জরিমানা করবে।

—ভালো। ওদের অমনি বিচার।

—উল্টে কচু গাল লাগলো—

রাজারাম অপ্রসন্ন মুখে বার হয়ে গিয়েই দেখলেন নবু গাজি দলবল নিয়ে সদর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কারকুন রামহরি তরফদারের সঙ্গে একগাল হেসে কি বলচে। রাজারামকে সে এখনও বুঝতে পারেনি। স্বয়ং সাহেবও বোঝেন না। রাজারাম গম্ভীর স্বরে হাঁক দিয়ে বললেন—এই নবু গাজি, ইদিকি শুনে যাও।

নবু গাজির হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সে আজকের ব্যাপার নিয়ে হাসছিল না। সে সাহস তার নেই। তার একটা গোরু চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারই জনৈক অসাধু কৃষাণ ন'হাটার হাটে বিক্রি করে, কি ভাবে সেই গোরুটা আবার নবু গাজি উদ্ধার করেছিল, তারই গল্প ফেঁদে নিজের কৃতিত্বে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছিল সে। রাজারামের স্বরে তাঁর প্রাণ উবে গেল। তাড়াতাড়ি এসে সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সুরে বললে—কি বাবু?

—যে জমিতে দাগ মেরেচি, সেটাতেই নীলের চাষ হবে। বুঝলে?

নবু গাজি বিস্ময়ের সুরে বললে—সে কি বাবু, ছোট সাহেব যে বললেন—

—ছোট সাহেব বলেচেন বলেচেন। বাবার ওপরে বাবা আছে। এই বড় সাহেবের হুকুম। এই আমি আসচি বড় সাহেবের দপ্তর থেকে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া চলে না, বুঝলে নবু গাজি? তোমাকে নীলকুটির চুনের গুদোমে পুরে ধান খাওয়াবো, তবে আমার নাম রাজারাম চৌধুরী, এই তোমায় বলে দিলাম। তুমি যে কি রকম—তোমার ভিটেতে ঘুঘু যদি না চরাই—

নবু গাজি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। দেওয়ান রাজারামকে ভয় করে না এমন রায়ত নীলকুঠির সীমানা সরহদ্দের মধ্যে কেউ নেই। তিনি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন। সে হাতজোড় করে বললে—মাপ করুন দেওয়ানজি, ক্ষ্যামা দ্যান। আপনি মা-বাপ, আপনি মারলি মারতে পারেন রাখলি রাখতে পারেন। মুই মুরুক্ষু মানুষ, আপনার সন্তানের মত। মোর

ওপর রাগ করবেন না। মরে যাবো তা হলি—

—এখনই হয়েচে কি? তোমার উঠোনে গিয়ে নীলের দাগ মারবো। তোমার সায়েব বাবা যেন উদ্ধার করে তোমায়। দেখি তোমার কতদূর—

নবু গাজি এসে রাজারামের পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

রাজারাম রুক্ষ স্বরে বললেন—না, আমার কাছে নয়। যাও তোমার সেই সাহেব বাবার কাছে।

নবু গাজি তবুও পা ছাড়ে না।

রাজারাম বললেন—কি?

—আপনি না বাঁচালি বাঁচবো না। মুরুক্ষু মানুষ, করে ফেলেছি এক কাজ। ক্ষ্যামা দ্যান বাবু। আপনি মা-বাপ।

—আচ্ছা, এবার সোজা হয়ে এসো। তোমার জমি ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু—

—বাবু সে আমায় বলতে হবে না। আপনার মান রাখতি মুই জানি।

- যাও, জমি ছেড়ে দিলাম। কাল আমীনবাবু গিয়ে ঠিক করে আসবে। তবে মার্কা-তোলার মজুরিটা জরিপের কুলীদের দিয়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করলে পুনরায়। চলে গেল সে কাঁটাপোড়ার বাঁওড়ের ধারে ধারে। দেওয়ান রাজারাম ও রায় সদর আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

এই রকমই চলচে এদের শাসন অনেকদিন থেকে। বড় সাহেব ছোট সাহেব যদি বা ছাড়ে, এরা ছাড়ে না। চাষীদের, সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদের ভালো ভালো জমিতে মার্কা দিয়ে আসে, সে জমিতে নীল পুঁততেই হবে। না পুঁতলে তার ব্যবস্থা আছে।

বড় সাহেব এ অঞ্চলের ফৌজদারি বিচারক। সপ্তাহে তিন দিন নীলকুঠিতে কোর্ট বসে। গোরু চুরি, ধান চুরি, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগের বিচার হবে এখানেই। বড় কুঠির সাদা হল-ঘরে এ সময় নানা গ্রাম থেকে মামলা রুজু করতে লোক আসে। তেমাথার মোড়ে সনেকপুরের মাঠে একটা ফাঁসিকাঠ টাঙানো হয়েচে সম্প্রতি। রাজারাম বলে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে যে

এবার বড় সাহেব ফাঁসির হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা পেয়েচেন গভর্ণমেণ্ট থেকে।

বড় সাহেব কিন্তু সুবিচারক। খুব মন দিয়ে উভয় পক্ষ না শুনে বিচার করে না। রায় দেবার সময় অনেক ভেবে ছ্যায়। অপরাধীর যম, লঘুপাপে গুরুদণ্ড সর্বদাই লেগে আছে। নীলকুঠির কাজের একটু ত্রুটি হলে স্বয়ং দেওয়ানেরও নিষ্কৃতি নেই। তবু ছোট সাহেবের চেয়ে বড় সাহেবকে পছন্দ করে লোকে। দেওয়ানকে বলে—টোমাকে চুনের গুডামে পুরিয়া রাখিলে তুমি জব্‌ড হইবে।

রাজারাম বলেন—আপনার ইচ্ছা হুজুর। আপনি করলি সব করতি পারেন।

—You have a very oily tongue I know, but that wouldn't cut ice this time—টোমাকে আমি জব্‌ড করিটে জানে।

—কেন জানবেন না হুজুর। হুজুর মা-বাবা—

—মা-বাবা! মা-বাবা! চুনের গুডামে পুরিলে টোমার জব্‌ড ঠিক হইয়া যাইবে।

—হুজুরের খুশি।

—যাও, ডশ টাকা জরিমানা হইল।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

রাজারামের কাজ এ ভাবেই চলে।

কুঠিতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আসবেন। দেওয়ান রাজারাম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আজ সকাল থেকে। ভেড়া, মাছ, ভালো আম ও ঘি যোগাড় করবার ভার তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে এ রকম লেগেই আছে, সাহেবসুবো অতিথি যাতায়াত করচে মাসে দু'বার তিনবার!

মুড়োপোড়ার তিনকড়িকে ডাকিয়ে এনেচেন তার একটি নধর শুওরের জন্যে। তিনকড়ি জাতে কাওরা, শুওরের ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে। দোতলা কোঠাবাড়ি, লোকজন, ধানের গোলা, পুকুর। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাকে খাতির করে চলে। রাজারামকে উপহার দেওয়ার জন্যে সে বাড়ি থেকে

ঘানি-ভাঙ্গা সর্ষের তেল এনেছিল প্রায় দশ সের, কিন্তু রাজারাম তা ফেরত দিয়েচেন, কাওরার দেওয়া জিনিস তাঁর ঘরে ঢুকবে না।

তিনকড়ি বল্লে—একটা আছে পাঁচ মাসের আর একটা আছে দু' বছরের। যেটা পছন্দ করেন বলে দেবেন। তবে বলতি নেই, আপনারা ওর সোয়াদ জানেন না, দেওয়ানবাবু, একবার খেলি আর ভুলতি পারবেন না। ওই পাঁচ মাসের বাচ্চাডা শুধু ভেজি খাবেন ঘি দিয়ে—

রাজারাম হেসে বল্লেন—দূর ব্যাটা, কি বলে! বামুনদের অমন বলতি আছে? তোদের পয়সা হলি কি হবে, জাতের স্বধম্মো যাবে কোথায়?

—বাবু, ঐ যা! আপনারা যে খান না, সে কথা ভুলে গিইচি, মাপ করবেন।

—না না, তোর কথায় আমার রাগ হয় না। তা হলি শুওরের সরবরাহ করতি হবে তোমাকেই, এই মনে রাখবা।

—মনে রাখারাখি কি, কালই আমি পাঁচ মাসের বাচ্চা আর দু'বছরেরডা পেঠিয়ে দেবো এখন। কোথায় পেঠিয়ে দেবো বলুন, এখানেই আপনার বাড়ি আমার নোকে নিয়ে আসবে?

—না না, আমার বাড়ি কেন? কুঠিতে পাঠিয়ে দেবা। ব্রাহ্মণের বাড়ি শুওর? ব্যাটাকে কি যে করি—

তিনকড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই রাজারাম বললেন—ব্রাহ্মণবাড়ি এসেচ, পেরসাদ না পেয়ে যাবে, না যেতি আছে? পয়সা হয়েচে বলে কি ধরাকে সরা দেখচো নাকি?

তিনকড়ি জিভ কেটে বললে—ও কথাই বলবেন না। বেরাহ্মণের পাত কুড়িয়ে খেয়ে মোরা মানুষ দেওয়ানজি। মুখ থেকে ফেলে দিলি সে ভাতও মাথায় করে নেবো। তবে মোর মনটাতে আজ আপনি বড্ড কষ্ট দেলেন।

—কেন, কেন?

—ভালো তেলটা এনেলাম আপনার জন্যি আলাদা ক'রে, তেলডা নেলেন না।

—নিলাম না মানে, শুদ্দুরের দান নিতি নেই আমাদের বংশে, সেজন্যে মনে

দুঃখু করো না তিনকড়ি। আচ্ছা তুমি দুঃখিত হচ্চ, কিছু দাম দিচ্চি, নিচে তেলটা রেখে যাও—

—দাম? কত দাম দেবেন?

—এক টাকা।

—তাহলি তো পাঁচসের তেলের দাম দিয়েই দেলেন কত্তা। মুই কি তেল বিক্রি করতি এনেলাম বাবুর কাছে? এট্টু দয়া করবেন না? আছিই না হয় ছোটনোক—

—না তিনকড়ি। মনে করো না সেজন্যি কিছু। একটা টাকাই তোমারে নিতি হবে। তার কম নিলি আমি পারব না। ওরে, কে আছিস। সৌরেন্দ্রনাথ—বাবা ইদিকি তিনকড়ির কাছ থেকে তেলের ভাঁড়টা নাও—

এই সময়ে ছোটসাহেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হোলো। রাজারামকে দেখে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনকড়িকে দেখে থেমে গেল।

রাজারাম দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—পাঁচ মাসের শুওরের বাচ্চা একটা যোগাড় করা গেল হুজুর—

– Oh, the sucking pig is the best পাঁচ মাসের বাচ্চা বড় হলো। মাই খায় এমন বাচ্চা দিতে পারবা না তুমি?

—না, তেমন নেই সায়েব। এর ছোট বাচ্চা কনে পাবো?

—জেলা থেকে হাকিম আসচে, এখানে খাবে। বাচ্চা হলি খাবার জুৎ হোত।

—এবার হলি রেখে দেবো। সায়েব, সেলাম। মুই চল্লাম। পেরনাম হই দেওয়ানজি।

রাজারাম সাহেবকে দেখেই বুঝেছিলেন একটা গুরুতর ব্যাপারের খবর নিয়ে সে এখানে এসেচে। তিনকড়ি বিদায় নেবার পরক্ষণেই তিনি সাহেবকে জিগ্যেস করলেন—কি হয়েচে সায়েব?

—খুব গোলমাল। রসুলপুর আর রাহাতুনপুরির মুসলমান চাষীরা ক্ষেপে উঠেছে নীল বুনবে না।

—কে বললে?

—কারকুন গিয়েছিল নীলির দাগ মারতি—তারা দাগ মারতি দেয়নি, লাঠি নিয়ে তাড়া করেচে—

—এতবড় আস্পদ্দা তাদের ?

—তুমি ঘোড়া আনতি বলো। চলো দুজনে ঘোড়া ক'রে সেখানে যাবো। বড় সাহেবকে কিছু ব'লো না এখন।

—যদি সত্যি হয় তখন কি করা যাবে সে আমাকে বলতি হবে না সায়েব। আপনি দয়া ক'রে শুধু ফজদুরি মামলা থেকে আমারে বাঁচাবেন।

—না না, তুমি বড্ড rash, কিছু করে বস্‌বা। ওই জন্যি তোমারে আমার বিশ্বেস হয় না।

একটু পরে দুটো ঘোড়ায় চড়ে দুজনে বেরিয়ে গেল। কখন দেওয়ান ফিরে এসেছিলেন কেউ জানে না। পরদিন সকালে চারিধারে খবর রটে গেল রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষীদের গ্রাম, কারো বাড়ি বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত ধানের গোলা ছিল—আর ছিল ছ'চালা আটচালা ঘর. সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কি ভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোট সাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলেন ; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজী হয়নি। ওঁরা ফিরে আসেন রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।

পরদিন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডঙ্কিন্‌সন নীলকুঠির বড় বাংলোতে সদলবলে এসে পৌঁছুলেন। তিনি যখন কুঠির ফিটন্ গাড়ি থেকে নামলেন, তখন শুধু বড় সাহেব ও ছোট সাহেব সদর ফটকে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন—দেওয়ান রাজারাম নাক চুরুটের বাক্স এগিয়ে দেওয়ার জন্যে উপস্থিত ছিলেন বৈঠকখানায় টেবিলের পাশে। ডঙ্কিন্‌সন্ এসেছিলেন শুধু নীলকুঠির আতিথ্য গ্রহণ করতে নয়, বড় সাহেব একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ম্যাজিস্টেটকে এখানে এনেছিলেন।

রাজারামকে ডেকে বড় সাহেব বল্লেন—টুমি কি ডেখিলে ইহাকে বলিটে হইবে। ইনি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আছে—this man is our Dewan, Mr Duncinson, and a very shrewd old man too—go on, বলিয়া যাও—রাহাটুনপুরে কি ডেখিলে—

রাজারাম আভূমি সেলাম করে বললেন—সায়েব, ওরা ভয়ানক চটেচে। লাঠি নিয়ে আমাকে মারে আর কি! নীল কিছুতেই বুন্‌বে না। আমি কত কাকুতি করলাম—হাতে পায়ে ধরতে গেলাম। বললাম—

ডঙ্কিন্‌সন্ সাহেব বড় সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—What he did, he says?

—Entreated them—

—I understand. Ask him how many people were there—

—কটো লোক সেখানে ছিল?

—তা প্রায় দুশো লোক সায়েব। সব লাঠি-সোঁটা নিয়ে এসেছিল—

—Came with lathis and other weapons.

—Oh, they did, did they? The scoundrels!

—টারপরে টুমি কি করিলে?

—চলে এলাম সাহেব। দুঃখিত হয়ে চলে এলাম। ভাবতি ভাবতি এলাম, এতগুলো নীলির জমি এবার পড়ে রইলো। নীলচাষ হবে না। কুঠির মস্ত লোকসান।

কিছুক্ষণ পরে সদর-কুঠির সামনের মাঠ জনতায় ভরে গেল। ওরা এসেচে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিশ জানাতে—দেওয়ানজি ওদের গ্রাম রাহাতুনপুর একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসেচেন।

ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান রাজারামকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—টুমি কি করিয়াছে? আগুন ডিয়াছে?

রাজারাম আকাশ থেকে পড়লেন। চোখ কপালে তুলে বললেন—আগুন! সে কি কথা সাহেব! আগুন!

আগুন জিনিসটা কি তাই যেন তিনি কখনও শোনেন নি।

ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহ হোল। তিনি রাজারামকে অনেকক্ষণ জেরা করলেন। ঘুঘু রাজারাম অমন অনেক জেরা দেখেচেন, ওতে তিনি ভয় পান না। রাহাতুনপুর গ্রামের লোকদের অনেককে ডাক দিলেন, তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু কুঠির সীমানায় দাঁড়িয়ে ওরা বেশি কিছু বলতে ভয় পেলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজ এসেচে, কাল চলে যাবে, কিন্তু ছোট সাহেব আর দেওয়ানজি চিরকালের জুজু। বিশেষত দেওয়ানজি। ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁদের বিরুদ্ধে কথা বলতে যাওয়া—সে অসম্ভব। রাহাতুনপুর গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং গেলেন দেখতে। সঙ্গে বড় সাহেব ও ছোট সাহেব। মস্ত বড় হাতী তৈরী হোল তাঁদের যাবার জন্যে দু-দুটো। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল রাহাতুনপুরের মাঠ।

খুব বড় গ্রাম নয় রাহাতুনপুর, একপাশে খড়ের মাঠ, খড়ের মাঠের পূবদিকে এই গ্রামখানি—একখানাও কোঠাবাড়ি ছিল না। চাষী গৃহস্থদের খড়ের চালাঘর গায়ে গায়ে লাগা। পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েচে। কোনো কোনো ভিটেতে পোড়া কালো বাঁশগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মাটির দেওয়াল পুড়ে রাঙ্গা হয়ে গিয়েচে, কুমোর বাড়ির হাঁড়ি-পোড়ানো পনের মত দেখতে হয়েচে তাদের রং। কবীর সেখের গোয়ালে দুটো দামড়া হেলে গোরু পুড়ে মরেচে। প্রত্যেকের উঠানে আধ-পোড়া ধানের গাদা, পোড়া ধানের গাদা থেকে মেয়েরা কুলো করে ধান বেছে নিয়ে ঝাড়ছিল—মুখের ভাত যদি কিছুটা বাঁচাতে পারা যায়।

অনেকে এসে কেঁদে পড়লো। দেওয়ানজির কাজ অনেকে বললে, কিন্তু প্রমাণ তো তেমন কিছু নেই। কেউ তাঁকে বা তাঁর লোককে আগুন দিতে দেখেচে এটা প্রমাণ হোল না। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত ভালোভাবেই করলেন। বড় সাহেবকে ডেকে বললেন—আই অ্যাম রিয়্যালি সরি ফর দি পুওর বেগার্স—উই মাস্ট ডু সামথিং ফর দেম।

বড় সাহেব বললে—আই ওয়ানডার হু হ্যাজ কমিটেড্ দিস ব্ল্যাক্ ডিড্—আই সস্‌পেক্ট মাই অয়েলি-টাংড্ দেওয়ান।

—ইউ থিংক ইট ইজ এ কেস্ অফ্ আর্সন ?

—আই কান্ট টেল—ইয়ার্স এগো আই স এ কেস্ লাইক দিস্, অ্যাণ্ড ছাট ওয়াজ এ কেস্ অফ আর্সন—মাই ডেওয়ান ওয়াজ রেস্পন্সিবল ফর ছাট্—দি ডেভিল্।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একশো টাকা মঞ্জুর করলেন সাহায্যের জন্য, বড় সাহেব দিলেন দুশো টাকা। সাহেবদের জয়জয়কার উঠলো গ্রামে।

সকলে বললে—না, অমন বিচারক আর হবে না। হাজার হোক রাঙা মুখ।

সেই রাত্রে কুঠির হলঘরে মস্ত নাচের আসর জম্লো। রাঙামুখ সাহেবরা সবাই মদ খেয়েচে, মেমদের কোমর ধরে নাচচে, ইংরিজি গান করচে। সহিস ভজা মুচি উর্দি পরে মদ পরিবেশন করচে। নীলকুঠিতে কোনো অবাঙালী চাকর বা খানসামা নেই। এই সব আশপাশের গ্রামের মুচি, বাগদি, ডোম শ্রেণীর লোকেরা চাকর খানসামার কাজ করে। ফলে সাহেব মেম সকলেই বাংলা বলতে পারে, হিন্দি কেউ বলেও না, জানেও না।

আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তী বার-দেউড়িতে তাঁর ছোট কুঠরিতে বসে তামাক টানছিলেন। সামনে বসে ছিল বরদা বাগদিনী। বরদার বয়স প্রসন্ন চক্রবর্তীর চেয়ে বেশি, মাথার চুল শণের দড়ি। বরদাকে প্রসন্ন চক্রবর্তী মাঝে মাঝে স্মরণ করেন নিজের কাজ উদ্ধারের জন্যে।

প্রসন্ন বললেন—গয়া ভালো আছে ?

—তা একরকম আছে আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

—বড় ভালো মেয়ে। এমন এ দিগরে দেখিনি। একটা কথা বরদা দিদি—

—কি বলো—

—এক বোতল লাল বিলিতি মাল গয়াকে বলে আনিয়ে দাও দিদি। আজ অনেক ভালো জিনিসের আমদানি হয়েচে। সায়েব সুবোর খানা, বুঝতেই পারচো। অনেক দিন ভালো জিনিস পেটে পড়েনি—

—সে বাপু আমি কথা দিতে পারবো না। গয়া এখন ইদিকি নেই—

সায়েবদের খানার সময় গয়া সেখানে থাকে না—

—লক্ষ্মী দিদি, শোনবো না, একটু নজর করতিই হবে—উঠে যাও দিদি। গ্যাখো, যদি গয়াকে বলে নিদেনে একটা বোতল যোগাড় করতি পারো—

বরদা বাগদিনী চলে গেল। এ অঞ্চলে বরদার প্রতিপত্তি অসাধারণ, কারণ ও হোল সুবিখ্যাত গয়া মেমের মা। গয়া মেমকে মোল্লাহাটি নীলকুঠির অধীন সব গ্রামের সব প্রজা জানে ও মানে। গয়া বরদা বাগদিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু বড় সাহেবের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, এই জন্যেই ওর নাম এ অঞ্চলে গয়া মেম।

গয়া খারাপ লোক নয়, ধরে পড়লে সাহেবকে অনুরোধ ক'রে অনেকের ছোটবড় বিপদ সে কাটিয়ে দিয়েছে। মেয়েমানুষ কিনা, পাপপথে নামলেও ওর হৃদয়ের ধর্ম বজায় আছে ঠিক। গয়ার বয়স বেশি নয়, পঁচিশের মধ্যে, গায়ের রং কটা, বড় বড় চোখ, কালো চুলের ঢেউ ছেড়ে দিলে পিঠ পর্যন্ত পড়ে, মুখখানা বড় ছাঁচের কিন্তু এখনো বেশ টুলটুলে। সর্বাঙ্গের সুঠাম গড়নে ও অনেক ভদ্রঘরের সুন্দরীকে হার মানায়। পথ বেয়ে হেঁটে গেলে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হয় খানিকক্ষণ।

গয়া মেমকে কিন্তু বড় সাহেবের সঙ্গে কেউ দেখেনি। অথচ ব্যাপারটা এ অঞ্চলে অজানা নয়। সে হোল বড় সাহেবের আয়া, সর্বদা থাকে হলুদে কুঠিতে, যেটা বড় সাহেবের খাস কুঠি। ফরসা কালাপেড়ে শাড়ী ছাড়া সে পরে না, হাতে পৈঁছে, বাজুবন্ধ, কানে বড় বড় মাকড়ি—ঘন বনের বুকচেরা পাহাড়ী পথের মত বুকের খাঁজটাতে ওর দুলছে সরু মুড়কি-মাদুলী, সোনার হারে গাঁথা।

ডোমবাগদির মেয়েরা বলে—গয়া দিদি এক খেলা দেখালো ভালো।

ওদের মধ্যে ভালো ঘরের ঝি-বৌয়েরা নাক সিঁটকে বলে—অমন পৈঁছে বাজুবন্ধের পোড়া কপাল।

নিশ্চয় ওদের মধ্যে অনেকে ঈর্ষা করে ওকে। এর প্রমাণও আছে। অনেকে প্রতিযোগিতায় হেরেও গিয়েছে ওর কাছে। ঈর্ষা করবার সঙ্গত কারণ বৈকি!

আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির ঘরে এহেন গয়া মেয়ের আবির্ভাব খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। প্রসন্ন চক্কত্তি চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—এই যে গয়া। এসো মা এসো—বসতি দিই কোথায়—

গয়া হেসে বললে—থাক্ খুড়োমশাই—আমি ঝন্‌কাঠের ওপর বসচি—তারপর কি বললেন মোরে ?

—একটা বোতল যোগাড় করে দিতি পারো মা ?

—দেখুন দিকি আপন্যর কাণ্ড। মা গিয়ে মোরে বললে, দাদাঠাকুরকে একটা ভালো বোতল না দিলি নয়। এই দেখুন আমি এনিছি—কেমন ধারা দেখুন তো ?

গয়া কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা সাদা পেটমোটা বেঁটে বোতল বার করে প্রসন্ন চক্কত্তির সামনে রাখলো। প্রসন্ন চক্কত্তির ছোট ছোট চোখ দুটো লোভে ও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বোতলটা ধরে বল্লে—আহা, মা আমার—দেখি দেখি—কি ইংরিজী লেখা রয়েছে পড়তে পারিস ?

—না খুড়োমশাই, ইঞ্জিরি-ফিঞ্জিরি আমরা পড়তি পারিনে।

প্রসন্ন চক্কত্তি গয়ার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাইলে। কিঞ্চিত মুগ্ধ দৃষ্টিতেও বোধ হয়। গয়া মেয়ের সুঠাম যৌবন অনেকেরই কামনার বস্তু তবে বড্ড উঁচু ডালের ফল, হাতের নাগালে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে কি ?

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—হাঁরে গয়া, সায়েব মেমের নাচের মজা হোল কি ? দেখেচিস্ কিছু ?

—না খুড়োমশাই। মোরে সেখানে থাকতি দ্যায় না।

—শিপ টন্ সায়েবের মেম নাকি ছোট সাহেবের সঙ্গে নাচে ?

—ওদের পোড়া কপাল। সবাই সবার মাজা ধরে নাচতি লেগেছে। ঝাঁটা মারুন ওদের মুখি। মুই দেখে লজ্জায় মরে যাই খুড়োমশাই।

—বলিস্ কি !

—হাঁা খুড়োমশাই, মিথ্যে বলচিনে। আপনি না হয় গিয়ে একটু দেখে আসুন, বড় সায়েবের চাপরাসী নফর মুচি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—ভজা মুচি কোথায়? ও আমার কথা একটু-আধটু শোনে।

—সেও সেখানে আছে।

—বড় সায়েবও আছে?

—কেন থাকবে না। যাবে কনে?

—ভেতরে ভেতরে কেমন লোক বড় সায়েব?

গয়া সলজ্জ চোখ দুটি মাটির দিকে নামিয়ে বললে—ওই এক রকম। বাইরে যতটা গোঁয়ারগোবিন্দ দেখেন ভেতরে কিন্তু ততটা নয়। বাবা:, সব ভালো কিন্তু ওদের গায়ে যে—

—গন্ধ?

—বোটকা গন্ধ তো আছেই। তা নয়, গায়ে বড্ড ঘামাচি। ঘামাচি পেকে উঠবে রোজ রাত্তিরি। মোর মাথার কাঁটা চেয়ে নিয়ে সেই ঘামাচি রোজ গালবে। কথাটা বলে ফেলেই গয়ার মনে পড়লো, বৃদ্ধ প্রসন্ন আমীনের কাছে, বিশেষত যাকে খুড়োমশাই বলে ডাকে তাঁর কাছে, এ কথাটা বলা উচিত হয়নি। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা হলো বড্ড—সেটা ঢাকবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি উঠে বললে—যাই খুড়োমশাই, অনেক রাত হোল। বিস্কুট খাবেন? খান তো এনে দেবো এখন। আর এক জিনিস খায়—তারে বলে চিজ। বড্ড গন্ধ। মুই একবার মুখি দিয়ে শেষে গা ঘুরে মরি। তবে খেলি গায়ে জোর হয়।

গয়া মেম চলে গেলে প্রসন্ন আমীন মনের সাধে বোতল খুলে বিলিতি মদে চুমুক দিলেন। হাতে পয়সা আসে মন্দ : মাঝে মাঝে, দেওয়ানজির কৃপায়। কিন্তু এসব মাল জোটানো শুধু পয়সা থাকলেই বুঝি হয়? হদিস জানা চাই। দেওয়ানজির এসব চলে না, একেবারে কাঠখোট্টা লোক। ও পারে শুধু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে। কি ভাবেই রাহাতুনপুরটা পুড়িয়ে দিলে রাত্তিরে। এই ঘরে বসেই সব সলাপরামর্শ ঠিক হয়, প্রসন্ন আমীন জানে না কি। ম্যাজিস্ট্রেটই আসুক আর যেই আসুক, নীলকুঠির সীমানার মধ্যে ঢুকলে সব ঠাণ্ডা।

তা ছাড়া রাজার জাত রাজার জাতের পক্ষে কথা বলবে না তো কি বলবে কালা আদমিদের দিকে?

খাও দাও, মেয়েদের মাজা ধরে নাচো, ব্যস্, মিটে গেল।

ভবানী বাঁড়ুযো বেশ সুখে আছেন।

দেওয়ান রাজারাম রায়ের বাড়ি থেকে কিছুদূরে বাঁশবনের প্রান্তে দুখানা খড়ের ঘর তৈরি করে সেখানেই বসবাস করচেন আজ দু'বছর; তিলুর একটি ছেলে হয়েচে। ভবানী বাঁড়ুযো কিছু করেন না, তিন-চার বিঘে ধানের জমি যৌতুক স্বরূপ পেয়েছিলেন, তাতে যা ধান হয়, গত বছর বেশ চলে গিয়েছিল। সে বছর সেই যে সাহেবটি তাঁদের ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছিল, এবার সে সাহেব তাঁকে একখানা চিঠি আর একখানা বই পাঠিয়েচে বিলেত থেকে। রাজারাম নীলকুঠি থেকে বই আর চিঠি এনে ভবানীর হাতে দেন। হাতে দিয়ে বলেন—ওহে ভবানী, এতে তিলুর ছবি কি ক'রে এল? সাহেব এঁকেছিল বুঝি? চমৎকার এঁকেচে, একেবারে প্রাণ দিয়ে এঁকেচে। কি সুন্দর ভঙ্গিতে এঁকেচে ওকে। ওর ছবি কি ক'রে আঁকলে সাহেব? থাক্ থাক্, এ যেন আর কাউকে দেখিও না এ গাঁয়ে। কে কি মনে করবে। ইংরিজি বই। কি তাতে লিখেচে কেউ বলতে পারে না, শুধু এইটুকু বোঝা যায় এই গাঁ এবং যশোর অঞ্চল নিয়ে অনেক জায়গার ছবি আছে। সাহেবটা ভালো লোক ছিল।

তিলু হেসে বললে—দেখলেন, কেমন ছবি উঠেচে আমার।

—আমারও।

—বিলু-নিলুকে দেখাবেন। ওরা খুশি হবে। ডাকি দাঁড়ান—

নিলু এসে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। সব তাতেই দিদি কেন আগে? তার ছবি কি উঠতে জানে না? দিদির সোহাগ ভুলতে পারবেন না রসের গুণমণি—অর্থাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যে।

তবে আজকাল ওদের অনেক চঞ্চলতা কমেচে। কথাবার্তায় ছেলেমিও আগের মত নেই। বিলুর স্বভাব অনেক বদলেচে, দু'এক মাস পরে তারও ছেলেপুলে হবে।

তিলু কিন্তু অদ্ভুত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের আদুরে আবদেরে মেয়ে হয়ে

সে ভবানী বাঁড়ুয্যের খড়ের ঘরে এসে কেমন মানিয়ে নিয়ে ঘর আলো করে বসেচে। এখানে কুলুঙ্গি, ওখানে তাক তৈরি করচে নিজের হাতে। নিজেই ঘর গোবর দিয়ে পরিপাটি করে নিকুচ্চে, উনুন তৈরি করচে পুকুরের মাটি এনে, সন্ধ্যের সময় বসে কাপাস তুলোর পৈতে কাটে। একদণ্ড বসে থাকবার মেয়ে সে নয়। চরকির মত ঘুরচে সর্বদা।

বিলুও অনেক সাহায্য করে। দিদি রাঁধে, ওরা কুটনো কুটে দেয়। বিলু ও নিলু দিদির নিতান্ত অনুগত সহোদরা, দিদি যা বলে তাই সই। দিদি ছাড়া ওরা এতদিন কিছু জানতো না—অবিশ্যি আজকাল স্বামীকে চিনেচে দুজনেই। স্বামীর সঙ্গে বসে গল্প করতে ভারি ভালো লাগে।

বৌদিদি জগদম্বা বলেন—ও নিলু, আজকাল যে এ-বাড়ি আর আসিস নে আদপে?

নিলু সলজ্জস্বরে বলে—কত কাজ পড়ে থাকে ঘরের। দিদি একা, আমরা না থাকলি—

—তা তো বটেই। আমাদের তো আর ঘর সংসার ছিল না, কেবল তোদেরই হয়েচে, না?

—যা বলো।

--তিলুকে ওবেলা তাই বলছিলাম—

—ও বাবা, দিদি তোমার ভাইকে ফেলি আর খোকনকে ফেলি স্বগ্‌গে যেতি বল্লিও যাবে না।

—তা জানি।

—দিদি একা পারে না বলে খোকনকে নিয়ে আমাদের থাকতি হয়।

—বড্ড ভালো মেয়ে আমার তিলু। সন্দের পর একটু পাঠিয়ে দিস্। উনি কুঠি থেকে আগে আগে ফিরে এলে তিলুই ওঁর তামাক সেজে দিতো জানিস তো। উনি রোজ ফিরে এসে বলেন, তিলু বাড়ি না থাকলি বাড়ি অন্ধকার।

—দিদিকে বলবো এখন।

—খোকাকে নিয়ে যেন আসে না, সন্দের পর।

—তোমাদের জামাই না ফিরে এলি তো দিদি আসতে পারবে না। তিনি শুণমণি ফেরেন রাতে।

—কোথা থেকে?

—তা বলতে পারিনে।

—সন্ধান-টন্ধান নিবি। পুরুষের বার-দোষ বড্ড দোষ—

—সে-সব নেই তোমাদের জামাইয়ের বৌদি। ও অন্য এক ধরনের মানুষ। সন্নিসি গোছের লোক। সন্নিসি হয়েই তো গিয়েছিল জানো তো। এখনো সেই রকম। সংসারে কোনো কিছুতেই নেই। দিদি যা করবে তাই।

—আহা বড্ড ভালোমানুষ। আমার বড্ড দেখতি ইচ্ছে করে। সন্দের সময় আজ দুজনকেই একটু আসতি বলিস। এখানেই আহ্নিক ক'রে জল খাবেন জামাই।

ভবানী নদীর ধার থেকে সন্দের পর ফিরে আসতেই নিলু বললে—শুনুন, আপনাকে আর দিদিকে জোড়ে যেতি হবে ও-বাড়ি—বৌদিদির হুকুম—

—আর, তুমি আর বিলু?

—আমাদের কে পোঁছে? নাগর-নাগরী গেলেই হোল—

—আবার ওই সব কথা?

—ঘাট হয়েচে। মাপ করুন মশাই।

এমন সময়ে তিলু এসে দুজনকে দেখে হেসে ফেললে। বললে,—বেশ তো বসে গল্পগুজব করা হচ্চে। আহ্নিকের জায়গা তৈরি যে—

ভবানী বললেন—নিলু বলচে তোমাকে আর আমাকে ও বাড়ি যেতে বলেচে বৌদিদি।

তিলু বললে—বেশ চলুন। খোকনকে ওদের কছে রেখে যাই।

দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে সন্ধ্যার পরেই। শীত এখনো সামান্য আছে, গাছে গাছে আমের মুকুল ধরেচে, এখনো আম্রমুকুলের সুগন্ধ ছড়াবার সময় আসেনি। দু'একটি কোকিল কখনো কখনো ডেকে ওঠে বড় বকুল গাছটায় নিবিড় শাখা-প্রশাখার মধ্যে থেকে।

ভবানী বললেন—তিলু, বসবে ? চলো নদীর ধারে গিয়ে একটু বসা যাক্।

তিলুর নিজের কোনো মত নেই আজকাল। বললে—চলুন। কেউ দেখতি পাবে না তো ?

—পেলে তাই কি ?

—আপনার যা ইচ্ছে—

- রায়েদের ভাঙাবাড়ির পেছন দিয়ে চলো। ও পথে ভূতের ভয়ে লোক যায় না।

নদীর ধারে এসে দুজনে দাঁড়ালো বাঁশঝাড়ের তলায়, শুকনো পাতার রাশির ওপরে। তিলু বললে—দাঁড়ান, আঁচলটা পেতে নিচে বসুন—

—তুমি আঁচল খুলো না, ঠাণ্ডা লাগবে—

—আমার ঠাণ্ডা লাগে না, বসুন আপনি—

—বেশ লাগচে, না ?

তিলু হেসে বললে—সত্যি বেশ, সংসার থেকে তো বেরুনোই হয় না আজকাল—কাজ আর কাজ। বিলু নিলু সংসারের কি জানে ? ছেলেমানুষ। আমি যা বলে দেবো, তাই ওরা করে। সব দিকেই আমার ঝক্কি।

তিলুর কথার সুরে যশোর জেলার গ্রাম্য টানগুলি ভবানী বাঁড়ুয্যের এত মিষ্টি লাগে! তিনি নিজে নদীয়া জেলার লোক, সেখানকার বাংলার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি সুমার্জিত। এদেশে এসে প্রথমে শুনলেন এই ধরনের কথা।

হেসে বল্লেন—শোনো, তোমাদের দেশে বলে কি জানো ? শিবির মাটি, পূবির ঘর --মুগির ডালি ঘি দিলি ক্ষীরির তার হয়—

—কি, কি ?

--মুগির ডালি মানে মুগের ডালে, ঘি দিলি মানে ঘি দিলে—

—থাক্ ও, আপনার মানে বলতি হবে না। ও কথা আপনি প্যালেন কোথায় ?

—এই দেখচি দেশের বুলি ধরেচ, বলতি হবে না, প্যালেন কোথায়! তবে মাঝে মাঝে চেপে থাকো কেন ?

—লজ্জা করে আপনার সামনে বলতি—

ভবানী তিলুকে টেনে নিলেন আরো কাছে। জ্যোৎস্না বাঁকা ভাবে এসে সুন্দরী তিলুর সমস্ত দেহে পড়েচে, বয়স ত্রিশ হোলেও স্বামীকে পাবার দিনটি থেকে দেহে ও মনে ও যেন উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী হয়ে গিয়েচে। বালিকা-জীবনের কতদিনের অতৃপ্ত সাধ, কুলীনকুমারীর অতি দুর্লভ বস্তু স্বামী-রত্ন এতকালে সে পেয়েছে হাতের মুঠোয়। তাও এমন স্বামী। এখনো যেন তিলুর বিশ্বাস হয় না। যদিও আজ দু'বছর হয়ে গেল।

তিলু বল্লে—আমার মনে হয় কি জানেন? আপনি আসেন নি বলেই আমাদের এতদিন বিয়ে হচ্ছিল না—কুলীনের মেয়ের বিয়ে—

—আচ্ছা, একটা কথা বুঝলাম না। রায় উপাধি তোমাদের, রায় আবার কুলীন কিসের! রায় তো শ্রোত্রিয়—

—ওকথা দাদাকে জিগ্যেস করবেন। আমি মেয়েমানুষ, কি জানি। আমরা কুলীন সত্যিই। আমার দুই পিসি ছিলেন, তাঁদের বিয়ে হয় না কিছুতেই। ছোট পিসি মারা যাওয়ার পরে বড় পিসিকে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেল কোথায় অজ বাঙাল দেশে- ভালো কুলীনের ছেলে—

—আহা, তোমরা আর বাঙাল দেশ বোলো না। যশুরে বাঙাল কোথাকার! মুগির ডালি ঘি দিলি ক্ষীরির তার হয়। শিবির মাটি, পূবির ঘর—

—যান আপনি কেবল ক্ষ্যাপাবেন—আর আপনাদের যে গেলুম মলুম হালুম হুলুম—হি হি—হি হি—

—আচ্ছা থাক্! তারপর?

—তখন বড় পিসির বয়েস চল্লিশের ওপর। সেখানে গিয়ে আগের সতীনের বড বড় ছেলেমেয়ে, বিশ-ত্রিশ বছর বয়েস তাদের। সতীন ছিল না। ছেলে-মেয়েরা কি যন্ত্রণা দিতো! সব মুখ বুজে সহ্যি করতেন বড় পিসি। নিজের সংসার পেয়েছিলেন কতকাল পরে। একটা বিধবা বড় মেয়ে ছিল, সে পিসিকে কাঠের চ্যালার বাড়ি মারতো, বলতো—তুই আবার কে? বাবার নিকের বৌ, বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েচে তাই তোকে বিয়ে করে এনেচে। তাও পিসি মুখ বুজি

সয়ে থাকতো। অবশেষে বুড়ো বাহাত্তরে স্বামী তুললো পটল।

—তারপর?

—তারপর সতীনপো সতীনঝিরা মিলে কী দুর্দশা করতে লাগলো পিসির! তারপর তাড়িয়ে দিলে পিসিকে বাড়ি থেকে। পিসি কাঁদে আর বলে—আমার স্বামীর ভিটেতে আমাকে একটু থান ছাও। তা তারা দিলে না। পথে বার করে দিলে। সেকালের লজ্জাবতী মেয়েমানুষ, বয়েস হয়েছিল তা কি, কনে-বৌয়ের মত জড়োসড়ো। একজনেরা দয়া করে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিলে। কি কান্না পিসির! তারাই বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। তথনো স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান। বাড়ি এসে পিসিকে একাদশী করতে হয়নি বেশিদিন। ভগবান সতীলক্ষ্মীকে দয়া করে তুলে নিলেন।

—এ কতদিন আগের কথা?

—অনেক দিনের। আমি তথন জন্মিচি কিন্তু আমার জ্ঞান হয়নি। পিসিমাকে আমি মনে করতে পারিনে। বড় হয়ে মা'র মুখে বৌদির মুখে সব শুনতাম। বৌদি তথন কনে-বৌ, সবে এসেচে এ বাড়ি।

তিলু চুপ করল, ভবানী বাঁড়ুয্যেও কতক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভবানী বাঁড়য্যের মনে হোল, বৃথাই তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সমাজের এই অত্যাচারিতাদের সেবার জন্যে বার বার তিনি সংসারে আসতে রাজী আছেন। মুক্তি-টুক্তি এর তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ।

কতদিন আগের সেই অভাগিনী কুলীন-কুমারীর স্মৃতি বহন করে ইছামতী তাঁদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে, তাঁরই না-মেটা স্বামী-সাধের পুণ্য-চোখের জল ওর জলে মিশে গিয়েচে কতদিন আগে। আজ এই পানকলস ফুলের গন্ধ মাখানো চাঁদের আলোয় তিনিই যেন স্বর্গ থেকে নেমে বললেন—বাবা, আমার যে সাধ পোরে নি, তোমার সামনে যে বসে আছে এই মেয়েটির তুমি সে সাধ পুরিও। বাংলা দেশের মেয়েদের ভালো স্বামী হও, এদের সে সাধ পূর্ণ হোক আমার যা পুরলো না—এই আমার আশীর্বাদ!

ভবানী বাঁড়য্যে তিলুকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

যখন ওরা দেওয়ানবাড়ি পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েচে, একদণ্ড রাত্রিও কেটে গিয়েচে। জগদম্বা বললেন—ওমা, তোরা ছিলি কোথায় রে তিলু? নিলু এসেছিল এই খানিক আগে। বললে, তারা কতক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েচে। আমি জামাইয়ের জন্যে আহ্নিকের জায়গা করে জলখাবার গুছিয়ে বসে আছি ঠায়, কি যে কাণ্ড তোদেখ—

তিলু বলে—কাউকে বোলো না বৌদিদি, উনি নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ওঁকে জলখাবার খাইয়ে দাও। আমার মন কেমন করচে খোকনের জন্যে। কতক্ষণ দেখি নি। নিলু কী বললে, খোকন কাঁদচে না তো।

—না, খোকন ঘুমিয়ে পড়েচে নিলু বলে গেল। তুই খেয়ে নে—

—উনি আহ্নিক করুন আগে। দাদা আসেন নি?

—তাঁর ঘোড়া গিয়েচে আনবার জন্যি।

জলখাবার সাজিয়ে দিলেন জগদম্বা জামাইয়ের সামনে। শালাজ-বৌ হোলেও ভবানী তাঁকে শাশুড়ীর মত সম্মান করেন। জগদম্বা ঘোমটা দিয়ে ছাড়া বেরোন না জামাইয়ের সামনে। মুগের ডাল ভিজে, পাটালি, খেজুরের রস, নারকেল নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ এবং ফেণী বাতাসা। তিলু খেতে খেতে বললে—বিলু-নিলুকে দিয়েচ?

—নিলু এসে খেয়ে গিয়েচে, বিলুর জন্যি নিয়ে গিয়েচে।

—এবার যাই বৌদি। খোকন হয়তো উঠে কাঁদবে।

—জামাইকে নিয়ে আবার পরেও আসবি। দুখানা আঁদোসা ভেজে জামাইকে খাওয়াবো। খেজুরের রসের পায়েস করবো সেদিন। আজ মোটে এক ভাঁড় রস দিয়ে গেল ভজা মুচির ভাই, নইলে আজই করতাম।

—শোনো বৌদি। তোমাদের জামাই বলে কি না আমার বাঙালে কথা। বলে—শিবির মাটি, পূবির ঘর। আবার এক ছড়া বার করেচে—মুগির ডালি ঘি দিলি নাকি ক্ষীরির তার হয়—হি হি—

—আহা, কি শহুরে জামাই! দেবো একদিন শুনিয়ে। তবুও যদি দাড়িতে

জট না পাকাতো! আমি যখন প্রথম দেখি তখন এত বড় দাড়ি, যেন নারদ মুনি।

—তোমাদের জামাই তোমরাই বোঝো বৌদি। আমি যাই, খোকন ঠিক উঠেচে। আবার আসবো পরশু।

পথে বার হয়ে ভবানী আগে আগে, তিলু পেছনে ঘোমটা দিয়ে চলতে লাগলো। পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ। এখানে ওদের একত্র ভ্রমণ বা কথোপকথন আদৌ চলবে না।

চন্দ্র চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে রাস্তা। রাত্রে সেখানে দাবার আড্ডা বিখ্যাত। সম্পর্কে চন্দ্র চাটুয্যে হোলেন তিলুর মামাশ্বশুর। তিলুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো, যদি মামাশ্বশুর দেখে ফেলেন? এত রাতে সে স্বামীর সঙ্গে পথে বেরিয়েচে!

চণ্ডীমণ্ডপের সামনাসামনি যখন ওরা এসেচে তখন চণ্ডীমণ্ডপের ভিড়ের মধ্যে থেকে কে জিগ্যেস করে উঠল,—কে যায়?

ভবানী গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমি।

—কে, ভবানী?

—হ্যাঁ।

—ও।

লোকটা চুপ করে গেল। তিলু আরও এগিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে —কে ডাকলে?

—মহাদেব মুখুয্যে।

—ভালো জ্বালা। আমাকে দেখলে নাকি?

—দেখলে তাই কি? তুমি আমার সঙ্গে থাক, অত ভয়ই বা কিসের?

—আপনি জানেন না এ গাঁয়ের ব্যাপার! ঐ নিয়ে কাল হয়তো রটনা রটবে। বলবে, অমুকের বৌ সদর রাস্তা দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল গট্ গট্ করে।

—বয়েই গেল। এসব বদলে যাবে তিলু, থাকবে না, সেদিন আসচে। তোমার আমার দিন চলে যাবে। ঐ খোকন যদি বাঁচে, ওর বৌকে নিয়ে

ও পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে এ গাঁয়ের পথে—কেউ কিছু মনে করবে না।

নালু পাল একখানা দোকান করেচে। ইছামতী থেকে যে বাঁওড় বেরিয়েচে, এটা ইছামতীরই পুরনো খাত ছিল একসময়ে। এখন আর সে খাতে স্রোত বয় না, টোপাপানার দাম জমেচে। নালু পালের দোকান এই বাঁওড়ের ধারে, মুদির দোকান একখানা ভালোই চলে এখানে, মোল্লাহাটির হাটে মাথায় ক'রে জিনিস বিক্রি করবার সময়ে সে লক্ষ্য করেছিল।

নালু পালের দোকানে খদ্দের এল। জাতে বুনো, এদের পূর্বপুরুষ নীলকুঠির কাজের জন্যে এদেশে এসেছিল সাঁওতাল পরগণা থেকে। এখন এরা বাংলা বেশ বলে, কালীপূজো মনসাপূজো করে, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরে।

একটি মেয়ে বললে—দু'পয়সার তেল আর নুন দ্যাও গো। মেঘ উঠেচে, বিষ্টি আসবে—

একটি মেয়ে আঁচল থেকে খুললে চারটি পয়সা। সে কড়ি ভাঙাতে এসেচে। এক পয়সায় পাঁচগণ্ডা কড়ি পাওয়া যায়—আজ সবাইপুরের হাট, কড়ি দিয়ে শাক বেগুন কিনবে।

নালু পাল আজ বড় ব্যস্ত। হাটবারের দিন আজ, সবাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধমাইল, সব লোক হাটের ফেরত ওর দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যাবে। পয়সার বাক্স আলাদা, কড়ির বাক্স আলাদা—সে শুধু জিনিস বিক্রি ক'রে নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলচে।

এখানে বসে সে সস্তায় হাট করে। একটি মেয়ে লাউশাক বিক্রি করতে যাচ্ছে, নালু পাল বললে—শাক কত?

—আট কড়া।

—দূর, ছ' কড়া কালও কিনিচি। শাক আবার আটকড়া! কখনো বাপের জন্মে শুনিনি। দে ছ'কড়া ক'রে।

—দিলি বড় খেতি হয়ে যায় যে—টাটকা শাক, এখুনি তুলি নিয়েঅ্যালাম।

—দিয়ে যা রে বাপু। টাটকা শাক ছাড়া বাসি আবার কে বেচে?

দুটি কচি লাউ মাথায় একটা ঝুড়িতে বসিয়ে একজন লোক যাচ্ছে। নালুর দৃষ্টি শাক থেকে সেদিকে চলে গেল।

—বলি ও দবিরুদ্দি ভাই। শোনো শোনো ইদিকি—

—কি? লাউ তুমি কিনতি পারবা না। ছস্তায় দিতি পারবো না!

—কত দাম?

—দু' পয়সা এক একটা।

দোকানের তাবৎ লোক দর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। সকলেই ওর দিকে চাইতে লাগল। একজন বললে—ঠাট্টা করলে নাকি?

দবিরুদ্দি মাথার লাউ নামিয়ে একজনের হাত থেকে কল্কে নিয়ে হেসে বললে—ঠাট্টা করবো কেন! মোরা ঠাট্টার যুগ্যি নোক?

নালু হেসে বললে—কথাটা উল্টো বলে ফেললে। আমরা কি তোমার ঠাট্টার যুগ্যি লোক? আসল কথাটা এই হবে। এখন বল কত নেব?

—এক পয়সা দশ কড়া দিও।

—না, এক পয়সা পাঁচ কড়া নিও। আর জালিও না বাপু, ওই নিয়ে খুশি হও। দুটো লাউই দিয়ে যাও।

বৃদ্ধ হরি নাপিত বসে তামাকের গুল একটা পাতায় জড়ো করছিল। তাকে জিগ্যেস করলে ভূধর ঘোষ—ও কি হচ্চে?

—দাঁত মাজবো বেন্ বেলা। লাউ একটা কিনবো ভেবেলাম তা দর দেখে কিনতি সাহস হোল না। এই মোল্লাহাটির হাটে জন্সন্ সাহেবের আমলে অমন একটা লাউ ছ'কড়া দিয়ে কিনিচি। দশ কড়ায় অমন দুটো লাউ পাওয়া যেত। আমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, পার্শ্বনাথ ঘোষের বাড়ি ওর বড় ছেলের বৌভাতে একপাড়ি তরকারি এয়েল, এক টাকা দাম পড়ল মোটমাট। অমন লাউ তার মধ্যি পনেরো-বিশটা ছিল। পটল, কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, থোড়, মোচা, পালংশাক, শসা তো অগুন্তি। এখন সেই রকম একপাড়ি তরকারি দু'টাকার কম হয়?

অক্রূর জেলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ, মানুষের খাদ্যখাদক কেরমেই

অনাটন হয়ে ওঠছে। মানুষের খাবার দিন চলে যাচ্চে, আর খাবে কি ? এই সবাইপুরে দুধ ছিল ট্যাকায় বাইশ সের চব্বিশ সের। এখন আঠারো সেরের বেশি কেউ দিতি চায় না।

নালু পাল বললে—আঠারো সের কি বলচো খুড়ো ? আমাদের গাঁয়ে ষোল সেরের বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। একটু সন্দেশ করবো বলে ছানা কিন্তি গিয়েছিলাম অঘোর ঘোষের কাছে, তা নাকি দু' আনা করে খুলি !. এক খুলিতে বড্ড জোর পাঁচপোয়া ছানা থাকুক—

অক্রূর জেলে হতাশভাবে বললে—নাঃ—আমাদের মত গরীবগুরবো না খেয়েই মারা যাবে। অচল হয়ে পড়লো কেরমেশে।

—তা সেই রকমই দাঁড়িয়েচে।

দবিরুদ্দি নিজেকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বিবেচনা করে এক একটা লাউ এক এক পয়সা হিসাবে দাম চুকিয়ে নিয়ে হাটের দিকে চলে গেল। নালু পাল তাকে একটা পয়সা দিয়ে বললে—অম্‌নি এক কাজ করবা। এক পয়সার চিংড়ি মাছ আমার জন্যি কিনে এনো। লাউ দিয়ে চিংড়ি দিয়ে তবে মজে। বেশ ছট্‌কালো দেখে দোয়াড়ির চিংড়ি আনবা।

হরি নাপিত বললে—চালখানা ছেয়ে নেবো বলে ঘরামির বাড়ি গিইছিলাম। চার আনা রোজ ছেল বরাবর, সেদিন সোনা ঘরামি বললে কিনা চার আনায় আর চাল ছাইতে পারবো না, পাঁচ আনা করি দিতি হবে। ঘরামি জন পাঁচ আনা আর একটা পেটেল দু' আনা—তাহলি একখানা পাঁচ-চালা ঘর ছাইতে কত মজুরি পড়লো বাপধনেরা ? পাঁচ-ছ টাকার কম নয়।

বর্তমান কালের এই সব দুর্মূল্যতার ছবি অক্রূরকে এত নিরাশ ও ভীত করে তুললো যে সে বেচারী আর তামাক না খেয়ে কল্কেটি মাটিতে নামিয়ে রেখে হন্‌হন্ করে চলে গেল।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার তাকে ফিরতে হোল। অক্রূর জেলের বাড়ি পাশের গ্রাম পুস্তিঘাটায়। তার বড় ছেলে মাছ ধরার বাঁধাল দিয়েচে সবাইপুরের বাঁওড়ে। হঠাৎ দেখা গেল দূরে ডুমুরগাছের তলায় সে আসচে, মাথায় চুপড়িতে

একটা বড় মাছ।

অক্রূর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল। অত বড় মাছটা কি তার ছেলে পেয়েছে নাকি? বিশ্বাস তো হয় না! আজ হাট করবার পয়সাও তার হাতে নেই। যত কাছে আসে ওর ছেলে, তত ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওঃ, মস্ত বড় মাছটা দেখছি।

দূর থেকে ছেলে বললে—কনে যাচ্চ বাবা?

—বাড়ি যাচ্ছিলাম। মাছ কাদের?

—বাঁধালের মাছ। এখন পড়লো।

—ওজন?

—আট সের দশ ছটাক। তুমি মাছটা নিয়ে হাটে যাও।

—তুমি কনে যাবি?

—নৌকো বাঁওড়ের মুখে রেখে অ্যালাম যে। ঝড় হলি উড়ে বেরিয়ে যাবে। তুমি যাও।

নালু পালের দোকানে খদ্দেরের ভিড় আরম্ভ হবে সন্দে বেলা। এই সময়টা সে পাঁচজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে দিন কাটায়। অক্রূর জেলেকে দোকানের সবাই মিলে দাঁড় করালে। বেশ মাছটা। এত বড় মাছ অবেলায় ধরা পড়ল?

নালু বললে—মাছটা আমাদের দিয়ে যাও অক্রূরদা—

—ন্যাও না। আমি বেঁচে নাই তা হ'লি। অবেলায় আর হাটে যাই নে।

—দাম কি?

—চার ট্যাকা দিও।

—বুঝে-সুজে বল অক্রূরদা। অবিশ্যি অনেকদিন তুমি বড় মাছ বিক্রি করনি, দাম জানো না। হরি কাকা, দাম কত হতে পারে?

হরি নাপিত ভালো করে মাছটা দেখে বললে—আমাদের উঠতি বয়েসে এ মাছের দাম হোত দেড় ট্যাকা! দাও তিন টাকাতে দিয়ে যাও।

—মাপ করো দাদা, পারবো না। বড় ঠকা হবে।

—আচ্ছা, সাড়ে তিন টাকা পাবা। আর কথাটি বোলো না, আজ

দু'ট্যাকা নিয়ে যাও। কাল বাকিটা নেবে।

মাছ কিনে কেউ বিশেষ সন্তুষ্ট হোল না, কারণ অক্রূর মাঝিকে এরা বেশি ঠকাতে পারে নি। ন্যায্য দাম যা হাটেবাজারে তার চেয়ে না হয় আনা-আটেক কম হয়েচে।

নালু পাল বললে—কে কে ভাগ নেবা, তৈরী হও। নগদ পয়সা। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

পাঁচ-ছ'জন নগদ দাম দিয়ে মাছ কিনতে রাজী হোল। সবাই মিলে মাছটা কেটে ফেললে দোকানের পেছনে বাঁশতলার ছায়ায় বসে। এক-একখানা মানকচুর পাতা যোগাড় করে এনে এক এক ভাগ মাছ নিয়ে গেল প্রত্যেকে।

নালু পাল নিলে এক ভাগের অর্ধেকটা।

অক্রূর জেলে বললে—পাল মশায়, অর্ধেক কেন, পুরো নিলে না?

—না হে, দোকানের অবস্থা ভালো না। অত মাছ খেলেই হোল!

—তোমরা তো মোটে মা ছেলে, একটা বুঝি বোন। সংসারে খরচ কি?

—দোকানটাকে দাঁড় না করিয়ে কিছু করচি নে দাদা।

—বৌ নিয়ে এসো এই সামনের অঘ্রাণে। আমরা দেখি।

—ব্যবসা দাঁড় করিয়ে নিই আগে। সব হবে।

নালু পাল আর কথা বলতে সময় পেলে না। দোকানে ওর বড় ভিড় জমে গেল। কড়ির খদ্দের বেশী, পয়সার কম। টাকা ভাঙাতে এলো না একজনও। কেউ টাকা বার করলে না। অথচ রাত আটটা পর্যন্ত দলে দলে খদ্দেরের ভিড় হোল ওর দোকানে। ভিড় যখন ভাঙলো তখন রাত অনেক হয়েচে।

এক প্রহর রাত্রি।

তবিল মেলাতে বসলো নালু পাল। কড়ি গুনে গুনে একদিকে, পয়সা আর একদিকে। দু' টাকা সাত আনা পাঁচ কড়া।

নালু পাল আশ্চর্য হয়ে গেল। এক বেলায় প্রায় আড়াই টাকা বিক্রি। এ বিশ্বাস করা শক্ত। সোনার দোকানটুকু। মা সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় এখন এই

রকম যদি চলে রোজ রোজ তবেই।

আড়াই টাকা এক বেলায় বিক্রি। নালু পাল কখনো ভাবে নি। সামান্য মশলার বেসাতি করে বেড়াতো হাটে হাটে। রোদ নেই, বর্ষা নেই, কাদা নেই, জল নেই—সব শরীরের ওপর দিয়ে গিয়েচে। গোপালনগরের বড় বড় দোকানদার তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতো না। জিনিস বেসাতি করে মাথায় নিয়ে, সে আবার মানুষ!

আজ আর তার সে দিন নেই। নিজের দোকান, খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল। দোকানে তক্তপোশের ওপর বসে সে বিক্রি করে গদিয়ান চালে। কোথাও তাকে যেতে হয় না, রোদবৃষ্টি গায়ের ওপর দিয়ে যায় না। নিজের দোকানের নিজে মালিক। পাঁচজন এসে বিকেলে গল্প করে বাইরে বাঁশের মাচায় বসে। সবাই খাতির করে, দোকানদার ব'লে সম্মান করে।

আড়াই টাকা বিক্রি। এতে সে যত আশ্চর্যই হোক, এর বেশি তাকে তুলতে হবে। পাঁচ টাকায় দাঁড় করাতে যদি পারে দৈনিক বিক্রি, তবেই সে গোবর্ধন পালের উপযুক্ত পুত্র। মা সিদ্ধেশ্বরী সে দিন যেন দেন।

নালু পাল কিছু ধানের জমির চেষ্টায় ঘুরচে আজ কিছুদিন ধরে। রাত্রে বাড়ি গিয়ে সে ঠিক করলে সাতবেড়ের কানাই মণ্ডলের কাছে কাল সকালে উঠেই সে যাবে। সাতবেড়েতে ভাল ধানী জমি আছে বিলের ধারে, সে খবর পেয়েছে।

--বিয়ে?

ও কথাটা হরি নাপিত মিথ্যে বলে নি কিছু। বিয়ে করে বৌ না আনলে সংসার মানায়?

তার সন্ধানে ভালো মেয়েও সে দেখে রেখেছে—বিনোদপুরের অম্বিক প্রামাণিকের সেজ মেয়ে তুলসীকে।

সেবার তুলসী জল দিতে এসে বেলতলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়েছিল। দু'বার চেয়েছিল, নালু লক্ষ্য করেচে। তুলসীর বয়স এগার বছরের কম হবে না, শ্যামাঙ্গী মেয়ে, বড বড় চোখ—হাতপায়ের গড়ন কি চমৎকার যে ওর, চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না। বিনোদপুরের মাসির বাড়ি আজকাল

মাঝে মাঝে যাতায়াত করার মূলেই যে মাসিদের পাড়ার অম্বিক প্রামাণিকের এই মেয়েটি—তা হয়তো স্বয়ং মাসিও খবর রাখেন না। কিন্তু না, কথা তা নয়।

বিয়ে করতে চাইলে, তুলসীর বাবা হাতে স্বর্গ পাবেন সে জানে। বিয়ে করতে হলে এমন একটি শ্বশুর দরকার যে তার ভাল অভিভাবক হতে পারে। সে নিজে অভিভাবকশূন্য, তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দেবার কেউ নেই, বিপদে আপদে পরামর্শ করবার কেউ নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর একা তাকে যুঝতে হচ্ছে সংসারের মধ্যে। বিনোদ প্রামাণিক ওই গ্রামের ছোট আড়তদার, সর্ষে, কলাই, মুগ কেনাবেচা করে, খড়ের চালা আছে খান-দুই বাড়িতে। এমন কিছু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ নয়, হঠাৎ হাত পাতলে পঞ্চাশ-একশো বার করবার মত সঙ্গতি নেই ওদের। নালুর এখন কিন্তু সেটাও দরকার। ব্যবসার জন্যে টাকা দরকার। মাল সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, এখুনি বায়না করতে হবে—এ সময়ে ব্যবসা আরো বড় করে ফাঁদতে পারতো। ব্যবসা সে বুঝেচে—কিন্তু টাকা দেবে কে?

নালুর মা ভাত নিয়ে বসেছিল রান্নাঘরের দাওয়ায়। ও আসতেই বললে—বাবা নালু এলি? কতক্ষণ যে বসে ঢুলুনি নেমেচে চকি।

—ভাত বাড়ো। খিদে পেয়েচে।

—হাত পা ধুয়ে আয়। ময়না জল রেখে দিয়েচে ছেঁচতলায়।

—ময়না কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে।

—এর মধ্যি ঘুম?

——ওমা, কি বলিস? ছেলেমানুষের চকি ঘুম আসে না এত রাত্তিরি?

—পরের বাড়ি যেতে হবে যে। না হয় আর এক বছর। তারা খাটিয়ে নেবে তবে খেতে দেবে। বসে খেতে দেবে না। চকি ঘুম এলি তারা শোনবে না।

নালু ভাত খেতে বসলো। উচ্ছেচচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল। ব্যস, আর কিছু না। রাঙা আউস চালের ভাত আর কলাইয়ের ডাল মেখে খাবার সময় তার মুখে এমন একটি তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠলো যা বসে দেখবার ও উপভোগ করবার

মতো।

ময়না এসে বললে—দাদা, তামাক সাজি?

—আন।

—তুমি নাকি আমায় বক্‌ছিলে ঘুমুইচি বলে, মা বলচে।

—বকচিই তো। ধাড়ী মোষ, সংসারে কাজ নেই—এত সকালে ঘুম কেন?

—বেশ করবো।

—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—আ মোলো যা—

—গাল দিও না দাদা বলে দিচ্ছি। তোমার খাই না পরি?

—তবে কার খাস পরিস, ও পোড়ারমুখী?

—মার।

—মা তোমাকে এনে দেয় রোজগার করে! বাঁদ্‌রি কোথাকার, ধুচুনি মাথায় দোজবরে বুড়ো বর যদি তোর না আনি—

—ইস বঁটি দিয়ে নাক কেটে দেবো না বুড়ো বরের? হাঁ দাদা, তুমি আমাদের বৌদিদিকে কবে আনচো?

—তোমায় আগে পার করি। তবে সে কথা। তোমার মত খাণ্ডার ননদকে বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে—

—আহাহা! কথার কি ছিরি! খাণ্ডার ননদ দেখো তখন বৌদিদির কত কাজ করে দেবে। আমার পাল্‌কি কই?

—পাল্‌কি পাই নি। পোড়ানো থাকে না তো। স্বরো পোটোকে ব'লে রেখেছি। রথের সময় রং করে দেবে।

—পুতুলের বিয়ে দেব আষাঢ় মাসে। তার আগে কিনে দিতে হবে পাল্‌কি। না যদি দাও তবে—

—যা যা, তামাক সেজে আন। বাজে বকুনি রেখে দে।

ময়না তামাক সেজে এনে দিল। অল্প কয়েক টান দিয়েই নালু পাল একটা মাদুর দাওয়ায় টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

গ্রীষ্মকাল। আতা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে। আকাশে সামান্য একটু

জ্যোৎস্না উঠেছে কৃষ্ণাতিথির।

নন্দীদের বাগানে শেয়াল ডেকে উঠলো। রাত হয়েচে নিতান্ত কমও নয়। এ পাড়া নিষুতি হয়ে এসেছে।

ময়না আবার এসে বললে—পা টিপে দেবো?

—না না, তুই যা। ভারি আমার—

—দিই না।

—রাত হয়েচে। শুগে যা। কাল সকালে আমায় ডেকে দিবি। সাঁতবেড়েতে যাবো জমি দেখতি।

—ডাকবো। পা টিপতি হবে না তো?

—না, তুই যা।

নালু পাল বাড়ি ফিরবার পথে সন্নিসিনীর আখড়ায় একটা ক'রে আধলা পয়সা দিয়ে যায় প্রতি রাত্রে। দেবদ্বিজে ওর খুব ভক্তি, ব্যবসায় উন্নতি তো হবে ওঁদেরই দয়ায়। সন্নিসিনীর আশ্রম বাঁওড়ের ধারের রাস্তার পাশে প্রাচীন এক বটবৃক্ষতলে, নিবিড় সাঁই-বাবলা বনের আড়ালে, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। সন্নিসিনীর বাড়ি ধোপাখোলা. সে নাকি হঠাৎ স্বপ্ন পেয়েছিল, এ গ্রামের এই প্রাচীন বটতলার জঙ্গলে শ্মশানকালীর পীঠস্থান সাড়ে তিনশো বছর ধরে লুকোনো। তাই সে এখানে এসে জঙ্গল কেটে আশ্রম বসিয়েছিল বছর সাতেক আগে। এখন তার অনেক শিষ্যসেবক, পূজো-আচ্চা ধন্না দিতে আসে ভিন্ন গ্রামের কত লোক।

সন্ধ্যার পরে যারা আসে, বৈঁচি গাছের জঙ্গল ঘেঁষে যে খড়ের নীচু ঘরখানা, যার মাথার উপর বটগাছের বড় ডালটা, যেখানে বাসা বেঁধেচে অজস্র বাবুই, যেখানে ঝোলে কলাবাদুড়ের পাল রাত্রের অন্ধকারে, সেই ঘরটির দাওয়ায় বসে ওরা গাঁজার আড্ডা জমায়।

নালুকে বললে ছিহরি জেলে,—কেডা গা? নালু?

—হ্যাঁ।

—কি করতি এলে ?

—মায়ের বিত্তিটা দিয়ে যাই। রোজ আসি।

—বিত্তি ?

—হ্যাঁ গো।

—কত ?

—দশ কড়া। আধ পয়সা।

—বসো। একটু ধোঁয়া ছাড়বা না ?

—না, ওসব চলে না। বোসো তোমরা। আর কে কে আছে ?

—নেই এখন কেউ। হরি বোষ্টম আসে, মনু যুগী আসে, দ্বারিক কর্মকার আসে, হাফেজ আসে, মনসুর নিকিরি আসে।

নালু কি একটা কথা বলতে গিয়ে বড় অবাক হয়ে গেল। তার চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে উঠলো। দেওয়ানবাড়ির জামাই বাঁড়ুয্যে মশাইকে সে হঠাৎ দেখতে পেলে অশত্থতলার দিকে আসতে। উনিও কি এখানে গাঁজার আড্ডায় –?

নালু দাঁড়ালো চুপ করে দাওয়ার বাইরে ছেঁচতলায়।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে বটতলায় বসলেন আসনের সামনে। মূর্তি নেই, ত্রিশূল বসানো সিঁদুরলেপা একটা উঁচু জায়গা আছে গাছতলায়, আসন বলা হয় তাকেই। ভবানী বাঁড়ুয্যে একমনে বসে থাকবার পরে সন্নিসিনী সেখানে এসে বসলো তাঁর পাশেই। সন্নিসিনীর রং কালো, বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, মুখশ্রী তাড়কা রাক্ষসীকে লজ্জা দেয়, মাথার দুদিক থেকে দুটি লম্বা জট এসে কোলের ওপর পড়েচে।

ভবানী বললেন—কি খেপী, খবর কি ?

—ঠাকুর, কি খবর বলো।

—সাধনা-টাধনা করচো ?

—আপনাদের দয়া। জেতে হাড়িডোম, কি সাধনা করবো আমরা ঠাকুর ? আজও আসনসিদ্ধি হোল না দেবতা।

—আমি আসবো সামনের অমাবস্যেতে, দেখিয়ে দেবো প্রণালীটা।

—ওসব হবে না ঠাকুর। আর ফাঁকি দিও না। আমাকে শেখাও।

—দূর খেপী, আমি কি জানি? তাঁর দয়া। আমি সাধনভজন করিও নে, মানিও নে—তবে দেখি তোমাদের এই পর্যন্ত।

—আমায় ঠকাতে পারবে না ঠাকুর। তুমি রোজ এখানে আসবে সন্দের পর। যত সব অজ্ঞান লোকেরা ভিড় করে রাতদিন; নিয়ে এসো ওষুধ, নিয়ে এসো মামলা জেতা, ছেলে হওয়া—

—সে তোমারই দোষ। সেটা না করতেই পারতে গোড়া থেকে। ধন্না দিতে দিলে কেন?

—তুমি ভুলে যাচ্ছ। এ জায়গাটা গোরাসাহেবের বাংলা নয়—তবে এত লোক আসে কেন? ধর্মের জন্যে নয়। অবস্থা ঘোরাবার জন্যে। মামলা জেতবার জন্যে!

—সে তো বুঝি।

—একটু থেকে দেখবেন না দিনের বেলায়। এত রাতে আর কি আছে? চলে গেল সবাই। কি বিপদ যে আমার। সাধনভজন সব যেতে বসেচে, ডাক্তারবদ্যি সেজে বসেচি। শুধু রোগ সারাও, আর রোগ সারাও।

নালু পাল এ সব শুনে কিছু বুঝলে, কিছু বুঝলে না। ভবানী বাঁড়ুয্যেকে সে অনেকবার দেখেচে, দেওয়ান মহাশয়ের জামাই সুচেহারার লোক বটে, দেখলে ভক্তি হয়। বাড়ি ফিরে মাকে সে বল্লে—একটা চমৎকার জিনিস দেখলাম আজ! সন্নিসিনীর গুরু হলেন আমাদের দেওয়ানজির ভগ্নিপতি বড়দিদি-ঠাকরুণের বর। তিন দিদি-ঠাকরুণেরই বর। সব কথা বোঝলাম না, কি বল্লেন, কিন্তু সন্নিসিনী যে অত বড়, সে একেবারে তটস্থ।

তিলু বললে—এত রাত করলেন আজ! ভাত জুড়িয়ে গেল। নিলু ইদিকি আয়, জায়গা করে দে—বিলু কোথায়?

নিলু চোখ মুছতে মুছতে এল। রান্নাঘরের দাওয়া ঝাঁট দিতে দিতে বললে—

বিলু ঘুমিয়ে পড়েচে। কোথায় ছিলেন নাগর এত রাত অব্ধি? নতুন কিছু জুটলো কোথাও?

ভবানী বাঁড়ুয্যে অপ্রসন্ন মুখে বললেন—তোমার কেবল যতো—

—হি হি হি—

—হ্যাঁঃ—হাসলেই মিটে গেল।

—কি করতে হবে শুনি তবে।

—ত্যাখো গে লোকে কি করচে। মানুষ হয়ে জন্মে আর কিছু করবে না? শুধু খাবে আর বাজে বকবে?

—ওগো অতশত উপদেশ দিতি হবে না আপনার। আপনি পরকালের ইহকালের সর্বস্ব আমাদের। আর কিছু করতে হয়, সে আপনি করুন গিয়ে। আমরা ডুমুরের ডালনা দিয়ে ভাত খাবো আর আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবো। এতিই আমাদের স্বগ্গো। খেয়ে উঠে খোকাকে ধরুন।

ভবানী খেয়ে উঠে খোকনকে আদর করলেন কতক্ষণ ধরে। আট মাসের সুন্দর শিশু। তিলুর খোকা। সে হাব্লার মত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর অকারণে একগাল হাসি হাসে দন্তবিহীন মুখে, বলে ওঠে—গ্-গ্-গ্-গ্—

ভবানী বলেন—ঠিক ঠিক।

—হেঁ—এ—এ—ইয়া। গ্-গ্-গ্-গ্-গ্—

—ঠিক বাবা।

খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিজের হাতখানা নিজের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে—যেন কত আশ্চর্য জিনিস। ভবানীর সামনে অনন্ত আকাশের এক ফালি। বাঁশবনে জোনাকি জ্বলচে। অন্ধকারে পাকা কুলের গন্ধের সঙ্গে বনমালতী ও ঘেঁটকোল ফুলের গন্ধ। নক্ষত্র উঠেচে এখানে ওখানে আকাশে। কত বড় আকাশ, কত নক্ষত্র—চাঁদ উঠেচে কৃষ্ণা তৃতীয়ার, পূর্ব দিগন্ত আলো হয়েচে। এই ফুল, এই অন্ধকার, এই অবোধ শিশু, এই নক্ষত্র-ওঠা আকাশ সবই এক হাতের তৈরি বড় ছবি। ভবানী অবাক হয়ে যান ওর খোকার মতই।

তিলু বললে—খোকনের ভাত দেবেন কবে ?

—ভাত হবে উপনয়নের সময়।

—ওমা, সে আবার কি কথা! তা হয় না, আপনি অন্নপ্রাশনের দিনক্ষ্যাণ দেখুন। ও বললি চলবে না।

—তোমাদের বাঙালদেশে এক রকম, আমাদের আর এক রকম। ওসব চলবে না আমাদের নদে-শান্তিপুরের সমাজে। তুমি ওকে একটু আদর কর দিকি ?

তিলু তার সুন্দর মুখখানি খোকনের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে কানের মাকড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে অনবদ্য ভঙ্গিতে আদর করতে লাগলো—ও খোকন, ও সন্‌লু, তুমি কার খোকন ? তুমি কার সন্‌লু, কার মান্‌কু ? সঙ্গে সঙ্গে খোকা মায়ের চুল ক্ষুদ্র একরত্তি হাতের মুঠো দিয়ে অক্ষম আকর্ষণে টেনে এনে, মায়ের মাথার লুটস্ত কালো চুলের কয়েক গাছি নিজের মুখের কাছে এনে খাবার চেষ্টা করলে। তারপর দন্তবিহীন একগাল হাসি হাসলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

ভবানী বাঁড়ুযো একবার আকাশের দিকে চাইলেন, নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ—নিচে এই মা ও ছেলের ছবি। অমনি স্নেহময়ী মা আছেন এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে, নইলে এই মা, এই স্নেহ এখানে থাকতো না—ভবানী বাঁড়ুয্যে ভাবেন।

ভবানী কত পথে পথে বেড়িয়েচেন, কত পর্বতে সাধু-সন্নিসির খোঁজ করেচেন, কত যোগাভ্যাস করেচেন, আজকাল এই মা-ছেলের গভীর যোগাযোগের কাছে তাঁর সকল যোগ ভেসে গিয়েচে। অনুভূতি সর্বাশ্রয়ী, সর্বমঙ্গলকর সে অনুভূতির দ্বারপথে বিশ্বের রহস্য যেন সবটা চোখে পড়লো। ক্ষণশাশ্বতীর অমরত্ব আসা-যাওয়ার পথের এই রেখাই যুগে যুগে কবি, ঋষি ও মরমী সাধকেরা খোঁজেন নি কি ?

তিনি আছেন তাই এই মা আছে, ছেলে আছে, ফুল আছে, স্নেহ আছে, আত্মত্যাগ আছে, সেবা আছে, প্রেমিকা আছে, প্রেমিক আছে।

ভবানীর মনে আছে তিনি একবার কানপুরে একজন প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়কের গান শুনেছিলেন, তাঁর নাম ছিল কানহাইয়া লাল সাস্তারা, প্রসিদ্ধ গায়ক

হনুমানদাসজীর তিনি ছিলেন গুরুভাই। স্থায়ীর বাণীটি শ্রোতাদের সামনে নিখুঁত পাকা সুরে শুনিয়ে নিয়ে তারপর এমন সুন্দর অলঙ্কার সৃষ্টি করতেন, এমন মধুর স্বরলহরী ভেসে আসতো তাঁর কণ্ঠ থেকে সুরপুরের বীণানিক্কণের মত—যে কতকাল আগে শুনলেও আজও যখনি চোখ বোজেন ভবানী শুনতে পান ত্রিশ বছর আগে শোনা সেই অপূর্ব দরবারী কানাড়ার সুরপুঞ্জ।

বড় শিল্পী সবার অলক্ষ্যে কখন যে মনোহরণ করেন, কখন তাঁর অমর বাণী দরদের সঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেন মানুষের অন্তরতম অন্তরটিতে!

ভবানী বিস্মিত হয়ে উঠলেন। এই মা ও শিশুর মধ্যেও সেই অমর শিল্পীর বাণী, অন্য ভাষায় লেখা আছে। কেউ পড়তে পারে, কেউ পারে না।

বাইরে বাঁশগাছে রাতচরা কি পাখী ডাকচে, জিউলি গাছের বউলের মধু খেতে যাচ্ছে পাখীটা। জেলেরা আলোয় মাছ ধরছে বাঁওড়ে, ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্চে তার। আলোয় মাছ ধরতে হোলে নৌকার ওপর ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে হয়—এ ভবানী বাঁড়ুযো এদেশে এসে দেখচেন। বেশ দেশ। ইছামতীর স্নিগ্ধ জলধারা তাঁর মনের ওপরকার কত ময়লা ধুয়ে মুছে দিয়েচে। সংসারের রহস্য যারা প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছে করে. তারা চোখ খুলে যেন বেড়ায় সব সময়। সংসার বর্জন করে নয়, সংসারে থেকেই সেই দৃষ্টি লাভ করতে পারার মন্ত্র ইছামতী যেন তাকে দান করে। কলস্বনা অমৃতধারাবাহিনী ইছামতী!···যে বাণী মনে নতুন আশা আনন্দ আনে না, সে আবার কোন্ ঈশ্বরের বাণী?

তিলু বললে—সত্যি বলুন, কবে ভাত দেবেন?

—তুমিও যেমন, আমরা গরীব। তোমার বাপের বাড়ির মান বজায় রেখে দিতে গেলে কত লোককে নেমন্তন্ন করতে হবে। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড হবে। আমি ঝামেলা পছন্দ করিনে।

—সব ঝামেলা পোয়াবো আমি। আপনাকে কিছু ভাবতি হবে না।

—যা বোঝো করো। খরচ কেমন হবে?

—চালডাল আনবো বাপের বাড়ি থেকে। দু'টাকার তরকারি এক গাড়ি হবে। পাঁচখানা গুড় পাঁচসিকে। আধ মণ দুধ এক টাকা। দেড় মণ মাছ

পনের টাকা। আবার কি ?

—কত লোক খাবে ?

—দু'শো লোক খাবে ওর মধ্যে। আমার হিসেব আছে। দাদার লোক-জন খাওয়ানোর বাতিক আছে, বছরে যজ্ঞি লেগেই আছে আমাদের বাড়ি। তিরিশ টাকার ওপর যাবে না।

—তুমি তো বলে খালাস। তিরিশ টাকা সোজা টাকা! তোমার কি, বড় মানুষের মেয়ে। দিব্যি বলে বসলে।

তিলু রাগভরে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে—আমি শুনবো না, দিতিই হবে খোকার ভাত।

নিলু কোথা থেকে এসে বললে—দেবেন না ভাত ? তবে বিয়ে করবার শখ হয়েছিল কেন ?

ভবানী তিরস্কারের সুরে বললেন--তুমি কেন এখানে ? আমাদের কথা হচ্চে—

নিলু বললে—আমারও বুঝি ছেলে নয় ?

—বেশ। তাই কি ?

—তাই এই—খোকনের ভাত দিতি হবে সামনের দিনে।

ভবানী বাঁড়ুয্যের নবজাত পুত্রটির অন্নপ্রাশন। তিলু রাত্রে নাড়ু তৈরি করলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পুরো পাঁচ ঝুড়ি। খোকা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, যে দেখে সে-ই ভালবাসে। তিলু খোকার জন্য একছড়া সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছে দাদাকে বলে। রাজারাম নিজের হাতে সোনার হারছড়া ভাগ্নের গলায় পরিয়ে দিলেন।

তিলুদের অবস্থা এমন কিছু নয়, তবুও গ্রামের কাউকে ভবানী বাঁড়ুয্যে বাদ দিলেন না। আগের দিন পাড়ার মেয়েরা এসে পর্বতপ্রমাণ তরকারি কুটতে বসলো। সারারাত জেগে সবাই মাছ কাটলে ও ভাজলে।

গ্রামের কুসী ঠাকরুণ ওস্তাদ রাঁধুনী, শেষরাতে এসে তিনি রান্না চাপালেন,

মুখুয্যেদের বিধবা বৌ ও ন'ঠাকরুণ তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

ভাত রান্না হোল কিন্তু বাইরে লম্বা বান্ কেটে। আর ছিরু রায় এবং হরিনাপিত বাকী মাছ কুটে ঝুড়ি করে বাইরের বানে নিয়ে এল ভাজিয়ে নিতে। ভাত যারা রান্না করছিল, তারা হাঁকিয়ে দিয়ে বললে—এখন তাদের সময় নেই। নিজেরা বান্ কেটে মাছ ভাজুক গিয়ে। এই কথা নিয়ে দুই দলে ঘোর তর্ক ও ঝগড়া, বৃদ্ধ বীরেশ্বর চক্কত্তি এসে দু'দলের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন শেষে।

রাজারামের এক দূরসম্পর্কের ভাইপো সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেচে। সেখানে সে আমুটি কোম্পানীর কুঠিতে নকলনবিশ। গলায় পৈতে মালার মত জড়িয়ে রাঙা গামছা কাঁধে সে রান্নার তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিল। বড় চালের কথাবার্তা বলে। হাত-পা নেড়ে গল্প করছিল—কলকাতায় একরকম তেল উঠেচে, সায়েবরা জ্বালায়, তাকে মেটে তেল বলে। সায়েবরা জ্বালায় বাতিতে। বড় দুর্গন্ধ।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—পিদিম জ্বলে?

—না। সায়েববাড়ির বাতিতে জ্বলে। কাঁচ বসানো, সে এখানে কে আনবে? অনেক দাম।

হরি রায় বললেন—আমাদের কাছে কল্‌কেতা কলকেতা করো না। কল্‌কেতায় যা আছে তা আগে আসবে আমাদের নীলকুঠিতে। এদের মতো সায়েব কলকাতায় নেই।

—নাঃ নেই! কলকাতার কি দেখেচ তুমি? কখনো গেলে না তো। নৌকা ক'রে চলো নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা, নাকি কলের গাড়ি উঠেচে সায়েবদের দেশে? নীলকুঠির নদেরচাঁদ মণ্ডল শুনেচে ছোট সায়েবের মুখে। ওদের দেশ থেকে নাকি কাগজে ছেপে ছবি পাঠিয়েচে। কলের গাড়ি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে কোলে নিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করতে চললেন, পেছনে পেছনে স্বয়ং রাজারাম চললেন ফুল আর খই ছড়াতে ছড়াতে। দীনু মুচি ঢোল বাজাতে বাজাতে চললো। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চললো তার

ছেলে। রায়পাড়া, ঘোষপাড়া ও পুবেরপাড়া ঘুরে এলেন ভবানী বাঁড়ুয্যে অতটুকু শিশুকে কোলে করে নিয়ে। বাড়ি বাড়ি শাঁখ বাজতে লাগলো। মেয়েরা ঝুঁকে দেখতে এল খোকাকে।

ব্রাহ্মণভোজনের সময় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা হতে লাগলো। কে কত কলাইয়ের ডাল খেতে পারে। কে কত মাছ খেতে পারে। মিষ্টি শুধু নারকোল নাড়ু। খেতে বসে অনেকে বললেন এমন নারকোলের নাড়ু তাঁরা অনেককাল খান নি। অন্য কোন মিষ্টির রেওয়াজ ছিল না দেশে। এক একজন লোক সাত-আট গণ্ডা নারকোলের নাড়ু, আরো অতগুলো অন্নপ্রাশনের জন্য ভাজা আনন্দনাড়ু উড়িয়ে দিলে অনায়াসে।

ব্রাহ্মণভোজন প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় কুখ্যাত হলা পেকে বাড়িতে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে। ভবানী ওকে চিনতেন না, নবাগত লোক এ গ্রামে। অন্য সকলে তাকে খুব খাতির করতে লাগলো। রাজারাম বললেন— এসো বাবা হলধর, বাবা বসো—

ফণি চক্কত্তি বললেন—বাবা হলধর, শরীর গতিক ভালো?

দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার, রণ-পা পরে চল্লিশ ক্রোশ রাস্তা রাতারাতি পার হওয়ার ওস্তাদ, অগুন্তি নরহত্যাকারী ও লুটেরা, সম্প্রতি জেল-ফেরত হলা পেকে সবিনয়ে হাতজোড় ক'রে বললে—আপনাদের ছিচরণের আশিব্বাদে বাবাঠাকুর—

—কবে এলে?

—এ্যালাম শনিবার বেন্‌বেলা বাবাঠাকুর। আজ এখানে দুটো পেরসাদ পাবো ব্রাহ্মণের পাতের—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বোসো।

হলা পেকে নীলকুঠির কোর্টের বিচারে ডাকাতির অপরাধে তিন বৎসর জেলে প্রেরিত হয়েছিল। গ্রামের লোকে সভয়ে দেখলে সে খালাস পেয়ে ফিরেচে। ওর চেহারা দেখবার মত বটে। যেমন লম্বা তেমনি কালো দশাসই সাজোয়ান পুরুষ, একহাতে বন্‌বন্ করে ঢেঁকি ঘোরাতে পারে, অমন লাঠির ওস্তাদ এদেশে নেই—একেবারে নির্ভীক, নীলকুঠির মুডি সাহেবের টম্‌টম্ গাড়ী উল্টে দিয়েছিল

ঘোড়ামারির মাঠের ধারে। তবে ভরসা এই দেবদ্বিজে নাকি ওর অগাধ ভক্তি, ব্রাহ্মণের বাড়ি সে ডাকাতি করেচে বলে শোনা যায় নি, যদিও এ-কথায় খুব বেশী ভরসা পান না এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা।

হলা পেকে খেতে বসলে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই বলতে লাগলো বাবা হলধর, ভালো ক'রে খাও।

হলধর অ'বিশ্যি বলবার আবশ্যক রাখলে না কারো। দু কাঠা চালের ভাত, দু হাঁড়ি কলাইয়ের ডাল, এক হাঁড়ি পায়েস, আঠারো গণ্ডা নারকেলের নাড়ু, একখোরা অম্বল আর দু ঘটি জল খেয়ে সে ভোজন-পর্ব সমাধা করলে।

তারপর বললে—খোকার মুখ দেখবো।

তিলু শুনে ভয় পেয়ে বললে—ওমা, ও খুনে ডাকাত, ওর সামনে খোকারে বার করবো না আমি।

শেষ পর্যন্ত ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজে খোকাকে কোলে নিয়ে হলা পেকের কোলে তুলে দিতেই সে গাঁট থেকে এক ছড়া সোনার হার বার ক'রে খোকার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে,—আমার আর কিছু নেই দাদা-ভাই, এ ছেল, তোমারে দিলাম। নারায়ণের সেবা হলো আমার!

ভবানী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হারছড়ার দিকে চেয়ে বললেন—না, এ হার তুমি দিও না। দামী জিনিসটা কেন দেবে? বরং কিছু কিনে দিও—

হলা পেকে হেসে বললে—বাবাঠাকুর, আপনি যা ভাবচেন, তা নয়। এ লুঠের মাল নয়। আমার ঘরের মানুষের গলার হার ছেল, তিনি স্বগগে গিয়েচে আজ বাইশ-তেইশ বছর। আমার ভিটেতে ভাঁড়ের মধ্যে পোঁতা ছেল। কাল এরে তুলে তেঁতুল দিয়ে মেজেচি। অনেক পাপ করেছি জীবনে। ব্রাহ্মণকে আমি মানিনে বাবাঠাকুর। সব তুচ্ছ। খোকাঠাকুর নিষ্পাপ নারায়ণ। ওর গলায় হার পরিয়ে আমার পরকালের কাজ হোল। আশীর্ব্বাদ করুন।

উপস্থিত সকলে খুব বাহবা দিলে হলা পেকেকে। ভবানী নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন বড়। তিলুকে নিয়ে এসে দেখাতে তিলুও বললে—আপনি ওকে ফেরত দিন। খোকনের গলায় ও দিতি মন সরে না।

—নেবে না। বলি নি ভাবচো ? মনে কষ্ট পাবে। হাত জোড় করে বললে।

—বলুক গে। আপনি ফেরত দিয়ে আসুন।

—সে আর হয় না, যতই পাপী হোক, নত হয়ে যখন মাপ চায়, নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার ওপর রাগ করি কি ক'রে ? না হয় এর পরে হার ভেঙে সোনা গালিয়ে কোন সৎকাজে দান করলেই হবে।

তিলু আর কোন প্রতিবাদ করলে না। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হোল, সে মন খুলে সায় দিচ্ছে না এ প্রস্তাবে।

হলা পেকে সেই দিনটি থেকে রোজ আসতে আরম্ভ করলে ভবানী বাঁড়ুয্যের কাছে। কোনো কথা বলে না, শুধু একবার খোকনকে ডেকে দেখে চলে যায়।

একদিন ভবানী বললেন—শোনো হে, বোসো—

সামান্য বৃষ্টি হয়েছে বিকেলে। ভিজে বাতাসে বকুল ফুলের সুগন্ধ। হলা পেকে এসে বসে নিজের হাতে তামাক সেজে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে দিলে। এখানে সে যখনই এসে বসে, তখন যেন সে অন্যরকম লোক হয়ে যায়। নিজের মুখে নিজের কৃত নানা অপরাধের কথা বলে—কিন্তু গর্বের সুরে নয়, একটি ক্ষীণ অনুতাপের সুর বরং ধরা পড়ে ওর কথার মধ্যে।

—বাবাঠাকুর, যা করে ফেলিচি তার আর কি করবো। সেবার গোসাঁই বাড়ির দোতলায় ওঠলাম বাঁশ দিয়ে। ছাদে উঠি দেখি স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে। স্বামী তেমনি জোয়ান, আমারে মারতি এলো বর্শা তুলে। মারলাম লাঠি ছুঁড়ে, মেয়েটা আগে মলো। স্বামী ঘুরে পড়লো, মুখি থান-থান রক্ত উঠতি লাগলো। দুজনেই সাবাড়।

—বলো কি ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর। যা করে ফেলিচি তা বলতি দোষ কি ? তখন যৈবন বয়েস ছেল, ত্যাতো বোঝতাম না। এখন বুঝতি পেরে কষ্ট পাই মনে।

—রণ-পা চড়ো কেমন ? কতদূর যাও ?

—এখন আর তত চড়িনে। সেবার হলুদপুকুরি ঘোষেদের বাড়ি লুঠ করে

রাত-দুপুরির সময় রণ-পা চড়িয়ে বেরোলাম। ভোরের আগে নিজের গাঁয়ে ফিরেলাম। এগারো কোশ রাস্তা।

—ওর চেয়ে বেশি যাও না?

—একবার পনেরো কোশ পজ্জন্ত গিইলাম। নন্দীপুর থেকে কামারপেঁড়ে। মুরশিদ মোড়লের গোলাবাড়ি।

—এইবার ওসব ছেড়ে দাও। ভগবানের নাম করো।

—তাই তো আপনার কাছে যাতায়াত করি বাবাঠাকুর, আপনাকে দেখে কেমন হয়েচে জানিনে। মনটা কেমন ক'রে ওঠে আপনাকে দেখলি। একটা উপায় হবেই আপনার এখানে এলি, মনডা বলে।

—উপায় হবে। অন্যায় কাজ একেবারে ছেড়ে না দিলে কিন্তু কিছুই করতে পারা যাবে না বলে দিচ্চি।

হলা পেকে হঠাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যের পা ছুঁয়ে বললে—আপনার দয়া বাবাঠাকুর। আপনার আশীব্বাদে হলধর যমকেও ডরায় না। রণ-পা চড়িয়ে যমের মুণ্ডু কেটে আনতি পারি, যেমন সেবার এনেলাম ঘোড়ের ডাঙ্গায় তুষ্টু কোলের মুণ্ডু—শোনবেন সে গল্প—

হলা পেকে অট্টহাস্য করে উঠলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে দেখতে পেলেন পরকালের ভয়ে কাতর ভীরু হলধর ঘোষকে নয়, নির্ভীক, দুর্জয়, অমিততেজ হলা পেকেকে—যে মানুষের মুণ্ডু নিয়ে খেলা করেচে, যেমন কিনা ছেলেপিলেরা খেলে পিটুলির ফল নিয়ে! এ বিশালকায়, বিশালভুজ হলা পেকে মোহমুদ্গরের শ্লোক শুনবার জন্যে তৈরি সেই—নরহন্তা, দস্যু আসলে যা তাই আছে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে দেড় বছরের মধ্যেই এ গ্রামকে, এ অঞ্চলকে বড় ভালো বাসলেন। এমন ছায়াবহুল দেশ তিনি কোথাও দেখেন নি জীবনে। বৈঁচি বাঁশ, নিম, সোঁদাল, রড়া কুঁচলতার বনঝোপ। দিনে-রাতে শালিখ, দোয়েল, ছাতারে আর বৌ-কথা-ক পাখীর কাকলী। ঋতুতে ঋতুতে কত কি বনফুলের

সমাবেশ। কোনো মাসেই ফুল বাদ যায় না—বনে বনে ধুন্দুলের ফুল, রাধালতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বউল, সুঁয়ো, বনচট্‌কা, নাটা-কাঁটার ফুল।

ইছামতীর ধারে এদেশে লোকের বাস নেই, নদীর ধারে বনঝোপের সমাবেশ খুব বেশী। ভবানী বাঁড়ুয্যে একটি সাধন কুটির নির্মাণ করে সাধনভজন করবেন, বিবাহের সময় থেকেই এ ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু ইচ্ছামতীর ধারে অধিকাংশ জমি চাষের সময় নীলকুঠির আমীনে নীলের চাষের জন্য চিহ্নিত করে যায়। খালি জমি পাওয়া কঠিন। ভবানী বাঁড়ুয্যেও আদৌ বৈষয়িক নন, ওসব জমিজমার হাঙ্গামে জড়ানোর চেয়ে নিস্তব্ধ বিকেলে দিব্যি নির্জনে গাঙের ধারের এক যজ্ঞিডুমুর গাছের ছায়ায় বসে থাকেন। বেশ কাজ চলে যাচ্চে। জীবন ক'দিন? কেন বা ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। ভালোই আছেন।

তাঁর এক গুরুভ্রাতা পশ্চিমে মির্জাপুরের কাছে কোন পাহাড়ের তলায় আশ্রমে থাকেন। খুব বড় বেদান্তের পণ্ডিত—সন্ন্যাসাশ্রমের নাম চৈতন্য ভারতী পরমহংসদেব। আগে নাম ছিল গোপেশ্বর রায়। ভবানীর সঙ্গে অনেকদিন একই টোলে ব্যাকরণ পড়েচেন। তারপর গোপেশ্বর কিছুকাল জমিদারের দপ্তরে কাজ করেন পাটুলি-বলাগড়ের সুপ্রসিদ্ধ রায়বাবুদের এস্টেটে। হঠাৎ কেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে চলে যান, সে খবর ভবানী জানেন না; কিন্তু আশ্রমে বসবার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে দু'চারখানা চিঠি দিতেন।

সেই সন্ন্যাসী গোপেশ্বর তথা চৈতন্যভারতী পরমহংস একদিন এসে হাজির ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ি। একমুখ আধ্-পাকা আধ-কাঁচা দাড়ি, গেরুয়া পরনে, চিমটে হাতে, বগলে ক্ষুদ্র বিছানা। তিলু খুব যত্ন-আদর করলে। ঘরের মধ্যে থাকবেন না। বাইরে বাঁশতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে বসে থাকেন সারাদিন। ভবানী বল্লেন—পরমহংসদেব, সাপে কামড়াবে। তখন আমায় দোষ দিও না যেন।

চৈতন্যভারতী বল্লেন—কিছু হবে না ভাই। বেশ আছি।

—কি খাবে?

—সব।

—মাছমাংস ?

—কোনো আপত্তি নেই। তবে খাই না আজকাল। পেটে সহ্য হয় না।

—আমার স্ত্রীর হাতে খাবে ?

—স্বপাক।

—যা তোমার ইচ্ছে।

তিলুকে কথাটা বলতেই তিলু বিনীতভাবে সন্ন্যাসীর কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বললে—দাদা—

পরমহংস বললেন—কি ?

—আপনি আমার হাতের রান্না খাবেন না ?

—কারো হাতে খাইনে দিদি। তবে ইচ্ছে হয়ে থাকে রেঁধে দিতে পারো। মাছ-মাংস কোরো না।

—মাছের ঝোল ?

—না।

—কই মাছ, দাদা ?

—তুমি দেখচি নাছোড়বান্দা। যা খুশি কর গিয়ে।

সেই থেকে তিলু শুচিশুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর রান্না রাঁধে। বিলু নিলু যত্ন ক'রে খাবার আসন ক'রে তাঁকে খেতে ডাকে। তিন বোনে পরিবেশন করে ভবানী বাঁড়ুয্যে ও সন্ন্যাসীকে।

ইছামতীর ধারে যজ্ঞিডুমুর গাছতলায় সন্ধ্যার দিকে দুজনে বসেচেন। পরমহংস বললেন—হ্যাঁ হে, একে রক্ষা নেই, আবার তিনটি।...

—কুলীনের মেয়ের স্বামী হয় না জানো তো ? সমাজে এদের জন্যে আমাদের মন কাঁদে। সাধনভজন এ জন্মে না হয় আগামী জন্মে হবে। মানুষের দুঃখ তো ঘোচাই এ জন্মে। কি কষ্ট যে এদেশের কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের।

—মেয়ে তিনটি বড় ভালো। তোমার খোকাকেও বেশ লাগলো।

—আমার বয়েস হোল বাহান্ন। ততদিন যদি থাকি, ওকে পণ্ডিত করে যাবো

—তার চেয়ে বড় কাজ—ভক্তি শিক্ষা দিও।

—তুমি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। ভূতের মুখে রাম নাম?

—বৈদান্তিক হওয়া সহজ নয় জেনো। বেদান্তকে ভালো ভাবে বুঝতে হোলে আগে ন্যায়-মীমাংসা ভালো ক'রে পড়া দরকার। নইলে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকমত বোঝা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করা বড় কষ্টসাধ্য।

—আমাকে পড়াও না দিনকতক?

—দিনকতকের কর্ম নয়। ন্যায় পড়তেই অনেকদিন কেটে যাবে। তুমি ন্যায় পড়, আমি এসে বেদান্ত শিক্ষা দেবো। তবে সাধনা চাই। শুধু পড়লে হবে না। সংসারে জড়িয়ে পড়েচ, ভজন করবে কি ক'রে? এজন্মে হোল না।

—কুছ্ পরোয়া নেই। ওই জন্যেই ভক্তির পথ ধরেচি।

—সেও সহজ কি খুব? জ্ঞানের চেয়েও কঠিন। জ্ঞান স্বাধ্যায় দ্বারা লাভ হয়, ভক্তি তা নয়। মনে ভাব আসা চাই, ভক্তির অধিকারী হওয়া সবচেয়ে কঠিন। কোনটাই সহজ নয় রে দাদা।

—তবে হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবো?

—তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্—গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁতে চিত্ত নিযুক্ত রাখলে তিনিই তাঁকে পাবার বুদ্ধি দান করেন—দদামি বুদ্ধিযোগং তং—

—তুমিই তো আমার উত্তর দিলে।

—বিয়েটা করে একটু গোলমাল করে ফেলেচো। জড়িয়ে পড়বে। একেবারে তিনটি—একেই রক্ষা থাকে না।

—পরীক্ষা করে দেখি না একটা জীবন। তাঁর কৃপায় দৌড়টাও তো বোঝা যাবে। ভাগবতে শুকদেব বলেচেন—গৃহৈর্দারাসুতৈষণাং—গৃহস্থের মত ভোগ দ্বারা পুত্র-স্ত্রী নিয়ে ঘর করবার বাসনা দূর করবে। তাই করচি।

—তা হোলে এতকাল পরিব্রাজক হয়ে তীর্থে বেড়ালে কেন, যদি গৃহস্থ সাজবার বাসনাই মনে ছিল তোমার?

—ভেবেছিলাম বাসনা ক্ষয় হয়েছে। পরে দেখলাম রয়েচে। তবে ক্ষয়ই

করি। শুকদেবের কথাই বলি—ত্যক্তৈষণাঃ সর্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্—সকল বাসনা ত্যাগ করে পরে তপোবনে যাবে। কিন্তু বাসনা থাকতে নয়। সংসার করলে ভগবানকে ডাকতে নেই তাই বা তোমায় কে বলেচে?

—ডাকতে নেই কেউ বলে নি। ডাকা যায় না এই কথাই বলেচে। জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় না।

—বেশ দেখবো। ভগবান তোমাদের মত অত কড়া নয়। অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না যে সংসারে থাকলে ভক্তিলাভ হয় না। সংসার তবে ভগবান সৃষ্টি করলেন কেন? তিনি প্রতারণা করবেন তাঁর অবোধ সন্তানদের? যারা নিতান্ত অসহায়, তিনি পিতা হয়ে তাদের সামনে ইচ্ছে করে মায়া ফাঁদ পেতেছেন তাদের জালে জড়াবার জন্যে? এর উত্তর দাও।

—এষাবৃতির্নাম তমোগুণস্য—তমোগুণের শক্তিই আবরণ। বস্তু যথার্থভাবে প্রতিভাত না হয়ে অন্য প্রকারে প্রতিভাত হয়—এই জন্যেই তমোগুণের নাম বৃতি। ভগবানকে দোষ দিও না। ও ভাবে ভগবানকে ভাবচো কেন? বেদান্ত পড়লে বুঝতে পারবে। ও ভাবে ভগবান নেই। তিনি কিছুই করেন নি। তোমার দৃষ্টির দোষ। মায়ার একটা শক্তির নাম বিক্ষেপ, এই বিক্ষেপ তোমাকে মোহিত করে রেখে ভগবানকে দেখতে দিচ্চে না।

—তাঁর শরণাগত হয়ে দেখাই যাক না। তাঁর কৃপার দৌড়টা দেখবো বলিচি তো। মায়াশক্তি-ফাক্ত যত বড়ই হোক, তাদের চেয়ে তাঁর শক্তি বড়। মায়াশক্তি কি ভগবান ছাড়া? তাঁর সংসারে সবই তাঁর জিনিস। তিনি ছাড়া আবার মায়া এল কোথা থেকে? গোঁজামিল হয়ে যাবে যে।

—গোঁজামিল হয় নি। আমার কথা তুমি বুঝতেই পারলে না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলেচে, 'অজামেকাং' অজ্ঞান কারো সৃষ্ট নয়। যিনিই সমষ্টিরূপে ঈশ্বর, তিনিই ব্যষ্টিতে কার্যরূপে জীব। অদ্বৈত বেদান্তে বলে, সমষ্টিতে বর্তমান যে চৈতন্য তাই হোল কার্য। অর্থাৎ ঈশ্বর [illegible]র্তা, জীব কার্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়েই এক। কেবল উপাধিতে ভিন্ন। তুমিই তোমার ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর কে?

—একবার এক রকম বল্লে, গীতার শ্লোক ওঠালে—আবার এখন অদ্বৈত

বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে এসে ফেল্লে।

গীতার শ্লোক ওঠানোতে কি অন্যায় করলাম?

—গীতা হোল ভক্তিশাস্ত্র। অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানের শাস্ত্র। দু'য়ে মিলিও না।

—ও কথাই বলো না। বড় কষ্ট হলো একথা তোমার মুখে শুনে। বেদান্তে ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্য সব দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকারই করে নি। একমাত্র বেদান্তেই ব্রহ্মকে খাড়া করে বসেচে। সেই বেদান্ত নিরীশ্বরবাদী!

—নিরীশ্বরবাদী বলি নি। ভক্তিশাস্ত্র নয় বলিচি।

—তুমি কিছুই জানো না। তোমাকে এবার আমি 'চিৎসুখী' আর 'খণ্ডনখণ্ড খাদ্য' পড়াবো। তুমি বুঝবে কি অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা ব্রহ্মকে সন্ধান করেছেন। তবে বড় শক্ত দুরবগাহ গ্রন্থ। তর্কশাস্ত্র ভালো করে না পড়লে বোঝাই যাবে না। দেখবে বেদান্তের মধ্যে অন্য কোনো কুতর্কের বা বিকৃত ভাষ্যের ফাঁক বুজিয়ে দিয়েছে কি ভাবে। আর তুমি কি-না বলে বসলে—

—আমি কিছুই বলে বসি নি। তুমি আর আমি অনেক তফাৎ। তুমি মহাজ্ঞানী—আমি তুচ্ছ গৃহস্থ। তুমি যা বলবে তার ওপর আমার কথা কি? আমার বক্তব্য অন্য সময়ে বলবো।

—বোলো, তুমি অনুরাগী শ্রোতা এবং বক্তা। তোমাকে শুনিয়ে এবং বলে সুখ আছে।

—তোমার সঙ্গে দুটো ভালো কথা আলোচনা করেও আনন্দ হোল। এ গ্রাম একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু আছে নীলকুঠি আর সায়েব আর জমি আর জমা আর বিষয়—এই নিয়ে। আমার শ্যালকটি তার মধ্যে প্রধান। তিনি নীলকুঠির দেওয়ান। সায়েব তাঁর ইষ্টদেব। তেমনি অত্যাচারী। তবে গোবরে পদ্মফুল আমার বড় স্ত্রী।

—ভালো?

—খুব। অতিরিক্ত ভালো।

—বাকী দুটি?

—ভালো, তবে এখনো ছেলেমানুষি যায় নি। আদুরে বোন কিনা

দেওয়ানজির! এদিকে সৎ।

ভবানী বাঁড়ুয্যে আর পরমহংস সন্ন্যাসীকে দিনকতক প্রায়ই নদীর ধারে বসে থাকতে দেখা যেতো। ঠিক হোল যে সন্ন্যাসী তিলু বিলু নিলুকে দীক্ষা দেবেন। তিলু রাত্রে স্বামীকে বললে আপনি গুরু করেচেন?

—কেন?

—দীক্ষা নেবেন না?

—কি বুদ্ধি যে তোমার! আহা মরি! এই সন্নিসি ঠাকুর আমার গুরুভাই হোল কি ক'রে যদি আমার দীক্ষা না হয়ে থাকে?

—ও ঠিক ঠিক। আমিও দীক্ষা নেবো না।

—কেন? কেন?

তিলু কিছু বললে না। মুচকি হেসে চুপ করে রইল। প্রদীপের আলোর সামনে নিজের হাতের বাউটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেই দেখতে লাগলো। একটা ছোট ধুনুচিতে ধুনো গুঁড়ো করে দিতে লাগলো। এটি ভবানীর বিশেষ খেয়াল। কোনো শৌখিনতা নেই যে স্বামীর, কোনো আকিঞ্চন নেই, কোনো আবদার নেই—স্বামীর এ অতি তুচ্ছ খেলালটুকুর প্রতি তিলুর বড় স্নেহ। রোজ শোবার সময় অতি যত্নে ধুনো গুঁড়ো ক'রে সে ধুনুচিতে দেবে এবং বার বার স্বামীকে জিগ্যেস করবে—গন্ধ পাচ্ছেন? কেমন গন্ধ—ভালো না?

তিলুকে হঠাৎ চলে যেতে উদ্যত দেখে ভবানী বললেন—চলে যাচ্ছ যে? খোকা কই?

তিলু হেসে বললে—আহা, আজ তো নিলুর দিন। বুধবার আজ যে—মনে নেই? খোকা নিলুর কাছে। নিলু আনবে।

—না, আজ তুমি থাকো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—বা রে, তা কখনো হয়। নিলু কত শখের সঙ্গে ঢাকাই শাড়ীখানা পরে খোকাকে কোলে ক'রে বসে আছে।

—তুমি থাকলে ভালো হোত তিলু। আচ্ছা বেশ। খোকনকে নিয়ে আসতে বলো।

একটু পরে নিলু ঘরে ঢুকলো খোকনকে কোলে নিয়ে। ওর কোলে ঘুমন্ত খোকন। খোকনের গলায় হলা পেকের উপহার দেওয়া সেই হার ছড়াটা। অতি সুন্দর খোকন। ভবানী বাঁড়ুয্যে এমন খোকা কখনো দেখেন নি। এত সুন্দর ছেলে এবং এত চমৎকার তার হাবভাব। এক এক সময় আবার ভাবেন অন্য সবাই তাদের সন্তানদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলবে না কি? এমন কি খুব কুৎসিত সন্তানদের বাপ-মাও? তবে এর মধ্যে অসত্য কোথায় আছে? নিলু খোকাকে সন্তর্পণে শুইয়ে দিলে, ভবানী চেয়ে চেয়ে দেখলেন—কি সুন্দর ভাবে ওর বড় বড় চোখ দুটি বুজিয়ে ঘুমে নেতিয়ে আছে খোকন। তিনি আস্তে আস্তে সেই অবস্থায় তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতেই খোকা নিমীলিত চোখেই বুদ্ধদেবের মত শান্ত হয়ে রইল. কেবল তার ঘাড়টি পিছন দিকে হেলে পড়তে দেখে ভবানী পিছন থেকে একটা হাত দিয়ে ওর ঘাড় ধ'রে রাখলেন। নিলু তাড়াতাড়ি এসে বললে—ওকি? ওর ঘাড় ভেঙে যাবে যে! কি আক্কেল আপনার?

ভবানীর ভারি আমোদ লাগলো, কেমন সুন্দর চুপটি করে চোখ বুজে একবারও না কেঁদে কেষ্টনগরের কারিগরের পুতুলের মত বসে রইল।

নিলুকে বললেন—দ্যাগো দ্যাখো কেমন দেখাচ্ছে—তিলুকে ডাকো—তোমার দিদিকে ডাকো—

নিলু বললে—আহা-হা মরে যাই। কেমন ক'রে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে, কেন ওকে অমন কষ্ট দিচ্ছেন? ছি ছি—শুইয়ে দিন—

তিলু এসে বললে—কি?

—দ্যাখো কেমন দেখাচ্চে খোকনকে?

—আহা বেশ!

—মুখে কান্না নেই, কথা নেই।

—কথা থাকবে কি? ও ঘুমে অচেতন যে। ও কি কিছু বুঝতে পাচ্চে, ওকে বসানো হয়েছে, কি করা হয়েচে?

নিলু বললে—এবার শুইয়ে দিন। আহা মরে যাই, সোনামণি আমার—

শুইয়ে দিন, ওর লাগচে। দিদি কিছু বলবে না আপনার সামনে।

খোকাকে শুইয়ে দিয়ে হঠাৎ ভবানীর মনে হলো, ঠিক হয়েছে, শিশুর সৌন্দর্য বুঝবার পক্ষে তার বাপ-মাকে বাদ দিলে চলবে কেন? শিশু এবং তার বাপ-মা একই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা মালা। এরা পরস্পরকে বুঝবে। পরস্পর পরস্পরকে ভালো বলবে—সৃষ্টির বিধান এই। নিজেকে বাদ দিলে চলবে না। এও বেদান্তের সেই অমর বাণী, দশমস্তমসি। তুমিই দশম। নিজেকে বাদ দিয়ে গুনলে চলবে কেন?

তার পরদিন সকালে এল হলা পেকে, তার সঙ্গে এল হলা পেকের অনুচর দুর্ধর্ষ ডাকাত অঘোর মুচি। অঘোর মুচিকে তিলুরা তিন বোনে দেখে খুব খুশি। অঘোর ওদের কোলে ক'রে মানুষ করেচে ছেলেবেলায়।

তিলু বললে—এসো অঘোর দাদা, জেল থেকে কবে এলে?

অঘোর বললে—কাল এ্যালাম দিদিমণিরা। তোমাদের দেখতি এ্যালাম, আর বলি সন্নিসি ঠাকুরকে দেখে একটা পেরণাম করে আসি। গঙ্গাচানের ফল হবে। কোথায় তিনি?

—তিনি বাড়ি থাকেন কারো? ওই বাঁশতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন দ্যাখো গিয়ে। অঘোর দাদা এসো, কাঁঠাল খাবা। তোমরা দুজনেই বোস।

—খোকনকে দেখবো দিদিমণি। আগে সন্নিসি ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে আসি।

বাঁশতলার আসনে চৈতন্যভাবতী ধ্যান ক'রে বসে ছিলেন। ধুনি জ্বালানো ছিল না। হলা পেকে আর অঘোর মুচি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

সন্ন্যাসী বললেন—কে?

—মোরা, বাবা।

হলা পেকে বললে—এ আমার শাকরেদ, অঘোর। গারদ থেকি কাল খালাস পেয়েচে। এই গাঁয়েই বাড়ি।

—জেল হয়েছিল কেন?

—আপনার কাছে লুকুবো কেন বাবা। ডাকাতি করেলাম দুজনে।

ড়ুজনেরই হাজত হয়েল।

—খুব শক্তি আছে তোমাদের ডুজনেরই। ভালো কাজে সেটা লাগালে দোষ কি?

—দোষ কিছু নেই বাবা। হাত নিস্‌পিস্ করে। থাকতি পারিনে।

চৈতন্যভারতী বললেন—হাত নিস্‌পিস্ করুক। যে মনটা তোমাকে ব্যস্ত করে, সেটা সর্বদা সৎকাজে লাগিয়ে রাখো। মন আপনিই ভালো হবে।

হলা পেকে বসে বসে শুনলে। অঘোর মুচির ওসব ভালো লাগছিল না. সে ভাবছিল তিলু দিদিমণির কাছ থেকে একখানা পাকা কাঁটাল চেয়ে নিয়ে খেতে হবে। এমন সময় নিলু সেখানে এসে ডাকলে—ও সন্নিসি দাদা—

চৈতন্যভারতী বললেন—কি দিদি?

—পাকা কলা আর পেঁপে নিয়ে আসবো? ছ্যান্ হয়েচে?

—না হয় নি। তুমি নিয়ে এসো, ওতে কোনো আপত্তি নেই। আচ্ছা এ দেশে ছ্যান্ করা বলে কেন?

—কি বলবে?

—কিছু বলবে না। তুমি যাও, যত্তরে বাঙাল সব কোথাকার! নিয়ে এসো কি খাবার আছে।

—অমনি বললি আমি কিন্তু আনবো না সেটুকু বলে দিচ্চি, দাদা।

হলা পেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—তাহলে মুই রণ-পা পরি?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—রণ-পা পরে কি হবে?

—আপনার জন্যি কলা-মূলো সংগেরো ক'রে নিয়ে আসি। নিলু দিদি তো চটে গিয়েচে।

অঘোর মুচি বললে—মোর জন্যি একখানা পাকা কাঁটাল। ও দিদিমণি, বড্ড খিদে নেগেছে।

নিলু বললে—যাও বাড়ি গিয়ে বড়দিদি বলে ডাক দিয়ো। বড়দি দেবে এখন।

—না দিদি, তুমি চলো। বড়দি এখুনি বকবে এমন। গারদ খেটে এসিচি

—কেন গিইছিলি, কি করিছিলি, সাত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আর সবাই তো জানে, মুই চোর ডাকাত। খাতি পাইনে তাই চুরি ডাকাতি করি, খাতি পেলি কি আর করতাম। গেরামে এসে যা দেখচি, চালের কাঠা দু' আনা দশ পয়সা। তাতে আর কিছুদিন গারদে থাকলি হোত ভালো। খাবো কেমন করে অত আক্রা চালের ভাত? ছেলেপিলেরে বা কি খাওয়াবো। কি বলেন বাবাঠাকুর?

সন্নিসি বললেন—যা ভালো বোঝো তাই করবে বাবা। তবে মানুষ খুন কোরো না। ওটা করা ঠিক নয়।

হলা পেকে এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিল। মানুষ খুনের কথায় সে এবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। হলা আসলে হল খুনী। অনেক মুণ্ডু কেটেছে মানুষের। খুনের কথা পাড়লে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

চৈতন্যভারতীর সামনে এসে বল্লে—জোড়হাত করি বাবাঠাকুর। কিছু মনে করবেন না। একটা কথা বলি শুনুন। পানচিতে গাঁয়ের মোড়ল-বাড়ি সেবার ডাকাতি করতি গেলাম। যখন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠচি, তখন ছোট মোড়ল মোরে আটকালে। ওর হাতে মাছমারা কোঁচ। এক লাঠির ঘায়ে কোঁচ ছুঁড়ে ফেলে দেলাম—আমার সামনে লাঠি ধরতি পারবে কেন ছেলে-ছোকরা? তখন সে ইট তুলি মারতি এল। আমি ওরে বললাম—আমার সঙ্গে লাগতি এসো না, সরে যাও। তা তার নিয়তি ঘুনিয়ে এসেচে, সে কি শোনে? আমায় একটা খারাপ গালাগালি দেলে। সঙ্গে সঙ্গে এক লাঠিতে ওর মাথাটা দোফাঁক করে দেলাম। উল্টে পড়লো গড়িয়ে সিঁড়ির নিচে, কুমড়ো গড়ান দিয়ে।

নিলু বললে—ইস্ মাগো!

চৈতন্যভারতী মশায় বললেন—তারপর?

—তারপর শুনুন আশ্চয্যি কাণ্ড। বড় মোড়লের পুতের বৌ, দিব্যি দশাসই সুন্দরী, মনে হোল আঠারো-কুড়ি বয়স—চুল এলো করে দিয়ে এই লম্বা সড়কি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দোতলার মুখি সিঁড়ির নিচে, যেখান থেকে চাপা সিঁড়ি

ফেলবার দরজা।

ভারতী মশাই অনেকদিন ঘরছাড়া, জিজ্ঞেস করলেন—চাপা সিঁড়ি কি?

নিলু বললে—চাপা সিঁড়ি দেখেন নি? আমার বাপের বাড়ি আছে দেখাব। সিঁড়িতে ওঠবার পর দোতলায় যেখানে গিয়ে পা দেবেন, সেখানে থেকে চাপা সিঁড়ি মাথার ওপর দিয়ে ফেলে দেয়। সে দরজার কবাট থাকে মাথার ওপর। তাহোলে ডাকাতেরা আর দোতলায় উঠ্তি পারে না।

—কেন পারবে না?

হলা পেকে উত্তর দিলে এ কথার। বললে—আপনাকে বুঝিয়ে বল্তি পারলে না দিদিমণি। চাপা সিঁড়ি চেপে ফেলে দিলি আর দোতলায় ওঠা যায় না। বড্ড কঠিন হয়ে পড়ে। এমনি সিঁড়ি যা, তার মুখের কবাট জোড়া কুড়ুল দিয়ে চালা করা যায়, চাপা সিঁড়ির কবাট মাথার ওপর থাকে, কুড়ুল দিয়ে কাটা যায় না! বোঝলেন এবার?

—যাক, তারপর কি হোল?

—তখন আমি দেখচি কি বাবাঠাকুর সাক্ষাৎ কালী পিরৃতিমে। মাথার চুল এলো, দশাসই চেহারা, কি চমৎকার গড়ন-পেটন, মুখচোখ—সড়কি ধরেচে যেন সাক্ষাত্ দশভুজা দুগ্গা। ঘাম-তেল মুখে চকচক্ করচে, চোখ দুটোতে যেন আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্চে। সত্যি বলচি বাবাঠাকুর, অনেক মেয়ে দেখিচি, অমন চেহারা আর কখনো দেখিনি। আর সড়কি চালানো কি? যেন তৈরি হাত। ব্যাকা ক'রে খোঁচা মারে, আর লাগলি নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে নেবে এমনি হাতের ট্যার্চা তাক্। মনে মনে ভাবি, সাবাস্ মা, বলিহারি! দুধ খেয়েলে বটে!

—তারপর? তারপর?

চৈতন্যভারতী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সোজা হয়ে উঠে বসলেন ধুনির সামনে।

—একবার ভাবলাম যা থাকে কপালে, লড়ে দেখবো। তারপর ভাবলাম, না, পিছু হটি। গতিক আজ ভাল না। আমি পিছিয়ে পড়িচি, বীরো হাড়ি

বললে,—

পরক্ষণেই জিভ্ কেটে ফেলে বললে—ওই ছ্যাখো দলের লোকের নাম করে ফেলেলাম! কেউ জানে না যে ব্যাটা আমাদের সাংড়ার লোক ছিল। যাক্, আপনারা আর ওর কথা বলে দিতি যাচ্ছেন না নীলকুঠির সায়েবের কাছে—

ভারতী মশায় বললেন—নীলকুঠির সায়েব কি করবে?

—সে কি বাবাঠাকুর? এদেশে বিচের-আচার সব তো কুঠির সায়েবেরা করেন। আমার আর অঘোরের গারদ হয়েল, সেও বিচার করেন ওই বড়সায়েব। তারপর শুনুন। বীরো হাড়ি ব্যাটা এগিয়ে গেল। আমাদের বললে, দুয়ো! মেয়েলোকের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেলি এম্নি মরদ?··· সিঁড়ির ওপরের ধাপে দুপ্ দুপ্ ক'রে উঠে গেল। আমি ঘুরে দাঁড়িইচি,—মেয়েলোকের গায়ে হাত দিলি বীরো হাড়ির একদিন না আমার একদিন—মুই দেখে নেবো! এমন সময়—'বাপরে'! বলে বীরো হাড়ি একেবারে চিৎ হয়ে সিঁড়ির মুখে পড়ে গেল। তারপরই উঠে দু হাত তলপেটে দিয়ে কি একটা টানচে দড়ির মত—আমি ভাবচি ওটা আবার কি? কাছে গিয়ে দেখি তলপেট হাঁ হয়ে ফুটো বেরিয়েছে, সেই ফুটো দিয়ে পেটের রক্তমাখা নাড়ি দড়ির মতো চলে গিয়েচে ওপরে সড়কির ফলার আলের সঙ্গে গিঁথে। —সড়কি যত টান দিচ্চে বৌমা, ওর পেটের নাড়ি ততই হড় হড় ক'রে বেরিয়ে বেরিয়ে চলেছে ওপর-বাগে। আর বেশীক্ষণ না, চোখ পাল্টাতি আমি গিয়ে ওরে পাঁজাকোলা করে তুলি বাইরে ·য়ে এসে বসলাম। এট্টু জল পাইনে যে ওর মৃত্যুকালে মুখে দিই, কারণ আমি তো বুঝচি ওর হয়ে এল—

ভারতী মশাই বললেন—সেই সড়কিতে গাঁথা নাড়িটা?

—লাঠির এক ঝটকায় নাড়ি ছিঁড়ে দিইচি, নইলে আনচি কোথা থেকে? তা বড্ড শক্ত জান হাড়ির পো'র। মরে না। শুধু গোঙায় আর বোধ হয় জল জল করে,—বুঝতি পারি না। ইদিকে নোক এসে পড়বে, তখন বড্ড হৈ-চৈ হচ্চে বাইরে। কি করি, বাড়ির পেছনে একটা ডোবা পর্যন্ত ওরে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গ্যালাম, তখনো ও গোঁ গোঁ করে হাত নেড়ে কি বলে।

রক্তে ধরণী ভাসচে বাবাঠাকুর। লোকজন এসে পড়বার আর দ্রিং নেই। তখন বেমো মুচির কাতানখানা চেয়ে নিয়ে এক কোপে ওর মুণ্ডুটা ঝট্‌কে ফেলে ধড়টা ডোবায় টান্ মেরে ফেলে দেলাম—মুণ্ডুটা সাথে নিয়ে এ্যালাম। কেননা তাহলি লাশ সেনাক্ত করতি পারবে না—ব্যাটা বীরো হাড়ির মুণ্ডু চোখ চেয়ে মোর দিকি চেয়ে বলে যেন আমারে বকুনি দেচ্চে—এখনো যেন চোখ দুটো মুই দেখতি পাই, যেন মোর দিকি চেয়ে কত কি বলচে মোরে—

—তারপর সে বৌটির কি হোল ?

—কিছু জানি নে। তবে দু' মাস পরে ফকির সেজে আবার গিয়েলাম মোড়লবাড়ি সেই বৌটাবে দেখবো বলে।—দুটো ভিক্ষে দাও মা ঠাকরুণ, যেমন বলিচি অমনি তিনি এসে মোরে ভিক্ষা দেলেন। বেলা তখন দুপুর, রাত্তিরি ভালো দেখতি পাইনি ; মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, জগদ্ধাত্তিরি পিরতিমে। দশাসই চেহারা, হর্তেলের মত রং, দেখে ভক্তি হোল। বললাম —মা খিদে পেয়েচে।

মা বললেন—কি খাবা ?

বললাম—ঝা দেবা। তখন তিনি বাড়ির মধ্যি গিয়ে আধ-খুঁচি চিঁড়ে-মুড়কি এনে আমার ঝুলিতে দেলেন। মুই মোছলমান সেজেচি, গড় হয়ে পেরণাম করলি সন্দেহ করতি পারে, তাই হাত তুলে বললাম—সালাম, মা—বলে চলে এ্যালাম। কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল দু'পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে লুটিয়ে পেরণাম করি। তারপর চলে এ্যালাম—

নিলু এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে শুনছিলো, এইবার বললে—সে যদি মরেই গিয়েচে দাদা, তবে আবার তোমাদের দলের লোকে বলে জিভ কাটলে কেন ? সে কিসে মরেচে তা আজো কেউ জানে না।

—দিদিমণি তুমি কি বোঝো। নীলকুঠির লোক গিয়ে তার দুটো ছেলেকে টস্তোন-কুস্তোন করবে। বলবে, তোর বাবা কনে গিয়েচে। এ আজ ছ'সাত বছরের কথা। লোক জানে বীরো হাড়ি গঙ্গার ধারে আর একটা বিয়ে ক'রে সেখানেই বাস করচে। মোর সাংড়ার লোক রটিয়ে দিয়েচে। ওর ছেলে দুটো

এখন লাঙল চষতি পারে। বড় ছেলেডা খুব জোয়ান হবে ওর বাবার মত।

—বৌটিকে আর দ্যাখো নি?

—না, তারপরই দু'বছর গারদ বাস। সে অন্য কারণে। এ ডাকাতির কিনারা হয় নি!

চৈতন্যভারতী বললেন—তোমার মুখে এ কাহিনী শুনে ভাবচি বৌমার সঙ্গে আমি দেখা করে আসবো। তারা কি জাত বললে?

—সদ্‌গোপ।

—আমি যাবো সেখানে। শক্তিমতী মেয়েরা জগদ্ধাত্রীর অবতার। তুমি ঠিকই বলেচ।

—বাবাঠাকুর, আপনি বোধ হয় ইদিকি আর কখনো আসেন নি, থাকেনও না। অমন কিন্তু এখানে আরো দু-চারটে আছে। তবে ভদ্দর গেরস্ত বাড়িতে আর দেখি নি ওই বৌটি ছাড়া। বাগদি, দুলে, মুচি, নমশুদ্দুরের মধ্যে অনেক মেয়ে পাবেন যারা ভাল সড়কি চালায়, কোঁচ চালায়, ফালা চালায়, কাতান চালায়।

নিলু বললে—আমি জানি। সেবার নীলকুঠির দাঙ্গায় দাদা স্বচক্ষে দেখেচেন খড়ের ছোট্ট চালাঘরের মধ্যে থেকে দুটো দুলেদের বৌ এমন তীর চালাচ্চে, নীলকুঠির বরকন্দাজ হটে গেল

—বাঃ বাঃ, বড় খুশি হলাম শুনে দিদি। ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ হয় যদি এই শক্তিমতী মায়েদের একবার সাক্ষাৎ পাই। জয় মা জগদম্বা।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এই সময় গাড়ু হাতে কোথা থেকে আসছিলেন, সেখান থেকে বলে উঠলেন—আরে, ও কি ভায়া! একেবারে মা জগদম্বা! নাঃ, বৈদান্তিক জ্ঞানীর ইয়েটা একেবারে নষ্ট করে দিলে?

—ভাই, নিত্য থেকে লীলায় নামলেই মা বাবা। বৈদান্তিকের তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! বলেচি তো তোমাকে সেদিন। বেদান্ত অত সোজা জিনিস নয়। অদ্বৈত বেদান্ত বুঝতে বহুদিন যাবে। জীব গোস্বামীর বেদান্ত বরং কিছু সহজ।

—ও কথা থাক্। কি নিয়ে কথা বলছিলে ?

—লীলার কথা। এদেশের মেয়েদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা। সবই মায়ের লীলা।

নীলু বলে উঠল—হ্যাঁ, ভালো কথা—বড়দি ভালো ঢাল আর লাঠির খেলা জানে। একবার আকবর আলি লেঠেলের সঙ্গে লড়ি চালিয়েছিল ঢাল আর লড়ি নিয়ে। নীলকুঠির বড় লেঠেল আকবর আলি। বড়দি এমন আগ্‌লেছিল, একটা লড়ির ঘাও মারতি পারে নি ওর গায়ে। শরীরে শক্তিও আছে বড়দির। দুটো বড় বড় ক্ষিত্তুরে ঘড়া কাঁকে মাথায় ক'রে নিয়ে আসতে পারে। এখনও পারে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হলা পেকে ও অঘোর মুচিকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ডাক দিলেন—ও তিলু, শুনে যাও—ও তিলু, ও বড় বৌ—

তিলু খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। একটু পরে খোকাকে কোলে ক'রে এসে হলা পেকে উত্তর দিলে—বড়দি, পেটের জ্বালায় এইচি। খাতি দ্যাও, নইলে লুঠ হবে।

তিলু হেসে বললে—আমি লাঠি ধরতি জানি।

—সে তো জানি।

—বার করি ঢাল লড়ি ?

—কিসের লড়ি ?

—ময়না কাঠের।

অঘোর মুচি বললে—সত্যি বড়দি, হাত বজায় আছে তো ?

—খেলবি নাকি এক দিন ? মনে আছে সেই রথতলার আখড়াতে ? তখন আমার বয়েস কত—সতেরো-আঠারো হবে—

—উঃ, সে যে অনেকদিনের কথা হয়ে গেল। তখন রথতলার আখড়াতে মোদের বড্ড খেলা হোত। মনে আছে খুব।

—বসো, আমি আসচি।

একটু পরে দুটি বড় কাঁটাল দু' হাতে বোঁটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসে তিলু ওদের

সামনে রাখলে। বললে—খাও ভাই সব, দেখি কেমন জোয়ান—

হলা পেকে বললে—কোন্ গাছের কাঁটাল দিদি ?

—মালসি।

—খাজা না রসা ?

—রস খাজা। এখন আষাঢ়ের জল পেলে কাঁটাল আর রসা থাকে ? খাও দুজনে।

মিনিট দশ-বারোর মধ্যে অঘোর মুচি তার কাঁটালটা শেষ করলে। হলা পেকের দিকে তাকিয়ে বললে—কি ওস্তাদ, এখনো বাকি যে ?

—কাল রাত্তিরি খাসির মাংস খেয়েলাম সের দুয়েক। তাতে করে ভাল খিদে নেই।

তিলু বললে—সে হবে না দাদা। ফেলতি পারবে না। খেতে হবে সবটা। অঘোর দাদা, আর একখানা দেবো বার করে ? ও গাছের আর কিন্তু নেই। খয়েরখাগীর কাঁঠাল আছে খান চারেক, একটু বেশি খাজা হবে।

—দ্যাও, ছোট দেখে একখানা।

হলা পেকে বললে—খেয়ে নে অঘ্‌রা, এমন একখানা কাঁটালের দাম হাটে এক আনার কম নয়, এমন অসময়ে। মুই একখানা শেষ করে আর পারবো না। বয়েসও তো হয়েচে তোর চো.। দ্যাও দিদিমণি, একটু গুড় জল দ্যাও—

তিলু বললে—তা হোলে সাকৃরেদের কাছে হেরে গেলে দাদা। গুড় জল এমনি খাবে কেন, দুটো ঝুনো নারকোল দি, ভেঙে দুজনে খাও গুড় দিয়ে। তবে বেশি গুড় দিতি পারবো না। এবার সংসারে গুড় বাড়ন্ত। দশখানা কেনা ছিল, দুখানাতে ঠেকেচে। উনি বেজায় গুড় খান।

দিনটা বেশ আনন্দে কাটল।

হলা পেকে এবং অঘোর মুচি চলে যাওযার সময় চৈতন্যভারতী মহাশয়কে আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে নিয়ে রোজ নদীতে নাইতে যান সন্ধ্যাবেলা,

আজও গেলেন। ইছামতীর নির্জন স্থানে নিবিড় নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে দিয়ে মুক্তো খোঁজা জেলেরা (কারণ ইছামতীতে বেশ দামী মুক্তাও পাওয়া যেত) গত শীতকালে যে সুঁড়ি পথটা কেটে করেছিল, তারই নীচে বাব্‌লা, যজ্ঞিডুমুর, পিটুলি ও নটকান গাছের তলায় ভবানী ও তিলু নিজেদের জন্যে একটা ঘাট করে নিয়েচে, সেখানে হল্‌দে বাব্‌লা ফুল ঝরে পড়ে টুপটাপ করে স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলের ওপর, গুলঞ্চের সরু ছোট লতা নট্‌কান ডাল থেকে জলের ওপর ঝুলে পড়ে, তেচোকো মাছের ছানা স্নানরতা তিলু সুন্দরীর বুকের কাছে খেলা করে, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়; ঘনান্তরাল বনকুঞ্জের ছায়ায় কত কি পাখী ডাকে সন্ধ্যায়। ওদের কেউ দেখতে পায় না ডাঙার দিক থেকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে জলে নেমে বললেন—চলো সাঁতার দিয়ে ওপারে যাই—

তিলু বললে—চলুন, ওপারের ক্ষেত থেকে পটল তুলে আনি—

—ছিঃ, চুরি করা হয়। পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি তোমার—চুরি বোঝ না?

—যা বলেন। আমরা কত তুলে আনতাম।

—দেবে সাঁতার?

—চলুন। গো-ঘাটার দিকে যাবেন? মাঠের বড় অশথতলার দিকে?

তিলু অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সাঁতার দেয়। সুন্দর, ঋজু তনুদেহটি জলের তলায় নিঃশব্দে চলে, পাশে পাশে ভবানী বাঁড়ুয্যে চলেন।

হঠাৎ এক জায়গায় গহিন কালো জলে ভবানী বাঁড়ুয্যে বলে ওঠেন—ও তিলু, তিলু!

তিলু এগিয়ে চলেছিল, থেমে স্বামীর কাছে ফিরে এসে বললে—কি? কি?

ভবানী দু হাত তুলে অসহায়ের মত খাবি খেয়ে বললে—তুমি পালাও তিলু। আমায় কুমীরে ধরেচে—তুমি পালাও! পালাও! খোকাকে দেখো!…

তিলু হতভম্ব হয়ে বললে—কি হয়েচে বলুন না! কি হয়েচে? সে কি গো!

জল খেতে খেতে ভবানী দু'হাত তুলে ডুবতে ডুবতে বললেন—খো-কা-কে দেখো! খোকাকে দেখো—খো-ও-ও—

তিলু শিউরে উঠলো জলের মধ্যে, বর্ষা-সন্ধ্যার কালো নদীজল এক্ষুনি কি তার প্রিয়তমের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে? এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল জীবনের সব কিছু সাধ-আহ্লাদ?

চক্ষের নিমেষে তিলু জলে ডুব দিলে কিছু না ভেবেই।

স্বামীর পা কুমীরের মুখ থেকে ছাড়িয়ে নেবে কিংবা নিজেই কুমীরের মুখে যাবে। ডুব দিয়েই স্বচ্ছ জলের মধ্যে সে দেখতে পেলে, প্রকাণ্ড এক শিমুলগাছের গুঁড়ি জলের তলায় আড়ভাবে পড়ে, এবং তারই ডালপালার কাঁটায় স্বামীর কাপড় মোক্ষম জড়িয়ে আটকে গিয়েচে! হাতের এক এক ঝটকায় কাপড়খানা ছিঁড়ে ফেললে খানিকটা। আবার জলের ওপর ভেসে স্বামীকে বললে—ভয় নেই, ছাড়িয়ে দিচ্ছি, শিমুল কাঁটায় বেধেচে—

আবার দম নিয়ে আরো খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে। জলের মধ্যে খুব ভাল দেখাও যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে জলের তলায়, কি ক'রে কাপড় বেধেচে ভালো বোঝাও যায় না। আবার ও ডুব দিলে, আবার ভেসে উঠলো। তিন-চার বার ডুব দেওয়ার পর স্বামীকে মুক্ত করে অবসন্নপ্রায় স্বামীকে শক্ত হাতে ধরে ভাসিয়ে ডাঙার দিকে অল্প জলে নিয়ে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হাঁপ নিয়ে বললেন—বাবাঃ! ওঃ!

তিলুর কাপড় খুলে গিয়েছিল, চুলের রাশ এলিয়ে গিয়েছিল, দু'হাতে সেগুলো এঁটেসেঁটে নিলে, চুল জড়িয়ে নিলে, সেও বেশ হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি স্বামীর দিকে। আহা, বয়েস হয়ে গিয়েচে ওঁর, তবু কি সুন্দর চেহারা! আজ কি হোত আর একটু হোলে?

হেসে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে—বাপরে, কি কাণ্ডটা করে বসেছিলেন সন্দে বেলায়!

ভবানী বাঁড়ুয্যেও হাসলেন।

—খুব সাঁতার হয়েচে, এখন চলুন বাড়ি—

—তুমি ভাগ্যিস ডুব দিয়ে দেখেছিলে! কে জানত ওখানে শিমুলগাছের গুঁড়ি রয়েছে জলের তলায়। আমি কুমীর ভেবে হাত পা ছেড়ে দিয়েছিলাম তো—

প্রায়ান্ধকার নির্জন পথ দিয়ে দুজন বাড়ি ফিরে চলে।

তিলু ভাবছিল—উঃ, আজ কি হোত, যদি সত্যি সত্যি ওঁর কিছু হোত!

তিলু শিউরে উঠলো।

স্বামী চলে গেলে সে কি বাঁচতো?

নীলকুঠির বড়সাহেবের কামরায় দেওয়ান রাজারামের ডাক পড়েছিল। সম্প্রতি তিনি হাতজোড় করে বড়সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে।

বড়সাহেব কাঠে-খোদা পাইপ খেতে খেতে বলেন—টোমার কাজ ঠিকমট হইটেছে না।

—কেন হুজুর?

—নীলের চাষ এবার এট লো ফিগার—কম হইল কি ভাবে?

—হুজুর, মাপ করেন তো ঠিক কথা বলি। সেবার সেই রাহাতুনপুরির কাণ্ডকারখানার পর—

জেন্ বিল্‌দ্ শিপ্‌টন্ হঠাৎ টেবিলের ওপর দুম্ করে ঘুষি মেরে বললে—ও সব শুনিটে চাই না—আই ডোণ্ট উইশ ইউ স্পিন দ্যাট রিগম্যারোল ওভার হিয়ার এগেন—কাজ চাই, কাজ। ডুশো বিঘা জমিতে এ বছর নীল বুনিটে হইবে। বুঝিলে? বাজে কঠা শুনিটে চাই না।

—হুজুর।

—মিঃ ডঙ্কিন্‌সন্ বদলি হইয়া গেলো। নটুন ম্যাজিস্ট্রেট আসিল। এ আমাদের ডলে আছেন। নীলের ডাডন এ বছর ব্রিস্ক্‌লি আরম্ভ করিটে হইবে, ফিগার চাই। ডাডনের খাটা রোজ আমাকে ডেখাইবে।

—হুজুর।

শ্রীরাম মুচি এ সময়ে সাহেবের কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে রাজারাম বললেন—হুজুর, এ লোককে জিজ্ঞেস করুন। এদের চরপাড়া গ্রামের মুচিপাড়ার লোকে কিছুতে নীল বুনতি দেবে না, আপনি জিগ্যেস করুন ওকে—

সাহেব শ্রীরাম মুচিকে বললে—কি কঠা আছে ?

শ্রীরাম বড়সাহেবের পেয়ারের খানসামা, বড়সাহেবকেও সে ততটা সম্ভ্রম ও ভয়ের চোখে দেখে না, অন্য লোকের কথা বলাই বাহুল্য। সে বললে—কথা সবই ঠিক।

—কি ঠিক ?

—গলু আর হংস দল পেকিয়েছে হুজুর। নীলের দাগ মারতি দেবে না।

জেন্ বিল্স্ শিপ্টন্ রেগে উঠে দেওয়ানের দিকে চেয়ে বললেন—ইউ আর নো মিস্কসপ—মুচিপাড়ার জমি সব ডাগ লাগাও—টো ডে—আজই। আমি ঘোড়া করিয়া দেখিটে যাইব। শ্যামচাঁদ ভুলিয়া গেলো ? রামু মুচি লিডার হইয়াছে—টাহাকে সোজা করিবে।

এই সময়ে শ্রীরাম মুচি হাতজোড় ক'রে বললে—সায়েব, আমার তিন বিঘে মুসুরি আছে, ববিখন্দ। আমার ওটা দাগ যেন না দেন দেওয়ানজি। রামু সর্দারের বাড়ি আমি যাইনে, তার ভাত খাইনে।

—আচ্ছা, গ্র্যাণ্টেড, মঞ্জুর হইল। ডেওয়ান, ইহার জমি বাদ পড়িল।

রাজারাম বললেন—হুজুরের হুকুম।

—আচ্ছা যাও।—দ্যাট ডেভিল অফ্ এ্যান আমীন শুড গো উইথ ইউ—প্রসন্ন আমীন টোমার সাথে যাইবে। হরিশ আমীন নয়।

—হুজুরের হুকুম।

প্রসন্ন চক্রবর্তী নিজের ঘরে ভাত রাঁধছিল। দেওয়ান রাজারাম ঘরে ঢুকতেই প্রসন্ন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। তবু ভালো, কিছুক্ষণ আগে তার এই ঘরেই নবু গাজিদের দল এসেছিল। নীলের দাগ কিছু কম করে যাতে এ বছর তাদের গাঁয়ে দেওয়া হয়, সেজন্যে অনুরোধ জানাতে।

শুধু হাতেও তারা আসে নি।

আর একটু বেশিক্ষণ ওরা থাকলে ধরা পড়ে যেতে হোত। ঘুঘু রাজারামের চোখ এড়াত না কিছু।

রাজারাম বললেন—কি ? ভাত হচ্ছে ?

—আস্থন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শিগ্‌গির চলো চক্কত্তি, মুচিদের আজ শেষ করে আসতি হবে। বড় সায়েব রেগে আগুন। আমারে ডেকে পাঠিয়েছিল।

—একটা কথা বলবো? রাগ করবেন?

—না। কি?

—দাগ শেষ।

—সে কি?

প্রসন্ন চক্রবর্তী ভাতের হাত ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে ঘরের কোণের টিনের ক্ষুদ্র পেঁটরাটা খুলে দাগ-নক্সার বই ও ম্যাপ বার করে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে —সাত পাখী জমি এই, দু পাখী জমি এই—আর এই দেড় পাখী—একুনে তিরিশ বিঘে সাত কাঠা।

রাজারাম প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললেন—বাঃ, কবে করলে?

—রবিবার রাত দুপুরের পর।

—সঙ্গে কে ছিল?

—করিম লেঠেল আর আমি। পিন্‌ম্যান ছিল সয়ারাম বোষ্টম।

—রিপোর্ট কর নি কেন? আগে জানাতি হয় এ সব কথা। তাহলি বড় সায়েবের কাছে আমাকে মুখ খেতি হোত না। যাও—

—কিছু মনে করবেন না দেওয়ানজি। কেন বলি নি শুনুন, ভরসা পাই নি, ঠিক বলচি। রাহাতুনপুরির সেই ব্যাপারের পর আর কিছু—

—সে ভয় নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বদলে গিয়েচে। বড়সায়েব নিজে বললে আমাকে:

রাজারাম রায় বড়সাহেবকে কথাটা জানালেন না।

প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন যে কাজ একা করে এসেচে, তাতে দেওয়ান রাজারাম নিজেও কিছু ভাগ বসাতে চান, রিপোর্ট সেইভাবেই লিখছিলেন, প্রসন্ন চক্রবর্তীকে অবিশ্যি হাওয়া করে দিচ্ছিলেন একেবারে।

কিন্তু সেদিন সকালেই চরপাড়ায় গোলমাল বাধলো।

দেওয়ানজির দূর সম্পর্কের সেই ভাইপো রামকান্ত রায়, কলকাতায় আমুটি কোম্পানীর হৌসে নকলনবিসি করে এবং যে অদ্ভুত কলের গাড়ি ও জাহাজের কথা বলেছিল, সে নীলকুঠিতে এসেছিল দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। পাইক এসে খবর দিলে চরপাড়ার প্রজারা দাগ উপড়ে ফেলেচে।

রাজারাম তখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে বেরুলেন চরপাড়ার দিকে। সেখানে এক বটতলায় বসে একে একে সমস্ত মুচিদের ডাকালেন। যার যত জমিতে আগে দাগ ছিল, তার চেয়ে বেশি দাগ স্বীকার করিয়ে টিপসই নিলেন প্রত্যেকের। কারো কিছু কথা শুনলেন না।

রামু সর্দারকে বললেন—এবার পাঁচপোতার বাঁওড়ে বাঁধাল দিইছিলে তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ রায়মশাই। ফি বছর মোর বাঁধাল পড়ে।

—হুঁ।

রামু সর্দারের বুক কেঁপে গেল। দেওয়ানজিকে সে চেনে। ঘোড়ায় উঠবার সময় সে দেওয়ানকে বললে—মোর কি দোষ হয়েচে? অপরাধ নেবেন না, যদি কেউ কিছু বলে থাকে।

দেওয়ানজি ঘোড়ায় চেপে উড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যের পর পাঁচপোতার বাঁওড়ের বাঁধালে রামু সর্দার বসে তামাক খাচ্ছে আর চার-পাঁচজন নিকিরি ও চাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলচে, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে আট-দশজন লোক এসে ওর বাঁধাল ভাঙতে আরম্ভ করলে।

রামু সর্দার খাড়া হয়ে উঠে বললে—কে? কে? বাঁধালে হাত দেয় কোন স্মুন্দির ভাই রে?

করিম লাঠিয়াল এগিয়ে এসে বললে—তোর বাবা।

—তবে রে—

রামু সর্দার বাগ্‌দি পাড়ার মোড়ল। দুর্বল লোক নয় সে। লাঠি হাতে

সে এগিয়ে যেতেই করিম লাঠিয়ালের লাঠি এসে পড়লো ওর মাথায়। রামু সর্দার লাঠি ঠেকিয়ে দিতেই করিম হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো--সামলাও!

আবার ভীষণ বাড়ি।

রামু সর্দার ফিরিয়ে বাড়ি দিলে।

—সাবাস? সামলাও।

রামু সর্দার ফাঁক খুঁজছিল। বিজয়গর্বে অসতর্ক করিম লাঠিয়ালের মাথার দিকে খালি ছিল, বিদ্যুৎ বেগে রামু সর্দার লাঠি উঠিয়ে বললে—তুমি সামলাও কবুমে খানসামা।

সঙ্গে সঙ্গে রামুর লাঠি ঘুরে গেল বোঁ করে ওর বাঁকা আড়-করা লাঠির ওপর দিয়ে, বেল ফাটার মত শব্দ হোল। করিম পেঁপে গাছের ভাঙা ডালের মত পড়ে গেল বাঁধালের জালের খুঁটির পাশে। কিন্তু রামু সামলাতে পারলে না। সেও গেল হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অমনি করিম লাঠিয়ালের সঙ্গী লাঠিয়ালরা দুড়দাড় করে লাঠি চালালে ওর উপর যতক্ষণ রামু শেষ না হয়ে গেল। রক্তে বাঁধালের ঘাস রাঙা হয়ে ছিল তার পরদিন সকালেও। চাপ চাপ রক্ত পড়ে ছিল ঘাসের ওপর —পথযাত্রীরা দেখেছিল। বাঁধালের চিহ্নও ছিল না আর সেখানে। বাঁশ ভেঙেচুরে নিয়ে চলে গিয়েছিল লাঠিয়ালের দল।

এই বাঁধালের খুব কাছে রামকানাই চক্রবর্তী কবিরাজ একা বাস করতেন একটা খেজুর গাছের তলায় মাঠের মধ্যে। রামকানাই অতি গরীব ব্রাহ্মণ। ভাত আর সোঁদালি ফুল ভাজা, এই তাঁর সারা গ্রীষ্মকালের আহার—যতদিন সোঁদালি ফুল ফোটে বাঁওড়ের ধারের মাঠে। কবিরাজি জানতেন ভালোই, কিন্তু এ পল্লীগ্রামে কেউ পয়সা দিত না। খাওয়ার জন্য ধান দিত রোগীরা। তাও শ্রাবণ মাসে অসুখ সারলো তো আশ্বিন মাসের প্রথমে নতুন আউস উঠলে চাষীর বাড়ি বাড়ি এ গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘুরে সে ধান নিজেই সংগ্রহ করতে হোত তাঁকে।

রামকানাই খেজুরতলায় নিজের ঘরটিতে বসে দাশু রায়ের পাঁচালি পড়ছিলেন, এমন সময় হৈ-চৈ শুনে তিনি বই বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর আরও এগিয়ে দেখতে পেলেন, নীলকুঠির কয়েকজন লাঠিয়াল বাঁধালের বাঁশ খুলচে। একটু পরে শুনতে পেলেন কারা বলচে খুন হয়েচে। রামকানাই ফিরে আসচেন নিজের ঘরে, তাঁর পাশ দিয়ে হারু নিকিরি আর মনসুর নিকিরি দৌড়ে পালিয়ে চলে গেল।

রামকানাই বললেন—ও হারু, ও মনসুর, কি হয়েচে? কি হয়েচে?

তাদের পেছনে অন্ধকারে পালাচ্ছিল হজরৎ নিকিরি। সে বললে—কে? কবিরাজ মশায়? ওদিকি যাবেন না। রামু বাগ্‌দিকে নীলকুঠির লেঠেলরা মেরে ফেলে দিয়ে বাঁধাল লুঠ করচে।

রামকানাই ভয়ে এসে ঘরের দোর বন্ধ করে দিলেন।

একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো এই উপলক্ষে। খুনের চেয়েও বড়, হাঙ্গামার চেয়েও বড়।

পরদিন সকালে চারিদিকে হৈ-চৈ বেধে গেল—নীলকুঠির লোকেরা পাঁচ-পোতার বাঁধাল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েচে, রামু সর্দারকে খুন করেচে। দলে দলে লোক দেখতে গেল ব্যাপারটা কি। অনেকে বললে—নীলকুঠির সাহেব এবার জলকর দখল করবে বলে এ রকম করচে।

অনেকে রাজারামের বাড়ি গেল। দেওয়ান রাজারাম আশ্চর্য হয়ে বললেন—

—খুন? সে কি কথা? আমাদের কুঠি্‌র কোন লোক নয়। বাইরের লোক হবে। রামু বাগ্‌দি ছিল বদমাইশের নাজির। তার আবার শত্রুর অভাব! তুমিও যেমন। যা কিছু হবে, অমনি নীলকুঠির ঘাড়ে চাপালেই হোল! কে খুন করে গেল, নীলকুঠির লোকে করেচে—নাও ঠ্যালা!

বড়সাহেব রাজারামকে ডেকে বললে—খুনের কঠা কি শুনিটেছি? কে খুন করিল?

রাজারাম বললেন—আমাদের লোক নয় হুজুর। তার শত্রু ছিল অনেক—রামু বাগ্‌দির। কে খুন করেচে আমরা কি জানি?

—আমাদের লাঠিয়াল গিয়াছিল কি না?

—না হুজুর।

—পুলিসের কাছে এই কঠা প্রমাণ করিটে হইবে।

ছোটসাহেবকে বললে—আই থিঙ্ক ছাট ম্যান হ্যাজ ওভারশট হিজ মার্ক দিস টাইম। আই ডোণ্ট এ্যাপ্রিসিয়েট দিস মার্ডার বিজনেস, ইউ সী? টু মাচ অফ এ ট্রাব্‌ল—হোয়েন আই এ্যাম দি এনকোয়্যারিং ম্যাজিস্ট্রেট।

—আই অডাবৃড ওনলি দি ফিশ ব্যাণ্ড টু বি সোয়েপ ট্‌ এ্যাওয়ে, সার।

—আই নো, গেট রেডি ফর দি ট্রাব্‌ল দিস টাইম।

পুলিস তদস্তের পূর্বে রামকানাই কবিরাজের ডাক পড়লো রাজারামের বাড়ি। রাজারাম তাঁকে বলে দিলেন, এই কথা তাঁকে বলতে হবে—বুনোপাড়ার লোকদের রামুকে খুন করতে দেখেচেন।

রামকানাই চক্রবর্তী বললেন—একেবারে মিথ্যে কথা কি করে বলি রায়মশাই?

—বলতি হবে। বেশি ফ্যাচফ্যাচ করবেন না। যা বলা হচ্চে তাই করবেন।

—আজ্ঞে এ তো বড় বিপদে ফেললেন রায়মশাই।

—আপনাকে পান খেতে দেবো কুঠি থেকে।

—রাম রাম! ও কথা বলবেন না। পয়সা নিয়ে ও কাজ করবো না।

তদস্তের সময় রামকানাইয়ের ডাক পড়লো। দারোগা নীলকুঠির অনেক মুন খেয়েচে, সে অনেক চেষ্টা করলে রামকানাইয়ের সাক্ষ্য ওলটপালট করে দিতে।

রামকানাইয়ের এক কথা। নীলকুঠির লাঠিয়ালদের তিনি বাঁধাল থেকে পালাতে দেখেচেন। রামু সর্দারের মৃতদেহও তিনি দেখেচেন, তবে কে তাকে মেরেচে, তা তিনি দেখেন নি।

দারোগা বললে—বুনোপাড়ার সঙ্গে ওর বিবাদ ছিল জানেন?

—না দারোগা মশাই।

—বুনোপাড়ার কোন লোককে সেখানে দেখেছিলেন?

—না।

—ভালো করে মনে করুন।

—না দারোগা মশাই।

যাবার সময় দারোগা রাজারাম রায়কে ডেকে বলে গেল—দেওয়ানজি, কবিরাজ বুড়ো বড় তেঁদড়। ওকে হাত করার চেষ্টা করতে হবে। ভাবের জল খাওয়ান বেশ করে।

রামকানাইকে নীলকুঠিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হোল পাইক দিয়ে। প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন বললে—কবিরাজ মশাই—বড় সায়েব বাহাদুর বলেচেন আপনাকে খুশী করে দেবেন। শুধু কি চান বলুন—বড় সন্তুষ্ট হয়েচেন আপনার ওপর।

—আমি আবার কি চাইবো? গরিব বামুন, আমীনমশাই। যা দেন তিনি।

—তবুও বলুন কি আপনার—মানে ধরুন টাকাকড়ি কি ধান—

—ধান দিলে খুব ভালো হয়।

—তাই আমি বলচি দেওয়ানজির কাছে—

রামকানাই চক্রবর্তীকে তারপর নিয়ে যাওয়া হোল ছোটসাহেবের খাস কামরায়। রামকানাই গরীব ব্যক্তি, সাহেবসুবোর আবহাওয়ায় কখনো আসেন নি, কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন। ছোটসাহেব পাইপ মুখে বসে ছিল। কড়া স্বরে বললে—ইদিকি এসো—

—আজ্ঞে সায়েব মশাই—নমস্কার হই।

—তুমি কি কর?

—আজ্ঞে, কবিরাজি করি।

—বেশ। কুঠিতে কবিরাজি করবে?

—আজ্ঞে কার কবিরাজি সায়েব মশাই?

—আমাদের।

—সে আপনাদের অভিরুচি। যা বলবেন, তাই করবো বই কি।

—তাই করবা?

—আজ্ঞে কেন করবো না?

—মাসে তোমায় দশ টাকা করে দেওয়া হবে তাহলি।

রামকানাই চক্রবর্তী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। দশ টাকা! মাসে দশ টাকা আয় তো দেওয়ান মশায়দের মত বড়মানুষের রোজগার! আজ হঠাৎ এত প্রসন্ন হোলেন কেন এঁরা?

রামকানাই কবিরাজ বললেন—দশ টাকা সায়েব মশাই?

—হ্যাঁ, তাই দেওয়া হবে।

রাজারামকে ডেকে ধূর্ত ছোটসাহেব বলে দিলে—এই লোকের কাছে একটা চুক্তি করে লেখাপড়া হোক। দশ টাকা মাসে কবিরাজির জন্যে কুঠির ক্যাশ থেকে দেওয়া হবে। দশটা টাকা দিয়ে ছাও এক মাসের আগাম।

—বেশ হুজুর।

পরদিন রামকানাইয়ের আবার ডাক পড়লো নীলকুঠিতে। তার আগের দিন বিকেলে টাকা নিয়ে চলে এসেচেন হৃষ্টমনে। আজ সকালে আবার কিসের ডাক? দেওয়ান রাজারামের সেরেস্তায় গিয়ে হাজিরা দিতে হোল রামকানাইকে। দেওয়ান বললেন—তা হোলে তো আপনি এখন আমাদের লোক হয়ে গেলেন?

রামকানাই বিনীতভাবে জানালেন, সে তাঁদের কৃপা।

—না না, ওসব নয়। আপনি ভাল কবিরাজ। আমাদেরও দরকার। দশ টাকা পেয়েচেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটা কথা। সব তো হোলো। নীলকুঠির নুন তো খ্যালেন, এবার যে তার গুণ গাইতি হবে।

—আজ্ঞে মহানুভব বড়সায়েব, ছোটসায়েব আর দেওয়ানজির গুণ, সর্বদাই গাইবো। গরীব ব্রাহ্মণ, যা উপকার আপনারা করলেন—

—ও কথা থাক্। সেই খুনের মোকদ্দমায় আপনাকে আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিতি হবে। এই উপকারডা আপনি করুন আমাদের।

রামকানাই আকাশ থেকে পড়লেন।—সে কি? সে তো মিটে গিয়েচে,

যা বলবার পুলিসের কাছে বলেচেন, আবার কেন ?

—তা নয়, আদালতে বলতি হবে। আপনাকে আমরা সাক্ষী মানবো। আপনি বলবেন—বুনোপাড়ার ভস্তে বুনো, ন্যাংটা বুনো, ছিকুষ্ট বুনো আর পাতিরাম বুনোকে আপনি লাঠি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেচেন।

—কিন্তু তা তো দেখি নি দেওয়ানমশাই ?

—না দেখেচেন না-ই দেখেচেন। বোকার মত কথা বলবেন না। নীলকুঠির মাইনে করা বাঁধা কবিরাজ আপনাকে করা হোল। সায়েব-মেমের রোগ সারালে বকৃশিশ পাবেন কত। দশ টাকা মাসে তো বাঁধা মাইনে হয়েচে। একটা ঘর কাল আপনাব জন্যি দেওয়ানো হবে, বড়সায়েব বলেচে। আপনি তো আমাদের নিজির লোক হয়ে গ্যালেন। আমাদের পক্ষ টেনে একটা কথা—ওই একটা কথা—বাস হয়ে গেল! আপনাকে আর কিছু বলতি হবে না। ওই একটা কথা আপনি বলবেন, অমুক অমুক বুনোকে দৌড়ে পালাতে আপনি দেখেচেন

রামকানাই বিষণ্ণ মুখে বললেন—তা—তা—

—তা-তা নয়, বলতি হবে। আপনি কি চান ? বড়সায়েব বড্ড ভাল নজর দিয়েছে আপনার ওপর। যা চান তাই দেবে। আপনার উন্নতি হয়ে যাবে এবার।

রাজারাম আরও বললেন—তা হোলে যান এখন। নীলকুঠির ঘোড়া দিতাম, কিন্তু আপনি তো চড়তি জানেন না। গরুর গাড়িতে যাবেন ?

রামকানাই খুব বিনীতভাবে হাত জোড় করে বললেন—দেওয়ান মশা আমি বড্ড গরীব। আমারে মুশকিলে ফ্যালবেন না। আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ ক'রে তবে সাক্ষী দিতি হয় শুনিচি। আজ্ঞে, আমি সেখানে মিথ্যে কথা বলতি পারবো না। আমায় মাপ করুন দেওয়ান মশাই, আমার ব ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খেতেন না। কখনো মিথ্যে বলতি শুনি নি কেউ মুখে। আমি বংশের কুলাঙ্গার তাই কবিরাজি করে পয়সা নিই। বিনামূ রোগ আরোগ্য করা উচিত। জানি স কিন্তু বড্ড গরীব, না নিয়ে পারি আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা আমি বলতি পারবো না দেওয়ান মশাই।

দেওয়ান রাজারাম রেগে উত্তর দিলেন—এডা বড্ড ধড়িবাজ। এডারে চুনের গুদোমে পুরে রেখো আজ রাত্তিরি। চাপুনির জল খাওয়ালি যদি জ্ঞান হয়। তাতেও যদি না সারে, তবে শ্যামচাঁদ আছে জানো তো?

পাইক নফর মুচি কাছে দাঁড়িয়ে, বললে—চলুন ঠাকুরমশায়।

—কোথায় নিয়ে যাবা?

—চুনের গুদোমে নিয়ে যাতি বলচেন দাওয়ানজি, শোনলেন না? আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, গায়ে হাত দেবো না, দিলি আমার মহাপাপ হবে। আপনি চলুন এগিয়ে।

—কোন দিকি?

—আমার পেছনে পেছনে আস্থন।

কিছুদূর যেতেই রাজারাম পুনরায় রামকানাইকে ডেকে বললেন—তাহলি চুনের গুদোমেই চললেন? সে জায়গাটাতে কিন্তু নাকে কাঁদতি হবে গেলে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে তাই বললাম।

—তবে আমারে কেন সেখানে পাঠাচ্চেন দেওয়ান মশাই, পাঠাবেন না।

—আমার তো পাঠানোর ইচ্ছে নয়। আপনি যে এত ভদ্রলোক হয়ে, ঠির মাইনে বাঁধা কবিরাজ হয়ে, আমাদের একটা উপগার করবেন না—

—তা না, হলপ ক'রে মিথ্যে বলতি পারবো না। ওতে পতিত হতে হয়।

—তবে চুনের গুদামে ওঠো গিয়ে ঠেলে। যাও নফর—চাবি বন্ধ ক'রে দো।

রাত প্রায় দশটা। দেওয়ান রাজারাম একা গিয়ে চুনের গুদামের দরজা লেন। রামকানাই কবিরাজ ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েচেন। নীলকুঠির নর গুদাম শয়নঘর হিসেবে খুব আরামদায়ক স্থান নয়। 'চুনের গুদাম'-এর চুনের সম্পর্ক তত থাকে না, যত থাকে বিদ্রোহী প্রজা ও কৃষকের। সাহেবের ও নীলকুঠির স্বার্থ নিয়ে যার সঙ্গে বিরোধ বা মতভেদ, সে চুনের মের যাত্রী। এই আলো-বাতাসহীন দুটো মাত্র ঘুলঘুলিওয়ালা ঘরে

তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ বড়সাহেব বা ছোটসাহেবের অথবা দেওয়ানজির মরজি। চুনের গুদামের বাইরে একটা বড় মাদার গাছ ছিল। একবার রাসমণিপুরের জনৈক দুর্দান্ত প্রজা ঘুলঘুলি দিয়ে বার হয়ে মাদার গাছের নিচু ডাল ধরে ঝুলে পালিয়ে গিয়েছিল বলে তৎকালীন বড়সাহেব জন সাহেবের আদেশে গাছটা কেটে ফেলা হয়। চুনের গুদামে ইতিপূর্বে একজন প্রজা নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ভূত দেখে।

রাজারামের মনে ভূতের ভয়টা একটু বেশি। একলা কখনো তিনি এত রাত্রে চুনের গুদামে আসতেন না। আসবার আগে তাঁর গা-টা ছম্ ছম্ করছিল, এখন রামকানাইকে দেখে তিনি মনে একটু সাহস পেলেন। হোক না ঘুমন্ত, তবুও একটা জলজ্যান্ত মানুষ তো বটে। দেওয়ানজি ডাক দিলেন —ও কবরেজ মশাই—ও কবরেজ—

রামকানাই চমকে ধড়মড় করে উঠে বললেন—কে? ও দেওয়ান মশাই —আসুন আসুন—বলেই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে বসবার ঠাঁই দিতে, যেন রাজারাম তাঁর বাড়িতে আজ রাতের বেলা অতিথিরূপে পদার্পণ করেচেন।

রাজারাম বললেন—থাক থাক। বসবার জন্যি আসি নি, আমার সঙ্গে চলুন।

—কোথায় দেওয়ান মশাই?

—চলুন না।

—তা চলুন। তবে এমন ঘরে আর আমায় পোরবেন না দেওয়ান মশাই, বড্ড মশা। কামড়ে আমারে খেয়ে ফেলে দিয়েচে একেবারে।

—আপনার গেরোর ফের। নইলে আজ আপনি নীলকুঠির কবিরাজ, আপনাকে এখানে আসতি হবে কেন। যাক যা হবার হয়েচে, এখন চলুন আমার সঙ্গে।

—যেখানেই নিয়ে যান, একটু যেন ঘুমুতি পারি।

—মত বদলেচে?

—না দেওয়ান মশাই, হাত জোড় করে বলচি, আমারে ও অনুরোধ করবেন না। আমি কবিরাজ লোক, কারো অসুখ দেখলি নিজে গাছগাছড়া তুলে এনে

বড়ি করে দেবো, নিজের হাতে পাঁচন সেদ্ধ করবো, সে কাজে ত্রুটি পাবেন না। কিন্তু ওসব মামলা-মকদ্দমার কাজে আমারে জড়াবেন না। দোহাই আপনার—

রামকানাই সরল লোক, নীলকুঠির সাহেবদের ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানতেন না—বা সাহেবদের চেয়েও তাদের এইসব নন্দীভৃঙ্গির দল যে এককাঠি সরেস, তারা যে রাতদুপুরে সাহেবদের হুকুমে ও ইঙ্গিতে বিনা দ্বিধায় অম্লান বদনে জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে লাশ গাজিপুরের বিলে পুঁতে রেখে আসতে পারে তাই বা তিনি কোন্ চরক-সুশ্রুতের পুঁথিতে পড়বেন?

ছোট সাহেব একটা লম্বা বারান্দায় বসে নীলের বাণ্ডিলের হিসেব করছিলো। এই সব বাণ্ডিল বাঁধা নীল কলকাতা থেকে আমুটি কোম্পানীর বায়না করা। দিন তিনেকের মধ্যে তাদের তরফ থেকে হৌস ম্যানেজার রবার্টস্ সাহেব এসে নীল দেখবে। ছোটসাহেব নীলের বাণ্ডিলের তদারক করচে এই জন্যই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রসন্ন আমীন, সে খুব ভালো নীল চেনে, এবং জমানবিশ কানাই গাঙ্গুলি। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সহিস ভজা মুচি।

দেওয়ানকে দেখে ছোটসাহেব বলে উঠলো—আরে দেওয়ান, এসো এসো। তুমি বলো তো তিনশো তেষট্টি নম্বর আকাইপুরির নীলের বাণ্ডিলের সঙ্গে দেউলে, ঘোঘা, সরাবপুরির নীল মেশবে?

আসল কথা এরা নীল ভালোমন্দতে মেশাচ্চে। সব মাঠের নীল ভালো হয় না যারা এদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ তারা নীল দেখে বলে দেবে তার শ্রেণী। বলে দেবে, এ নীলের সঙ্গে ও নীল মিশিও না, আমুটি কোম্পানীর দালাল ধরে ফেলে দেবে।

দেওয়ান বললে—খুব মিশবে। এ বছর আর কালীবর দালাল আসবে না, রবার্ট সাহেব কিছু বোঝে না—ঘোঘা আর আমাদের মোল্লাহাটি, পাঁচ-পোতার নীল মিশিয়ে দিলি কেউ ধরতে পারবে না। এই এনিচি হুজুর, আমাদের সেই কবিরাজ।

ছোটসাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—চুনের গুদাম কি রকম

লাগলো ?

রামকানাই হাত জোড় করে বললে—সায়েব মশায়, নমস্কার আজ্ঞে।

—চুনের গুদাম কেমন জায়গা ?

দেওয়ান রাজারাম জিভে একটা শব্দ করে হাত দু'খানা তুলে বললে—হুজুর, আপনি বললেন কি রকম জায়গা! কবিরাজ তার কি জানে ? সেখানে ঢুকে ঘুমুতি লেগেচে।

—অ্যাঁ! ঘুমুচ্ছিলে ? তা হোলে খুব আরামের জায়গা বলে মনে হয়েচে দেখচি। আর ক'দিন থাকতি চাও ?

—আজ্ঞে ? সায়েব মশায় কি বলচেন, আমি বুঝতি পারচি নে।

—খুব বুঝেচ। তুমি ঘুঘু লোক, ন্যাকা সাজলি জন ডেভিড্ তোমায় ছাড়বে না। মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবে কি না বলো। যদি দ্যাও, তোমাকে আরও দশ টাকা এখুনি মাইনে বাড়িয়ে দেবো। কেমন রাজী ? কোনো কথা বলতি হবে না, তুমি বুনোপাড়ার ছিকুষ্ঠ বুনো আর দু'একজন লোককে লাঠি হাতে চলে যেতি দেখেচ বলবে। রাজী ?

—আজ্ঞে সাহেব মশায় ?

—ও সায়েব মশায় বলা খাটবে না। করতি হবে, সাক্ষী দিতে হবে। তোমার উন্নতি করে দেবো। এখানে বাঁধা মাইনের কবরেজ হবে। কুড়ি টাকা মাইনে ধরে দিও দেওয়ান, জুন মাস থেকে।

দেওয়ান রাজারাম তখুনি পড়া পাখীর মত বলে উঠলেন—যে আজ্ঞে হুজুর।

—বেশ নিয়ে যাও। কবিরাজ রাজী আছে। নিয়ে যাও ওকে। প্রসন্ন আমীন, তোমার ঘরে শোবার জায়গা করে দিতি পারবা না কবিরাজের ?

প্রসন্ন আমীন তটস্থ হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে—হাঁ হুজুর আমার বিছানা পাতাই আছে, তাতেও উনি শুতে পারেন না হয়—

রামকানাইয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, জল-তেষ্টায় তাঁর জিভ জড়িয়ে এসেচে কিন্তু নীলকুঠিতে সায়েবের ও মুচির ছোঁয়া জল তিনি খাবেন না, কারণ এইমাত্র দেখলেন বেহারা শ্রীরাম মুচি ছোটসায়েবের জন্যে কাঁচের বাটি ক'রে মদ (মদ ন

কফি, রামকানাই ভুল করেচেন) নিয়ে এল—সত্যিক জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি এখানে—নাঃ, এই সব ব্রাহ্মণেরও দেখচি এখানে জাত নেই। এখানে কবিরাজি করতে হোলে জল খাবেন না এখানকার, শুধু ডাব খেয়ে কাটাতে হবে।

প্রসন্ন আমীন বললে—তাহোলে চলুন কবিরাজ মশাই—রাত হয়েচে।

দেওয়ান রাজারাম পাকা লোক, তিনি এই সময় বললেন—তাহোলে কবিরাজ মশাইয়ের সাক্ষী দেওয়া ঠিক হোলো তো?

প্রসন্ন আমীন রামকানাইয়ের দিকে চাইলে। রামকানাই বললে—সায়েব মশাই, তা আমি কেমন করে দেবো? সে আগেই বললাম তো দেওয়ান মশাইকে।

ছোটসাহেব চোখ গরম করে বললে—সাক্ষী দেবে না?

—না, সায়েব মশাই। মিথ্যে কথা বলতি আমি পারবো না। দোহাই আপনার। হাতজোড় করচি আপনার কাছে। আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—

—ও, তুমি এমনি সায়েস্তা হবে না। তোমার মাথার ঠিক এমনি হবে না। ভজা, নফরকে ডাক দ্যাও। দশ ঘা শ্যামচাঁদ কষে দিক।

নফর মুচি লম্বা জোয়ান মিশকালো লোক। সে অনেক লোককে নিজের হাতে খুন করেচে। কুঠির বাইরে আশপাশ গ্রামে নফরকে সবাই ভয় করে। নফর বোধ হয় ঘুমুচ্ছিল। ভজার পেছনে পেছনে সে চোখ মুছতে মুছতে এল।

ছোটসাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—কেমন? লাগাবে শ্যামচাঁদ?

—আজ্ঞে সায়েব মশাই—তাহলি আমি মরে যাবো। আমারে মারতি বলবেন না। আষাঢ় মাসে বাত শ্লেষ্মা হয়ে আমার শরীর বড় দুর্বল—

—মরে গেলে তাতে আমার কিছুই হবে না। নিয়ে যাও নফর—

নফর বললে—যে আজ্ঞে হুজুর।

নফর এসে রামকানাইয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। যাবার সময় দেওয়ানজির দিকে তাকিয়ে বললে—তাহোলি আস্তাবলে নিয়ে যাই?

এই সময় দেওয়ানের দিকে সে সামান্যক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দেওয়ান বললেন—নিয়ে যাও—

রামকানাই বলিদানের পাঁঠার মত নফরের সঙ্গে চললেন। লোকটা স্বভাবত নির্বোধ, এখুনি যে নফর মুচির জোরালো হাতের শ্যামচাঁদের ঘায়ে তাঁর পিঠের চামড়া ফালা ফালা হয়ে যাবে সে সম্ভাবনা কানে শুনলেও বুদ্ধি দিয়ে এখনো হৃদয়ঙ্গম ক'রে উঠতে পারেন নি।

আস্তাবলে দাঁড় করিয়ে নফর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে রামকানাইয়ের দিকে ভালো করে চেয়ে বললে—ক'ঘা খাবা!

—আমারে মেরো না বাবা। আমার বাত শ্লেষ্মার অসুখ আছে, আমি তাহলি মরি যাবো।

—মরে যাও, বাঁওড়ের জলে ভাসিয়ে দেবানি। তার জন্যে ভাবতি হবে না। অমন কত এ হাতে ভাসিয়ে দিইচি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।

দু'ঘা মাত্র শ্যামচাঁদ খেয়ে রামকানাই মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলেন। নফর কোথা থেকে একটা চটের থলে এনে রামকানাইয়ের গায়ে ফেলে দিলে। তার ধুলোয় রামকানাইয়ের মুখের ভিতর ভর্তি হয়ে দাঁত কিচ্ কিচ্ করতে লাগলো। পিঠে তখন ওদিকে নফর সজোরে শ্যামচাঁদ চালাচ্চে ও মুখে শব্দ করচে—রাম, দুই, তিন, চার—

দশ ঘা শেষ করে নফর বললে—যাও, বেরাহ্মণ মানুষ। সায়েব বললি কি হবে, তুমি মরে যেতে দশ ঘা শ্যামচাঁদ খেলে। রাত্তিরি এখান থেকে নড়বা না। সামনে এসে ছোটসায়েব দেখলি ছুটি।

রামকানাই বাকি রাতটুকু মড়ার মত পড়ে রইলেন আস্তাবলের মেঝেতে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে সকালে বাড়ির সামনে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছেন, আজ হাটবার, চাল কিনবেন। নিলু বলে দিয়েচে একদম চাল নেই! এমন সময় তিলু এক বছরের খোকাকে এনে তাঁর কাছে দিতে গেল। ভবানী বললেন—এখন দিও না, আমি একটু মামার কাছে যাবো। যাও, নিয়ে যাও।

খোকা কিন্তু ইতিমধ্যে মার কোল থেকে নেমে পড়ে ভবানীর কোলে যাবা

জন্যে দু'হাত বাড়াচ্চে। তিলু নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে সে কাঁদতে লাগল ও ছোট্ট ডান হাতখানা বাড়িয়ে বাবাকে ডাকতে লাগলো।

—দিয়ে যাও, দিয়ে যাও! দাঁড়াও, ঐ তো দীনু বুড়ি আসচে। দেখে নাও তো চালটা—। ভবানী ছেলেকে কোলে করলেন। খোকা আনন্দে তাঁর কান ধরে বলতে লাগল—ই—গুল্‌ল্‌ন—আঙুল দিয়ে পথের দিকে দেখিয়ে দিলে।

ভবানী বললেন—না, এখন তোমার বেড়াবার সময় নয়। ওবেলা যাবো।

খোকা ওসব কথা বোঝে না। সে আবার আঙুল দিয়ে পথের দিকে দেখিয়ে বল্‌লে—ইঃ।

—না। এখন না।

তিলু বললে—যাচ্চেন তো মামাশ্বশুরের ওখানে। নিয়ে যান না সঙ্গে।

খোকা ততক্ষণে বাবার পৈতের গোছ ছোট্ট মুঠোতে ধরে পথের দিকে টানচে, আর চেঁচিয়ে বলচে—অ্যাঃ—নোবল্‌ নোবল্‌—উ—

পরেই কান্নার সুর।

তিলু বললে—যাও, যাও। আহা, আপনার সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসে।

—কেন, ওর তিন মা! আমি না হোলে চলে না?

—না গো। রান্নাঘরে যখন থাকে, তখন থাকে থাকে কেবল আঙুল তুলে বাইরের দিকে দেখাচ্চে, মানে আপনার কাছে নিয়ে যেতে বলচে—

এমন সময় দীনু বুড়ি চালের ধামা কাঁখে করে নিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে পড়তেই ওরা বললে—দেখি কি চাল?

দীনু বুড়ির বয়স আশীর ওপর, চেহারা ভারতচন্দ্র বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নদার মত। এমন কি হাতের ছোট্ট নড়িটি পর্যন্ত। ওদের কাছে এসে একগাল হেসে ধামা নামিয়ে বললে—ডবল নাগরা দিদিমণি। আর কে? জামাই?

তিলু বললে—হ্যাঁ গো। দর কি?

—ছ'পয়সা।

—না, এক আনা করে হাটে দর গিয়েচে।

—না দিদিমণি, তোমাদের খেয়ে মানুষ, তোমাদের ফাঁকি দেবানি? ছ'পয়সা

না ছাও, পাঁচ পয়সা দিও। এক মুঠো নিয়ে চিবিয়ে ছাখো কেমন মিষ্টি। আকোরকোরার মত।

—চল বাড়ির মধ্যি। পয়সা কিন্তু বাকি থাকবে।

— ঐ ছাখো, তাতে কি হয়েচে? ওবেলা দিও।

—ওবেলা না। মঙ্গলবারের ইদিকি হবে না।

—তাই দিও।

এই ফাঁকে খোকা খপ করে একমুঠো চাল ধামা থেকে উঠিয়ে নিয়েই মুখে পুরে দিলে। কিছু কিছু পড়ে গেল মাটিতে। ভবানী ওর হাত থেকে চাল কেড়ে নিয়ে কোলে নিয়ে বললেন—হাঁ করো—হাঁ করো খোকা—

খোকা অমনি আকাশ-পাতাল বড় হাঁ করলে, এটা তিলু খোকাকে শিখিয়েচে। কারণ যখন তখন যা-তা সে ছুই আঙুলে খুঁটে তুলে সর্বদা মুখে পুরচে, ওর মা বলে—হাঁ কর খোকন্—লক্ষি ছেলে। কেমন হাঁ করে—

অমনি খোকা আকাশ-পাতাল হাঁ করে অনেকক্ষণ থাকবে, সেই ফাঁকে ওর মা মুখে আঙুল পুরে মুখের জিনিস বার করে ফেলবে।

আজকাল সে হাঁ ক'রে বলে—আঁ—আ—আ—আ

ওর মা বলে—থাক—থাক। অত হাঁ করতি হবে না—

ভবানী বাঁড়ুযো খোকনের মুখ থেকে আঙুল দিয়ে সব চাল বের করে ফেলে দিলেন। এমন সময় পথের ওদিক থেকে দেখা গেল ফণি চক্কত্তি আসচেন, পেছনে ভবানীর মামা চন্দ্র চাটুয্যে। ভবানী বললেন—তিলু, তুমি দীনু বুড়িকে নিয়ে ভেতরে যাও—খোকাকেও নিয়ে যাও—

ওঁরা দুজন কাছে আসচেন, তিলু খোকাকে নিতে গেল, কিন্তু সে বাবার কোল আঁকড়ে রইল ছু'হাতে বাবার গলা জাপটে ধরে। মুখে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো।

তিলু বললে—ও আপনার কোল থেকে কারো কোলে যেতে চায় না, আমি কি করবো?

ভবানী হাসলেন। এ খোকাকে তিনি কত বড় দেখলেন এক মুহূর্তে।

বিজ্ঞ, পণ্ডিত ছেলে টোল খুলে কাব্য, দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র পড়াচ্চে ছাত্রদের। সৎ ধার্মিক, ঈশ্বরকে চেনে। হবে না? তাঁর ছেলে কিনা? খুব হবে। দেশে দেশে ওকে চিনবে, জানবে।

সেই মুহূর্তে তিলুকেও দেখলেন—দীনু বুড়ির আগে আগে চলে গিয়ে বাড়ির ছোট্ট দরজার মধ্যে ঢুকে চলে গেল। কি নতুন চোখেই ওকে দেখলেন যেন। মেয়েরাই সেই দেবী, যারা জন্মের দ্বারপথের অধিষ্ঠাত্রী—অনন্তের রাজ্য থেকে সসীমতার মধ্যেকার লীলাখেলার জগতে অহরহ আত্মাকে নিয়ে আসচে, তাদের নবজাত ক্ষুদ্র দেহটিকে কত যত্নে পরিপোষণ করচে, কত বিনিদ্র উদ্বিগ্ন রাত্রির ইতিহাস রচনা করে জীবনে জীবনে, কত নিঃস্বার্থ সেবার আকুল অশ্রুরাশিতে ভেজা সে ইতিহাসের অপঠিত অবজ্ঞাত পাতাগুলো।

ভবানী বললেন—শোনো তিলু—

—কি?

—খোকাকে নেবে?

—ও যাবে না বললাম যে!

—একটু দাঁড়াও, দেখি। দাঁড়াও ওখানে।

—আহা-হা! ঢং!

মুচকে হেসে সে হেলেদুলে ছোট্ট দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলো। কি শ্রী! মা হওয়ার মহিমা ওর সারা দেহে অমৃতের বসুধারা সিঞ্চন করেচে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—বোসো বাবাজি।

সবাই মিলে বসলেন। ভবানী বাঁড়ুয্যে তামাক সেজে মামা চন্দ্র চাটুয্যের হাতে দিলেন। ফণি চক্কত্তি বললেন—বাবাজি, তোমাকে একটা কাজ করতি হবে—

—কি মামা?

—তোমাকে একবার আমার বাড়ি যেতি হবে। আমি একবার গয়া-কাশী যাবো ভাবচি। তোমার মামাও আমার সঙ্গে যাবেন। তুমি তো বাবা সব

জানো ওদিকির পথঘাট! কোথা দিয়ে যাবো, কি করবো!

—হেঁটে যাবেন?

—নয়তো বাবা পাল্‌কি কে আমাদের জন্যি ভাড়া করে নিয়ে আসচে? হেঁটেই যাবো।

—এখান থেকে যাবেন—

—ওরকম করে বললি হবে না। ঈশ্বর বোষ্টম মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। সে কিছু কিছু জানে, তবে তুমি হোলো গিয়ে জাহাজ। তোমার কথা শুনলি—তুমি ওবেলা আমাদের বাড়ি গিয়ে চালছোলাভাজা খাবে। অনেকে আসবে শুনতি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ির মধ্যে এসে তিলুকে বললেন—ওগো, ভূতের মুখে রামনাম!

—কি গা?

—ফণি চক্কত্তি আর মামা চন্দ্র চাটুয্যে নাকি যাচ্চেন গয়া-কাশী। এবার তোমার দাদা না বলে বসেন তিনিও যাবেন।

তিলুর পেছনে পেছনে নিলু বিলুও এসে দাঁড়িয়েছিলো। নিলু বললে—কেন দাদা বুঝি মানুষ না! বেশ!

—মানুষ তো বটেই। তবে আমি আর সকালবেলা গুরুনিন্দেটা করবো? আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা না-ই বেরুলো।

বিলু বললে—আহা রে, কি যে কথার ভঙ্গি! কবির গুরু, ঠাকুর হরু—হরু ঠাকুর এলেন। দিদি কি বলো?

তিলু চুপ করে রইল। স্বামীর সঙ্গে তার কোন বিষয়ে দ্বিমত নেই, থাকলেও কখনো প্রকাশ করে না। গ্রামের লোকেও তিলুর স্বামীভক্তি নিয়ে বলাবলি করে। এমনটি নাকি এদেশে দেখা যায় নি। দু'একজন দুষ্ট লোকে বলে—আহা, হবে না? বলে,

কুলীনের কন্যে আমি নাগর খুঁজে ফিরি—
দেশ-দেশান্তরে তাই ঘুরে ঘুরে মরি—

কুলীন কন্তের ভাতার জুটলো বুড়োবয়সে। তাই আবার ছেলে হয়েচে। ভক্তি কি অমনি আসে? যা হোত না, তাই পেয়েচে। ওদের বড় ভাগ্যি, বুড়ো ধুম্ড়ি বয়েসে বর জুটেচে।

শ্রোতাগণ ঘাঁটিয়ে আরও শোনবার জন্তে বলে—তবুও বর তো?

—হ্যাঁ, বর বইকি। তার আর ভুল? তবে—

—কি তবে—

—বড্ড বেশি বয়েস।

—যাও, যাও, কুলীনের ছেলের আবার বয়েস।

সবাই কিন্তু এখানে একমত হয় যে ভবানী বাঁড়ুয্যে সত্যই স্থপাত্র এবং সৎ ব্যক্তি। কেউ এ গাঁয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যের সম্বন্ধে নিন্দের কথা উচ্চারণ করে নি, যে পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসি ঘোঁটে ব্রহ্মাবিষ্ণু পর্যন্ত বাদ যান না, সেখানে সবার কাছে অনিন্দিত থাকা সাধারণ মানুষ পর্যায়ের লোকের কর্ম নয়।

ভবানী বাঁড়ুয্যে সন্ধ্যের আগেই ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসলেন। কার্তিক মাস। বেলা পড়ে একদম ছায়ানিবিড় হয়ে এসেচে, ভেরেণ্ডাগাছের বেড়া, চারাবাগানের শেওড়া আকন্দের ঝোপ। বনমরচে লতার ফুলের স্থগন্ধ বৈকালের ঠাণ্ডা বাতাসে। ফণি চক্কত্তির বেড়ার পাশে তাঁরই ঝিঙে ক্ষেতে ফুল ফুটেচে সন্ধ্যেতে। শালিখের দল কিচ্‌কিচ্‌ করচে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনে কার্তিকশাল ধানের গাদার ওপরে।

ফণি চক্কত্তির সেকেলে চণ্ডীমণ্ডপ। একটা বাহাদুরি কাঠের খুঁটির গায়ে খোদাইকরা লেখা আছে—"শ্রীশিবসত্য চক্রবর্তী কর্তৃক সন ১১৭২ সালে মাধব ঘরামি ও অক্রূর ঘরামি তৈরি করিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ইহা ঠাকুরের ঘর ইহা জানিবা"—স্থতরাং চণ্ডীমণ্ডপের বয়স প্রায় একশত বছর হোতে চলেচে। অনেক দূর থেকে লোকে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখতে আসে। খড়ের চালের ছাঁচ ও পাট, রলা ও সলা বাখারির কাজ, ছাঁচপড়নের বাঁশের কাজ, মটকায় দুই পড়ায়ে পায়রার খড়ের তৈরী ছবি দেখে লোকে তারিফ করে। এমন কাজ এখন নাকি

প্রায় লুপ্ত হতে বসেচে এদেশে।

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—আরে এখন হয়েচে সব ফাঁকি। সায়েবসুবোয় বাংলা করেচে নীলকুঠিতে, তাই দেখি সবাই ভাবে অমনডা করবো। এখন যে খড়ের ঘরের রেওয়াজ উঠেই যাচ্চে। তেমন পাকা ঘরামিই বা আজকাল কই?

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—সেদিন রাজারামের এক ভাইপো বলেচে সায়েবদের দেশে নাকি কলের গাড়ি উঠেচে। কলে চলে। কাগজে ছাপা করা ছবি নাকি সে দেখে এসেচে!

দীনু বললেন—কলে চলে বাবাজি?

—তাই তো শুনলাম। কালে কালে কতই দেখবো। আবার শুনেচ খুড়ো, মেটে তেল বলে একরকম তেল উঠেচে, পিদিমে জ্বলে। দেখে এসেচে সে কলকেতায়।

—বাদ দ্যাও। বলে কলির কেতা, কলকেতা। আমাদের সর্ষে তেলই ভালো, রেড়ির তেলই ভালো, মেটে তেল, কাঠের তেলে আর দরকার নেই বাবাজি। হাঁা, বলো ভবানী বাবাজি, একটু রাস্তাঘাটের খবর দ্যাও দিনি। বলো একটু। তুমি তো অনেক দেশ বেড়িয়েচ। পাহাড়গুলো কিরকম দেখতি বাবাজি?

রূপচাঁদ মুখুয্যে দীনুর হাত থেকে হুঁকো নিতে নিতে বললেন—থাক, পাহাড়ের কথা এখন থাক। পাহাড় আবার কি রকম? মাটির ঢিবির মত, আবার কি? দেবনগরের গড়ের মাটির ঢিবি দ্যাখোনি? ওই রকম। হয়তো একটু বড়।

ভবানী বললেন—দাদামশাই, পাহাড় দেখেচেন কোথায়?

—দেখিনি তবে শুনেচি।

—ঠিক।

ভবানী এতগুলি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সামনে তামাক খাবেন না, তাই হুঁকো নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন—কোথায় আপনারা যেতে

চান ?

ফণি চক্কত্তি বললেন—আমরা কিছুই জানিনে। ঈশ্বর বোষ্টম সেখোগিরি করে, সে নিয়ে যাবে বলেচে। সে আসুক, বোসো। তাকে ডাকতি লোক গিয়েচে।

ফণি চক্কত্তির বড় মেয়ে বিনোদ এই সময়ে চালছোলাভাজা তেলনুন মেখে বাটিতে করে প্রত্যেককে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এলো প্রত্যেকের জন্যে এক ঘটি করে জল। এঁর বাড়িতে সন্ধ্যের মজলিসে চালছোলাভাজার বাঁধা ব্যবস্থা। 'দা-কাটা তামাক অবারিত, রোজ দেড়সের আন্দাজ তামাক পোড়ে। ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপের সান্ধ্য আতিথেয়তা এ গাঁয়ে বিখ্যাত।

ঈশ্বর বোষ্টম এসে পৌঁছুলো। ভবানী তাকে বললেন—কোন্ পথ দিয়ে এঁদের নিয়ে যাবে গয়া কাশী ?

ঈশ্বর গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—আজ্ঞে তা যদিস্যাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তবে বলি, বর্ধমান ইস্তক বেশ যাবো। তারপর রাস্তা ধরে সোজা এজ্ঞে গয়া।

—বেশ। কি রাস্তা ?

—এজ্ঞে ইংরেজি কথায় বলে গ্যাং ট্যাং রাস্তা। আমরা বলি অহিল্যো-বাইয়ের রাস্তা।

—কতদিন ধরে সেখো-গিরি করচো ?

—তা বিশ বছর। একা তো যাইনে, সেখোর দল আছে, বর্ধমান থেকে যায়, চাকদহ থেকে, উলো থেকে যায়। এক আছে ধীরচাঁদ বৈরিগী, বাড়ি হুগলী। এক আছে কুমুদিনী জেলে, বাড়ি হাজরা পাড়া, ঐ হুগলী জেলা।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—কুমুদিনী জেলে, মেয়েমানুষ ?

—এজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি মেয়েমানুষ হলি কি হবে, কত পুরুষকে যে জব্দ করেচেন তা আর কি বলবো। রূপও তেমনি, জগদ্ধাত্রী পিরতিমে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—ও ঠিকই বলচে। বর্ধমান দিয়ে গিয়ে ওখানে শের শা'র বড় রাস্তা পাওয়া যায়। অহল্যাবাই-টাই বাজে, ওটা নবাব শের শা'র রাস্তা।

—কোথাকার নবাব ?

—মুরশিদাবাদের নবাব। সিরাজদৌলার বাবা।

দীনু ভটচাজ বললেন—হ্যাঁ বাবাজি, এখনো নাকি সায়েব কোম্পানী মুরশিদাবাদের নবাবকে খাজনা দেয় ?

ভবানী বললেন—তা হবে। ওসব আমি তত খোঁজ রাখিনে। আজ দুজন সন্নিসির কথা বলবো আপনাদের, শুনে বড় খুশি হবেন।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তাই বলো বাবাজি। ওসব নবাব-টবাবের কথায় দরকার নেই। আমি তো কুয়োর মধ্যি যেমন ব্যাঙ আছে, তেমনি আছি পড়ে। পয়সা নেই যে বিদেশে যাবো। বাবাজি ভয়ও পাই। কোথাও চিনি নে, গাঁ থেকে বেরুলি সব বিদেশ-বিভুঁই। চাকদা পজ্জন্ত গিইচি গঙ্গা-স্নানের মেলায়—আর ওদিকি গিইচি নদে-শান্তিপুর। ইছামতী দিয়ে নৌকা বেয়ে রাসের মেলায় নারকেল বিক্রি করতে গিইছিলাম বাবাজি। বেশ দু'পয়সা লাভ করেছিলাম সেবার।

সবাই ভবানীকে ঘিরে বসলেন। দীনু ভট্চাজ এগিয়ে এসে একেবারে সামনে বসলেন।

ভবানী বললেন—আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমার একজন গুরু-ভাই এসেছিলেন। ওঁর আশ্রম হোল মীর্জাপুর।

দীনু ভট্চাজ বললেন—সে কোথায় বাবাজি ?

—পশ্চিমে, অনেকদূর। সে আপনারা বুঝতে পারবেন না। চমৎকার পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সেখানে এক সাধু থাকেন, আমাদের বাঙালী সাধু, তাঁর নাম হৃষিকেশ পরমহংস। ছোট একখানা ঝুপড়িতে দিনরাত কাটান। নির্জন বনে শিরীষ ফুল আর কাঞ্চন ফুল ফোটে, ময়ূর বেড়ায় পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে, আমলকী গাছে আমলকী পাকে—

রূপচাঁদ মুখুয্যে আবেগভরে বললেন—বাঃ বাঃ—আমরা কথনো দেখি নি এমন জায়গা—

দীনু ভট্চাজ বললেন—পাহাড় কাকে বলে তাই দ্যাখলাম না জীবনে

বাবাজি, তার আবার ঝর্ণা!

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—পড়ে আছি গু-গোবরের গর্তে, আর দেখিচি কিছু, তুমিও যেমন! বয়েস পঁয়ষট্টির কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। তুমি সেখানে গিয়েচ বাবাজি?

ভবানী বললেন—আমি পরমহংস মহারাজের কাছে ছ'মাস ছিলাম। তিনিই আমার গুরু। তবে মন্ত্র-দীক্ষা আমি নিই নি, তিনি মন্ত্র দ্যান না কাউকে।

—মহারাজ কোথাকার?

—তা নয়। ওঁদের মহারাজ বলে ডাকা বিধি।

—ও। সেখানে জঙ্গলে খেতে কি?

—আমলকী, বেল, বুনো আম। আর এত আতার জঙ্গল পাহাড়ে! দু'ঝুড়ি দশ ঝুড়ি পাকা আতা জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় রোজ শেয়ালে খেতো। সুমিষ্ট আতা। তেমন এখানে চক্ষেও দেখেন নি আপনারা।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তাই বলো বাবাজি, ঈশ্বর বোষ্টমকে সেই হদিসটা দ্যাও দিকি। খুব করে আতা খেয়ে আসি—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আরে দূর কর আতা! ওই সব সাধু-সন্নিসির দর্শন পেলে তো ইহজন্ম সার্থক হয়ে গেল। বয়েস হয়েচে আর আতা খেলি কি হবে ভায়া? তারপর বাবাজি—?

—তারপর সেখানে কাটালুম ছ'মাস। সেখান থেকে গেলাম বিঠুর বাল্মীকি আশ্রমে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—বাল্মীকি মুনি? যিনি মহাভারত লিখেছিলেন?

দীনু ভচট্টাজ বললেন—তবে তুমি সব জানো! বাল্মীকি মুনি মহাভারত লিখতি যাবেন কেন? লিখেছিলেন রামায়ণ।

—ঠিক। তারপর সে আশ্রমেও এক সাধুর সঙ্গে কিছুদিন কাটালাম।

রূপচাঁদ বললেন—সেখানে যাবার হদিসটা দ্যাও বাবাজি।

—সে গৃহীলোকের দ্বারা হবে না। বিশেষ করে ঈশ্বর বোষ্টমের সঙ্গে গেলে হবে না। ও আর কতদূর আপনাদের নিয়ে যাবে? বর্ধমান গিয়ে বড় রাস্তা

ধরে আপনার চলে যান গয়া, সেখান থেকে কাশী। কাশী থেকে যাবেন প্রয়াগ।

মুনি ভরদ্বাজ বসহিঁ প্রয়াগা।
যিন্‌হি রামপদ অতি অনুরাগা।

প্রয়াগে সাবেক কালে ভরদ্বাজ মুনির অশ্রম ছিল। কুম্ভমেলার সময় সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যিসি আসেন। আমি গত কুম্ভমেলার সময় ছিলাম। কিন্তু যাওয়া বড় কষ্ট। হেঁটে যেতে হবে আমাদের এতটা পথ। শের শা' নবাবের রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে সরাইখানা আছে, সেখানে যাত্রীরা থাকে, রেঁধে বেড়ে খায়।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—চালডাল ?

—সব পাবেন সরাইতে। দোকান আছে। তবে দল বেধে যাওয়াই ভালো। পথে বিপদ আছে।

—কিসের বিপদ ?

—সব রকম বিপদ। চোর ডাকাত আছে, ঠগী আছে। বর্ধমান ছাড়িয়ে গয়া পর্যন্ত সারা পথে দারুণ বন পাহাড়। বড় বড় বাঘ, ভাল্লুক এ সব আছে।

—ও বাবা !

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—উনি ঠিকই বলেচেন। সেবার খাব্‌রাপোতা থেকে একজন যাত্রী গিয়েছিল গয়ায় যাবে বলে। ওদিকের এক জায়গায় সন্দেবেলা তিনি বললেন, হাতমুখ ধুতি যাবে। আমার কথা শোনলেন না। আমরা এক গাছতলায় চব্বিশজন আছি। তিনি মাঠের দিকে পলাশ গাছের ঝোপের আড়ালে ঘটি নিয়ে চললেন। বাস্‌! আর ফিরলেন না। বাঘে নিয়ে গেল।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন—বলো কি !

—হ্যাঁ। সে রাত্তিরি কি মুস্কিল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। সকালে কত খুঁজে তেনার রক্তমাখা কাপড় পাওয়া গেল মাটির মধ্যে। তাঁরে টান্‌তি টান্‌তি নিয়ে গিইছিল, তার দাগ পাওয়া গেল।

রূপচাঁদ বললেন—সর্বনাশ !

এমন সময় দেখা গেল নালু পাল এদিকে আসচে। নালু পালকে একটা খেজুর পাতার চাটাই দেওয়া গেল বসতে, কারণ সে আজকাল বড় দোকান

করেচে, ব্যবসাতে উন্নতি করেচে, বিয়ে-থাওয়া করেচে সম্প্রতি। তার দোকান থেকে ধারে তেলনুন এঁদের মধ্যে অনেককেই আনতে হয়। তাকে খাতির না করে উপায় নেই।

দীনু বললেন—এসো নালু, বোসো, কি মনে করে?

নালু গড় হয়ে সবাইকে এক সঙ্গে প্রণাম করে জোড়হাতে বললে—আমার একটা আবদার আছে, আপানাদের রাখতি হবে। আপনারা নাকি তীথি যাচ্চেন শোনলাম। একদিন আমি ব্রাহ্মণ-তীথিযাত্রী ভোজন করাবো। আমার বড় সাধ। এখন আপনারা অনুমতি দিন, আমি জিনিস পাঠিয়ে দেবো চক্কত্তি মহাশয়ের বাড়ি। কি কি পাঠাবো হুকুম করেন।

চন্দ্র চাটুয্যে আর ফণি চক্কত্তি গাঁয়ের মাতব্বর। তাঁদের নির্দেশের ওপর আর কারো কথা বলার জো নেই এই গ্রামে—এক অবিশ্যি রাজারাম রায় ছাড়া। তাঁকে নীলকুঠির দেওয়ান বলে সবাই ভয় করলেও সামাজিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব নেই। তিনিও কাউকে বড় একটা মেনে চলেন না, অনেক সময় যা খুশি করেন। সমাজপতিরা ভয়ে চুপ করে থাকেন।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—কি ফলার করাবে?

নালু হাতজোড় করে বললে,—আজ্ঞে, যা হুকুম।

—আধ মণ সরু চিঁড়ে, দই, খাড়গুড়, ফেনি বাতাসা, কলা, আখ, মঠ আর—

ফণি চক্কত্তি বললেন—মুড়কি।

—মুড়কি কত?

—দশ সের।

—মঠ কত?

—আড়াই সের দিও। কেষ্ট ময়রা ভালো মঠ তৈরী করে, ওকে আমাদের নাম করে বোলো। শক্ত দেখে কড়াপাকের মঠ করে দিলে ফলারের সঙ্গে ভালো লাগবে।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—দক্ষিণে কত দেবে ঠিক কর।

—আপনারা কি বলেন?

—তুমি বল ফণি ভায়া। সবই তো আমি বললাম, এখন তুমি কিছু বলো।

ফণি চক্কত্তি বললেন—এক সিকি করে দিও আর কি।

নালু বললে—বড্ড বেশি হচ্চে কর্তা। মরে যাবো। বিশজন ব্রাহ্মণকে বিশ সিকি দিতি হলি—

—মরবে না। আমাদের আশীর্বাদে তোমার ভালোই হবে। একটি ছেলেও হয়েচে না?

—আজ্ঞে সে আমার ছেলে নয়, আপনারই ছেলে।

চন্দ্র চাটুয্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। নালু পাল শেষে একটি দুয়ানি দক্ষিণেতে রাজী করিয়ে বাইরে চলে গেল। বোধ হয় তামাক খেতে।

এইবার চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—হ্যাঁ ভায়া, নালু কি বলে গেল?

—কি?

—তোমার স্বভাব-চরিত্তির এতদিন যাই থাক, আজকাল বুড়ো বয়েসে ভালো হয়েচে বলে ভাবতাম। নালুর বৌয়ের সঙ্গে ভাবসাব কতদিনের?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। রাগে ফণি চক্কত্তি জোরে জোরে তামাক টানতে টানতে বললেন—ওই তো চন্দরদা, এখনো মনের সন্দ গেল না—

চন্দ্র চাটুয্যে কিছুক্ষণ পরে ভবানীকে বললেন—বাবা, নালু পালের ফলার করে হবে তুমি দিন ঠিক করে দাও।

ভবানী বাঁড়ুযো বললেন—নালু পালের ফলারের কথায় মনে পড়লো মামা একটা কথা। ঝাঁসির কাছে ভরসুৎ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে অম্বিকা দেবীর মন্দিরে কার্তিক মাসে মেলা হয় খুব বড়। সেখানে আছি, ভিক্ষে করে খাই। কাছে এক রাজার ছেলে থাকেন. সাধুসন্নিসির বড় ভক্ত। আমাকে বললেন—কি করে খান? আমি বললাম, ভিক্ষে করি। তিনি সেদিন থেকে দুজনের উপযুক্ত ভাত, রুটি তরকারী, দই, পায়েস, লাড্ডু পাঠিয়ে দিতেন। যখন খুব ভাব হয়ে গেল তখন একদিন তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বললেন আমার কাছে। জয়পুরের কাছে উরিয়ানা বলে রাজ্য আছে. তিনি তার বড় রাজকুমার। তাঁর বাপের আরও অনেক ছেলেপিলে। মিতাক্ষরা মতে বড়

ছেলেই রাজ্যের রাজা হবে বুড়ো রাজার পরে। তাই জেনে ছোটরাণী সৎ ছেলেকে বিষ দেয় খাবারের সঙ্গে—

দীনু ভট্‌চাজ বলে উঠলেন—এ যে রামায়ণ বাবাজি!

—তাই। অর্থ আর যশ-মান বড় খারাপ জিনিস মামা। সেই জন্তেই ওসব ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর শুনুন, এমন চক্রান্ত আরম্ভ হোলো রাজবাড়িতে যে সেখানে থাকা আর চললো না। তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভরসুৎ গ্রামে একটা ছোট বাড়িতে থাকেন, নিজের পরিচয় দিতেন না কাউকে। আমার কাছে বলতেন, রাজা হোতে তিনি আর চান না। রাজারাজড়ার কাণ্ড দেখে তাঁর ঘেন্না হয়ে গিয়েচে রাজপদের ওপর।

ফণি চক্কত্তি বললেন—তখনো তিনি রাজা হন নি কেন?

—বুড়ো তখনো বেঁচে। তাঁর বয়েস প্রায় আশি। এই ছেলেই আমার সমবয়সী। আহা, অনেক দিন পরে আবার সেকথা মনে পড়লো। অম্বিকা দেবীর মন্দিরে পূর্বদিকের পাথর-বাঁধানো চাতালে বসে জ্যোৎস্নারাত্রে দুজনে বসে গল্প করতাম, সে-সব কি দিনই গিয়েচে! সামনে মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ওপারে রামজীর মন্দির। কি সুন্দর জায়গাটি ছিল। তাঁর ছোট সৎমা বিষ দিয়েছিল খাবারের সঙ্গে, কেবল এক বিশ্বস্ত চাকর জানতে পেরে তাঁকে খেতে বারণ করে। তিনি খাওয়ার ভান করে বলেন যে তাঁর শরীর কেমন করচে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করচে, এই বলে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন গিয়ে। ছোট সৎমা শুনে হেসেছিল, তাও তিনি শুনেছিলেন সেই বিশ্বস্ত চাকরের মুখে। সেই রাত্রেই তিনি রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে আসেন, কারণ শুনলেন ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেচে ভেতরে ভেতরে। ছোট রাণীর দল তাঁকে মারবেই। বুড়ো রাজা অকর্মণ্য, ছোটরাণীর হাতে খেলার পুতুল।

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—না পালালি, মঘা এড়াবি ক'ঘা—অমন সৎমা সব করতি পারে। বাবাঃ, শুনেও গা কেমন করে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি। আমি সেখানে দু'মাস ছিলাম। এই দু'মাসের

প্রত্যেক দিন দুটি বেলা অম্বিকা-মন্দিরের ধর্মশালায় আমার জন্যে খাবার পাঠাতেন। কত জ্ঞানের কথা বলতেন, দুঃখু করতেন যে রাজার ছেলে না হয়ে গরীবের ঘরে জন্মালে শান্তি পেতেন। আমার সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করতেন। তাঁর স্ত্রীকেও আমি দেখেছি, অম্বিকা-মন্দিরে পূজো দিতে আসতেন, রাজপুত মেয়ে, খুব লম্বা আর জোয়ান চেহারা, নাকে মস্ত বড় ফাঁদি নথ। একদিন দেখি ফর্সি টেনে তামাক খাচ্চেন—

রূপচাঁদ মুখুয্যে অবাক হয়ে বললে—মেয়েমানুষে ?

—ওদেশে খায়, রেওয়াজ আছে। বড় সুন্দর চেহারা, যেন জোরালো দুর্গাপ্রতিমা, অসুর মারলেই হয়। আমি ভাবতাম, না-জানি এঁর সেই সংশাগুড়ীটি কেমন, যিনি এঁকেও জব্দ করে রেখেচেন। মাস দুই পরে আমি ওখান থেকে বিঠুর চলে এলাম, কানপুরের কাছে। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে একদিন দেখেছিলাম অম্বিকা পূজো করতে। তারপর শুনেছিলাম ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ঝাঁসির রাণী মারা পড়েচেন—পরমা সুন্দরী ছিলেন—তবে ও দেশের মেয়ে, জোয়ান চেহারা—

—বল কি বাবাজি, এ যে সব অদ্ভুত কথা শোনালে। মেয়েমানুষে যুদ্ধ করলে কোম্পানীর সঙ্গে, ওসব কথা কখনো শুনি নি - কোন্ দেশের কথা এ সব ?

—শুনবেন কি মামা, গাঁ ছেড়ে কখনো কোথাও বেরুলেন না তো। কিছু দেখলেনও না। এবার যদি যান—।

এই সময় নালু পাল আবার ব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল। সে বাড়ি চলে যাবে, হাটবার, তার অনেক কাজ বাকি। দিনটা ধার্য করে দিলে সে চলে যেতে পারে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—সামনের পূর্ণিমার রাত্রে দিন ধার্য রইল। কি বলেন মামা ? সেদিন কারো অসুবিধে হবে ?

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—আমার বাতের ব্যামো। পুন্নিমেতে আমি লক্ষ্মীর দিব্যি খাবো না, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, ফল, দুধ, মঠ, এসব খাবো। ওই দিনই রইল ধার্য।

ঈশ্বর বোষ্টম এতক্ষণ চুপ করে ভবানীর গল্প শুনছিল, কোনো কথা বলে নি।

এইবার সে বলে উঠলো—আপনারা কোথাকার রাণীর কথা বললেন, লড়াই করলেন কাদের সঙ্গে। ও কথা শুনে আমার কেবলই মনে পড়চে কুমুদিনী জেলের কথা—

দীনু ভট্চাজ বললেন—বোসো! কিসি আর কিসি! কোথায় সেই কোথাকার রাণী লক্ষ্মীবাঈ, আর কোথায় কুমুদিনী জেলে! কেডা সে?

ঈশ্বর বোষ্টম একেবারে উত্তেজনার মুখে উঠে দাঁড়িয়েচে। দু' হাত নেড়ে বললে—আজ্ঞে ও কথা বলবেন না, খুড়ো ঠাকুর। আপনি সেখো কুমুদিনী জেলেকে জানেন না, ছাখেন নি, তাই বলচেন। তারে যদি ছাখতেন, তবে আপনারে বলতি হোত, হ্যাঁ, এ একখানা মেয়েছেলে বটে! এই দশাসই চেহারা, দেখতিও দশভুজো পিরতিমের মত। তেমনি সাহস আর বুদ্ধি। একবার আমাদের মধ্যি দুজনের ভেদবমির ব্যারাম হোল গয়া যাবার পথে, নিজের হাতে তাদের কি সেবাটা করতি ছাখলাম! মায়ের মত একবার গয়ালি পাণ্ডার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করলেন, যাত্রীদের ট্যাকা মোচড় দিয়ে আদায় করা নিয়ে। সে কি চেহারা? বললে, তুমি জানো আমার নাম কুমুদিনী, আমি ফি বচ্ছর দু'শো যাত্রী গয়ায় নিয়ে আসি। গোলমাল করবা তো এই সব যাত্রী আমি অন্য গয়ালি পাণ্ডার কাছে নিয়ে যাবো। পাণ্ডা ভয়ে চুপ। আর কথাটি নেই। সেখোদের মান না রাখলি যাত্রী হাতছাড়া হয়— বোঝলেন না? অমন মেয়েমানুষ আমি দেখি নি। কেউ কাছে ঘেঁষে একটা ফাষ্টিনাষ্টি করুক দেখি? বাব্বাঃ, কারু সাধ্যি আছে? নিজের মান রাখতি কি করে হয় তা সে জানে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—একবার নিয়ে এসো না এখানে। দেখি।

ভবানীর কথায় সবাই সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আনো না। তোমার তো জানাশুনো। আমরা দেখি একবার—

ঈশ্বর বোষ্টম চুপ করে রইল। দীনু ভট্চাজ বললেন—কি? পারবে না?

ঈশ্বর বললে—আজ্ঞে, তার মান বেশি। সেখোদের তিন মোড়ল। আমার কথায় তিনি এখানে আসবেন না। বাড়িও অনেক দূর, সেই হুগলী জেলায়।

গাঁ জানিনে, আমরা সব একেস্তার হই ফি কার্তিক মাসে বর্ধমান শহরে কেবল চক্কত্তির সরাইয়ে। আপনারা যদি তীখি যান, তবে তো তেনার সঙ্গে দেখা হবেই। চললাম এখন তাহ'লি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—এখানে জঙ্গলের মধ্যে এক যে সেই সন্নিসিনী আছে, খেপী বলে ডাকে, আপনারা কেউ গিয়েচেন? গিয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে আপনাদের।

ফণি চক্কত্তি বললেন—ও সব জায়গায় ব্রাহ্মণের গেলে মান থাকে না। শুনিচি সে মাগী নাকি জাতে বুনো। তুমিও বাবাজি সেখানে আর যেও না।

—মাপ করবেন মামা। ওখানে আপনাদের মান আমি রাখতে পারবো না। ভগবানের নাম করলে সব সমান, বুনো আর ব্রাহ্মণ কি মামা?

ফণি চক্কত্তি আশ্চর্য হয়ে বললেন—বুনো আর ব্রাহ্মণ সমান!

সবাই অবাক চোখে ভবানীর দিকে চেয়ে রইল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—ওই দুঃখেই তো রাজা না হয়ে ফকির হয়ে রইলাম বাবা।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো তাঁর কথায়।

ফণি চক্কত্তি বললেন—দাদার আমার কেবল রগড় আর রগড়! তারপর আসল কথার ঠিকঠিক হোক। কে কে যাচ্চ, কবে যাচ্চ। নালু পাল কবে খাওয়াবে ঠিক কর।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তুমি আর চন্দ্র ভায়া তো নিশ্চয় যাচ্চ?

—একেবারে নিশ্চয়।

—আর কে যাবে ঈশ্বর?

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—জেলে পাড়ার মধ্যি যাবে ভগীরথ জেলের বড়বৌ, পাগলা জেলের মা, আমাদের পাড়ার নরহরির বৌ. ব্রাহ্মণপাড়ায় আপনারা দুজন—হামিদপুর থেকে সাতজন—সব আমাদের খদ্দের। পুন্নিমের পরের দিন রওনা হওয়া যাবে। আমাকে আবার বর্ধমানে বীরচাঁদ বৈরিগী আর কুমুদিনী জেলের দলের সঙ্গে মিশতে হবে কার্তিক পূজোর দিন। রাণীগঞ্জে এক সরাই

আছে, সেখানে দু'দিন থেকে জিরিয়ে নিয়ে তবে আবার রওনা। রাণীগঞ্জের সরাইতে দু'তিন দল আমাদের সঙ্গে মিলবে। সব বলা-কওয়া থাকে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—আমি বড় ছেলেডারে বলে দেখি, সে আবার কি বলে। আমার আর সে যুৎ নেই ভায়া। ভবানীর মুখে শুনে বড্ড ইচ্ছে করে ছুটে চলে যাই সেই সন্নিসি ঠাকুরের আশ্রমে। অই সব ফুল ফোটা, আমলকী গাছে আমলকী ফল, ময়ূর চরচে—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। কখনো কিছু ছাখলাম না বাবাজি জীবনে।

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—যাবেন মুখুয্যে মশায়। আমার জানাশুনো আছে সব জায়গায়, কিছু কম করে নেবে পাণ্ডারা।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—তাই চলো ভায়া। আমরা পাঁচজন আছি, এক রকম করে হয়ে যাবে, আটকাবে না।

ধার্মিক নালু পালের তীর্থযাত্রীসেবার দিন চন্দ্র চাটুয্যের বাড়িতে ক'টি তীর্থযাত্রী ছাড়া আরও লোক দেখা গেল যারা তীর্থযাত্রী নয়—যেমন ভবানী বাঁড়ুযো, দেওয়ান রাজারাম ও নীলমণি সমাদ্দার। শেষের লোকটি ব্রাহ্মণও নয়। খোকাকে নিয়ে তিলু এসেছিল ভোজে সাহায্য করতে। ভবানী নিজের হাতে পাতা কেটে এনে ধুয়ে ভেতরের বাড়ির রোয়াকে পাতা পেতে দিলেন, তিলু সাত-আট কাঠা সরু বেনামুড়ি ধানের চিঁড়ে ধুয়ে একটা বড় গামলায় রেখে দিয়ে মুড়কি বাছতে বসলো। পৃথক একটা বারকোশে মঠ ও ফেনিবাতাসা স্তূপাকার করা রয়েচে, পাঁচ-ছ পাতলে হাঁড়িতে দই বারকোশের পাশে বসানো। রূপচাঁদ মুখুয্যে একগাল হেসে বললেন—নাঃ, নালু পাল যোগাড় করেচে ভালো—মনটা ভালো ছোকরার—

তিলু এ গ্রামের মেয়ে। ব্রাহ্মণেরা খেতে বসলে সে চিঁড়ে মুড়কি মঠ যার যা লাগে পরিবেশন করতে লাগলো।

চন্দ্র চাটুয্যে নিজে খেতে বসেন নি, কারণ তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হচ্চে, তিনি গৃহস্বামী, সবার পরে খাবেন। আর খান নি ভবানী বাঁড়ুযো। স্বামী-

স্ত্রীতে মিলে এমন সুন্দরভাবে ওরা পরিবেশন করলে যে সকলেই সমানভাবে সব জিনিস খেতে পেলে—নয়তো এসব ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে সাধারণতঃ যার বাড়ি, তার নিভৃত কোণের হাঁড়ি কলসীর মধ্যে অর্ধেক ভালো জিনিস গিয়ে ঢোকে সকলের অলক্ষিতে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—বেশ মঠ করেচে কড়াপাকের। কেষ্ট ময়রা কারিগর ভালো—ওহে ভবানী, আর দুখানা মঠ এ পাতে দিও—

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তবে ওই সঙ্গে আমাকেও একখানা—

তিলু হেসে বললে—লজ্জা করচেন কেন কাকা—আপনাকে ক'খানা দেবো বলুন না? দু'খানা না তিনখানা?

—না মা, দু'খানা দাও। বেশ খেতে হয়েচে—এর কাছে আর খাঁড় গুড় লাগে?

—আর একখানা?

—না মা, না মা—আঃ—আচ্ছা দাও না হয়—ছাড়বে না যখন তুমি!

রূপচাঁদ মুখুয্যে দেখলেন তিলুর সুগৌর সুপুষ্ট বাউটি ঘুরানো হাতখানি তাঁর পাতে আরও দু'খানা কড়াপাকের কাঁচা সোনার রংয়ের মঠ ফেলে দিলে। অনেক দিন গরীব রূপচাঁদ মুখুয্যে এমন চমৎকার ফলার করেন নি, এমন মঠ দিয়ে মেখে।

এই মঠের কথা মনে ছিল রূপচাঁদ মুখুয্যের, গয়া যাবার পথে গ্যাং ট্যাং রোডের ওপর বারকাট্টা নামক অরণ্য-পর্ব -সঙ্কুল জায়গায় বড্ড বিপদের মধ্যে পড়ে একটা গাছের তলায় ওদের ছোট্ট দলটি আশ্রয় নিয়েছিল অন্ধকার রাত্রে —ডাকাতেরা তাঁদের চারিধার থেকে ঘিরে ফেলে সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, ভাগ্যে তাঁদের বড় দলটি আগে চলে গিয়ে এক সরকারী চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাই রক্ষে, দলের টাকাকড়ি সব ছিল সেই বড় দলের কাছে। কেন যে সে রাত্রে অন্ধকার মাঠের আর বনপাহাড়ের নির্জন, ভীষণ রূপের দিকে চেয়ে নিরীহ রূপচাঁদ মুখুজ্যের মনে হঠাৎ তিলুর বাউটি-ঘোরানো হাতে মঠ পরিবেশনের

ছবিটা মনে এসেছিল—তা তিনি কি করে বলবেন ?

তবুও সে রাত্রে রূপচাঁদ মুখুয্যে একটা নতুন জীবন-রসের সন্ধান পেয়েছিলেন যেন। এতদিন পরে তাঁর ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে বহুদূরে, তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের জীবন থেকে বহুদূরে এসে জীবনটাকে যেন নতুন ক'রে তিনি চিনতে পারলেন।

স্ত্রী নেই—আজ বিশ বৎসরের ওপর মারা গিয়েচে। সেও যেন স্বপ্ন, এতদূর থেকে সব যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। ইছামতীর ধারের তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে এখনি নিবারণ গয়লার বেগুনের ক্ষেতে হয়তো তাঁর ছাগলটা ঢুকে পড়েচে, ওরা তাড়াহুড়ো করচে লাঠি নিয়ে, তাঁর বড় ছেলে যতীন হয়তো আজ বাড়ি এসেচে, পুবের এড়ো ঘরে বৌমা ও দুই মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে—বেচারী খোকা! মাত্র পাঁচ টাকা মাইনেতে সাতক্ষীরের ন'বাবুদের তরফে কাজ করে, দু'তিন মাস অন্তর একবার বাড়ি আসতে পারে, ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে মনটা কেমন করলেও চোখের দেখা দেখতে পায় না। গরীবের অদৃষ্টে এ রকমই হয়।

বড় ভালো ছেলে তাঁর।

যখন কথাবার্তা সব ঠিকঠাক হোলো গয়াকাশী আসবার, তখন বড় খোকা এসে দাঁড়িয়ে বললে—বাবা তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে ?

—আছে কিছু।

—কত ?

—তা—ত্রিশটাকা হবে। ছোবায় পুঁতে রেখে দিয়েছিলাম সময়ে অসময়ের জন্যি। ওতেই হবে খুনু।

—বাবা শোনো—ওতে হবে না—আমি তোমায়—

—হবে রে হবে। আর দিতি হবে না তোরে।

জোর করে পনেরোটি টাকা বড় খোকা দিয়েছিল তাঁর উড়্‌নির মুড়োতে বেঁধে। চোখে জল আসে সে কথা ভাবলে। কি সুন্দর তারাভরা আকাশ, কি চমৎকার চওড়া মুক্ত মাঠটা, একসারি ভূতের মত অন্ধকার গাছগুলো…চোখে জল আসে খোকার সেই মুখ মনে হলে…

মন কেমন করে ওঠে গরীব ছেলেটার জন্যে, একখানা ফরাসডাঙার ধুতি

কখনো পরাতে পারেন নি ওকে···সামান্য জমানবীশের কাজে কিই বা উপার্জন। বায়ুভূত, নিরালম্ব কোন ভাসমান আত্মার মত তিনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন অন্ধকার জগতের পথে পথে—কোথায় রলি খোকা, কোথায় রলি নাতনী দুটি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার চন্দ্র চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে নালু পালের ব্রাহ্মণভোজন হচ্চে। যারা তীর্থ থেকে ফিরেচে, সেই সব মহাভাগ্যবান লোককে আজ আবার নালু পাল ফলার করাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর।

নালু পাল গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে সব তদারক করচে। আম কাঁঠাল জড়ো করা হয়েচে ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে।

সকলেই এসেচেন, ফণি চক্কত্তি, চন্দ্র চাটুয্যে, ঈশ্বর বোষ্টম, নীলমণি সমাদ্দার—নেই কেবল রূপচাঁদ মুখুয্যে। তিনি কাশীর পথে দেহ রেখেছেন, সে খবর ওঁরা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন কিন্তু যতীন সে চিঠি পায় নি।

নীলমণি সমাদ্দারের কাছে চন্দ্র চাটুয্যে তীর্থভ্রমণের গল্প করছিলেন, গ্যাং ট্যাং রোডের এক জায়গায় কি ভাবে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, গয়ালি পাণ্ডা কি অদ্ভুত উপায়ে তাদের খাতা থেকে তাঁর পিতামহ বিষ্ণুরাম চাটুয্যের নাম উদ্ধার করে তাঁকে শোনালে।

নীলমণি সমাদ্দার বললেন—রূপচাঁদ কাকার কথা ভাবলি বড় কষ্ট হয়। পুণ্যি ছিল খুব, কাশীর পথে মারা গেলেন। কি হয়েছিল?

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আমরা কিছু ধরতি পারি নি ভায়া। বিকারের ঘোরে কেবলই বলতো—খোকা কোথায়? আমার খোকা কোথায়? খোকা, আমি তামাক খাবো—আহা, সেদিন যতীন শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

নীলমণি বললেন—যতীন বড় পিতৃভক্ত ছেলে।

—উভয়ে উভয়কে ভালো না বাসলি ভক্তি আপনি আসে না ভায়া। রূপচাঁদ কাকাও ছেলে বলতি অজ্ঞান। চিরডা কাল দেখে এসেচি।

নালু পাল খুব আয়োজন করেছিল, চিঁড়ে যেমন সরু, জ্যৈষ্ঠ মাসে ভালো

আম-কাঁটালও প্রচুর।

ফণি চক্কত্তি ঘন আওটানো দুধের সঙ্গে মুড়কি আর আম-কাঁটালের রস মাখতে মাখতে বললেন—চন্দরদা, সেই আর এই! ভাবি নি যে আবার ফিরে আসবো। কুমুদিনী জেলের দলের সেই সাতকড়ি আমাদের আগেই বলেছিল, বর্ধমান পার হবেন তো ডাকাতির দল পেছনে লাগবে। ঠিক হোলো কি তাই!

—আমার কেবল মনে হচ্চে সেই পাহাড়ের তলাডা—ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, বড় বড় কি গাছের ছায়া। রূপচাঁদ কাকা যেখানে দেহ রাখলেন। অমনি জায়গাডা বুড়ো ভালোবাসতো। আমাকে কেবল বলে—এ যেন সেই বাল্মীকি মুনির আশ্রম—

নালু পাল হাত জোড় করে বললে—আমার বড্ড ভাগ্যি. আপনারা সেবা করলেন গরীবের দুটো ক্ষুদ। আশীব্বাদ করবেন. ছেলেডা হয়েচে যেন বেঁচে থাকে, বংশডা বজায় থাকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে ফিরে এলে বিলু বললে—আপনার সোহাগের ইস্ত্রী কোথায়? এখনো ফিরলেন না যে? খোকা কেঁদে কেঁদে এইমাত্তর ঘুমিয়ে পড়লো।

—তার এখনো খাওয়া হয়নি। এই তো সবে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হোলো—

নিলু শুয়ে ছিল বোধ হয় ঘরের মধ্যে, অপরাহ্ণ বেলা, স্বামীর গলার স্বর শুনে ধড়মড় ক'রে ঘুমের থেকে উঠে ছুটে বাইরে এসে বললো—এসো এসো নাগর, কতক্ষণ দেখি নি যে! বলি কি দিয়ে ফলার করলে? কি দিয়ে ফলার করলে?

ভবানী মুখ গম্ভীর করে বললেন—বয়েসে যত বুড়ো হচ্চো, ততই অশ্লীল বাক্যগুলো যেন মুখের আগায় খই ফুটচে। কই, তোমার দিদি তো কখনো—

বিলু বললে—না না, দিদির যে সাত খুন মাপ! দিদি কখনো খাবাপ কিছু করতে পারে? দিদি যে স্বগ্গের অপ্সরী। বলি সে আমাদের দেখার

দরকার নেই, আমাদের খাবার কই ? চিঁড়ে-মুড়কি ? আমরা হচ্চি ডোম ডোকলা ; ছেচতলায় বসে চিঁড়ে-মুড়কি খাবো, হাত তুলি বলতি বলতি বাড়ি যাবো। সত্যি না কি ?

নিলু মুখ টিপে টিপে হাসছিল। এবার সামনে এসে বললে—থাক গো, নাগরের মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, আর বলো না দিদি। আমারই যেন কষ্ট হচ্চে। উনি আবার যা তা কথা শুনতি পারেন না। বলেন—কি একটা সংস্কৃতো কথা, আমার মুখ দিয়ে কি আর বেরোয় দিদি ?

ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়িতে একখানা মাত্র চারচালা ঘর, আর উত্তরের পোঁতায় একখানা ছোট দু'চালা ঘর। ছোট ঘরটাতে ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজে থাকেন এবং অবসর সময়ে শাস্ত্রপাঠ করেন বসে। তিলু এই ঘরেই থাকে তাঁর সঙ্গে, বিলু আর নিলু থাকে বড় চারচালা ঘরটাতে। খোকা ছোট ঘরে তার মার সঙ্গে থাকে অবিশ্যি। নিলু হঠাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বড় ঘরটাতে। খোকা সেখানে শুয়ে ঘুমুচ্চে। ভবানী দেখলেন খোকা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, টানা টানা চোখ দুটি নিদ্রিত নারায়ণের মত নিমীলিত। ভবানী বাঁড়ুয্যে শিশুকে ওঠাতে গেলে নিলু বলে উঠলো—ফুটকে উঠিও না বলে দিচ্চি। এমন কাঁদবে তখন, সামলাবে কেডা ?

ভবানী তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠিয়ে বসালেন, খোকা চোখ বুজিয়েই চুপ করে বসে রইল, নড়লেও না চড়লেও না—কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। কি নিষ্পাপ মুখখানা! সমগ্র জগৎ-রহস্য যেন ঐ শিশুর পেছনে অসীম প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। মহর্লোক থেকে নিম্নতম ভূমি পর্যন্ত ওর পাদস্পর্শের ও খেয়ালী লীলার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে, তারায় তারায় সে আশা-নিরাশার বাণী জ্যোতির অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

নিলু বললে—ওর ঘাড় ভেঙে যাবে—ঘাড় ভেঙে যাবে—কি আপনি ? কচি ঘাড় না ?

বিলু ছুটে এসে খোকাকে আবার শুইয়ে দিলে। সে যেমন নিঃশব্দে বসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘুমুতে লাগলো।

বিলু ও নিলু স্বামীর দু'দিকে দুজন বসলো। বিলু বললে—পচা গরম পড়েচে আজ, গাছের পাতাটি নড়চে না! জানেন, আমাদের দু'খানা কাঁটালই পেকে উঠেচে?

পাকা কাঁটালের গন্ধ ভুর ভুর করছিল ঘরের গুমট বাতাসে। বিলুর খুশির স্বরে ভবানীর বড় স্নেহ হোল ওর ওপরে। বললেন—দুটোই পেকেচে? রসা না খাজা?

—বেলতলী আর কদমার কাঁটাল। একখানা রসা একখানা খাজা। খাবেন রাত্তিরি?

—আমি বুঝি বকাসুর? এই খেয়ে এসে আবার যা পাবো তাই খাবো?

বিলু বললে—আপনি যদি না খান, তবে আমরা খেতে পাচ্চিনে। অমন ভালো কাঁটালটা নষ্ট হয়ে যাবে পাক ওজর হয়ে। একটাও কোষ খান।

—দিও রাত্রে।

—না, এখুনি খেতে হবে, নিলু এখনই কাঁটাল খাবার জন্যি আমারে বলেচে। ছেলেমানুষ তো, নোলা বেশি।

—ছেলেমানুষ আবার কি। ত্রিশের ওপর বয়স হতে চললো, এখনো—

—থাক, আপনার আর তন্তর-শান্তর আওড়াতে হবে না। আমাদের সব দোষ, দিদির সব গুণ।

ভবানী হেসে বললেন—আচ্ছা দাও, এক কোষ কাঁটাল খেলেই যদি তোমাদের খাওয়ার পথ খুলে যায় তো যাক্।

সন্ধ্যার পর তিলু এল ছোট ঘরখানাতে। বিলু দিয়ে গেল খোকাকে ওর মায়ের কাছে এ ঘরে। ভবানী বললেন—কেমন খেলে?

—ভালো। আপনি?

—খুব ভালো। তোমার বোনদের রাগ হয়েচে আমরা খেয়ে এলাম বলে। কিছু আনলাম না, ওরা রাগ করতেই পারে।

—সে আমি ঠিক করে এনেচি গো, আপনারে আর বলতি হবে না। দুটো সরু চিড়ে ওদের জন্যি আনি নি বুঝি মামীমার কাছ থেকে চেয়ে? ওগো,

আজ আপনি ওদের ঘরে শুলে পারতেন।

—যাবো ?

—যান। ওদের মনে কষ্ট হবে। একে তো খেয়ে এলাম আমরা দুজনে খোকাকে ওদের ঘাড়ে ফেলে। আবার এ ঘরে যদি আপনি থাকেন, তবে কি মনে করবে ওরা ? আপনি চলে যান।

—তোমার পড়া তা হোলে আর হবে না। ঈশোপনিষদ আজ শেষ করবো ভেবেছিলাম।

—চোদ্দর শ্লোকটা আজ বুঝিয়ে নেবো ভেবেছিলাম—হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে—

—হে পূষন্, অর্থাৎ সূর্যদেব, মুখের আবরণ সরাও, যাতে আমরা সত্যকে দর্শন করিতে পারি। সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত—তাই বলচে। বেদে সূর্যকে কবির জ্যোতিস্বরূপ বলেচে। কবির স্বর্গীয় জ্যোতির স্বরূপ হচ্ছে সূর্যদেব।

—আমি আজ বসে বসে চোদ্দর এই শ্লোকটা পড়ি। নারদ ভক্তিসূত্র ধরাবেন বলেছিলেন, কাল ধরাবেন। বসুন, আর একটুখানি বসুন—আপনাকে কতক্ষণ দেখি নি।

—বেশ। বসি।

—যদি আজ মরে যাই আপনি খোকাকে যত্ন কোরবেন ?

—হুঁ।

—ওমা, একটা দুঃখের কথাও বলবেন না, শুধু একটু হুঁ—ও আবার কি ?

—তুমি আর আমি এই গাঁয়ের মাটিতে একটা বংশ তৈরী ক'রে রেখে যাবো—আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, এই আমাদের বাঁশবাগানের ভিটেতে পাঁচপুরুষ বাস করবে, ধানের গোলা করবে, লাঙল-খামার করবে, গরুর গোয়াল করবে।

তিলু স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—আপনারে ফেলে থাকতি চায় না আমার মন। মনডার মধ্যি

বড্ড কেমন করে। আপনার মন কেমন করে আমার জন্যি? অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতং, আপনি ভাবচেন আমি সামান্য মেয়েমানুষ? আপনি মূঢ় তাই এমনি ভাবচেন? কে জানেন আমি?

ভবানী তিলুর রঙ্গভঙ্গিমাখানো সুন্দর ডাগর চোখ দুটিতে চুম্বন ক'রে ওর চুলের রাশ জোর ক'রে মুঠো বেঁধে ধরে বললেন—তুমি হোলে দেবী, তোমাকে চিনতে আমার দেরি নেই। কি মোচার ঘণ্টই করো, কি কচুর শাকই রাঁধো—ঝালির পাক মুখে দেবার জো নেই, যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ, আকারোসদৃশ প্রাজ্ঞঃ—

তিলু রাগ দেখিয়ে স্বামীর কোল থেকে মাথা তুলে নিয়ে বললে—বিশ্বাস-ঘাতকং ত্বং—আমার রান্না কচুর শাক খারাপ? এ পর্যন্ত কেউ—

—ভুল সংস্কৃত হোল যে। কান মলা খাও, এর নাম ব্যাকরণ পড়া হচ্চে, না? কি হবে ও কথাটা? কি বিভক্তি হবে?

—এখন আমি বলতে পাচ্চিনে। ঘুম আসচে। সারাদিনের খাটুনি গিয়েছে কেমন ধারা। অতগুলো লোকের চিঁড়ে একহাতে ঝেড়েচি, বেছেচি, ভিজিয়েচি। আম-কাঁটাল ছাড়িয়েচি।

—তুমি ঘুমোও, আমি ও ঘরে যাই।

বিলু নিলু স্বামীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। নিলু বললে—নাগর যে পথ ভুলে? কার মুখ দেখে আজ উঠিচি না জানি।

বিলু বললে—আপনাকে আজ ঘুমুতে দেবো না। সারারাত গল্প করবো। নিলু, কি বলিস?

—তার আর কথা? বলে—

কালো চোখের আঙরা
কেন রে মন ভোমরা?

কাঁটাল খাবেন তো খাজা দুটো কাঁটালই পেকেচে। দিদির জন্যি পাঠিয়ে দিই। আজ কি করবেন শুনি।

নিলু বললে—দিদিকে রোজ রাত্তিরে পড়ান, আমাদের পড়ান না কেন?

—পড়াবো কি, তুমি পড়তে বসবার মেয়ে বটে। জানো, আজকাল কলকাতায় মেয়েদের পড়বার জন্যে বেথুন বলে এক সাহেব ইস্কুল করে দিয়েচে। কত মেয়ে সেখানে পড়চে।

—সত্যি ?

—সত্যি না তো মিথ্যে ? আমার কাছে একখানা কাগজ আছে—সর্ব শুভকরী বলে। তাতে একজন বড় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই সব লিখেচেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার দরকার। শুধু কাঁটাল খেলে মানব-জীবন বৃথায় চলে যাবে। না দেখলে কিছু, না বুঝলে কিছু।

বিলু বললে—কাঁটাল খাওয়া খুঁড়বেন না বলে দিচ্চি। কাঁটাল খাওয়া কি খারাপ জিনিস ?

নিলু বললে—খেতেই হবে আপনাকে দশটা কোষ। কদমার কাঁটাল কখনো খান নি, খেয়েই দেখুন না কি বলচি।

—আমি যদি খাই তোমরা লেখাপড়া শিখবে ? তোমার দিদি কেমন সংস্কৃত শিখেচে, কেমন বাংলা পড়তে পারে। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা মুখস্থ করেচে। তোমরা কেবল—

নিলু কৃত্রিম রাগের স্বরে হাত তুলে বললে—চুপ! কাঁটাল খাওয়ার খোঁটা খবরদার আর দেবেন না কিন্তু—

—স্বাধ্যায় কাকে বলে জানো ? রোজ কিছু কিছু শাস্ত্র পড়া। ভগবানের কথা জানবার ইচ্ছে হয় না ? বৃথা জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে লাভ কি ? কাঁ—

—আবার!

—আচ্ছা যাক। ভগবানের কথা জানবার ইচ্ছে হয় না ?

—আমরা জানি।

—কি জানো ? ছাই জানো।

—দিদি বুঝি বেশি জানে আমাদের চেয়ে

—সে উপনিষদ পড়ে আমার কাছে। উপনিষদ কি তা বুঝতে পারবে না এখন। ক্রমে বুঝবে যদি লেখাপড়া শেখো।

—আপনি এ সব শিখলেন কোথায় ?

—বাংলা দেশে এর চর্চা নেই। এখানে এসে দেখচি শুধু মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর মনসার ভাসান আর শিবের বিয়ে এই সব। বড্ড জোর ভাষা রামায়ণ মহাভারত। এ আমি জেনেছিলাম হৃষিকেশ পরমহংসজির আশ্রমে, পশ্চিমে। তাঁর আর এক শিষ্য ওই যে সেবার এসেছিলেন তোমরা দেখেচ—আমার চোখ খুলে দিয়েচেন তিনি। তিনি আমার গুরু এই জন্যেই। মন্ত্র দেননি বটে তবে চোখ খুলে দিয়েছিলেন। আমি তখন জানতাম না, কলকাতায় রামমোহন রায় বলে একজন বড় লোক আর ভারী পণ্ডিত লোক নাকি এই উপনিষদের মত প্রচার করেছিলেন। তাঁর বইও নাকি আছে। সর্ব শুভকরী কাগজে লিখেছে।

—ও সব খৃষ্টানী মত। বাপ-পিতেমো যা করে গিয়েচে—

—নিলু, বাপ-পিতামহ কি করেচেন তুমি তার কতটুক জানো ? উপনিষদের ধর্ম ঋষিদের তৈরি তা তুমি জানো ? আচ্ছা, এসব কথা আজ থাক। রাত হয়ে যাচ্চে।

—না বলুন না শুনি—বেশ লাগচে।

—তোমার মধ্যে বুদ্ধি আছে, তোমার দিদির চেয়েও বেশি বুদ্ধি আছে। কিন্তু তুমি একেবারে ছেলেমানুষি করে দিন কাটাচ্চ।

বিলু বললে—ওসব রাখুন। আপনি কাঁটাল খান। আমরা কাল থেকে লেখাপড়া শিখবো। দিদির সঙ্গে একসঙ্গে বসে কিন্তু বলবেন আপনি। আলাদা না।

নিলু ততক্ষণ একটা পাথরের খোরায় কাঁটাল ভেঙে স্বামীর সামনে রাখলো।

ভবানী বললেন—এতগুলো খাবো ?

নিলু মাত্র দুটি কোষ তুলে নিয়ে বললে—বাকিগুলো সব খান। কদমার কাঁটাল। কি মিষ্টি দেখুন। নাগর না খেলি আমাদের ভালো লাগে, ও নাগর ? এমন মিষ্টি কাঁটালডা আপনি খাবেন না ? খান খান, মাথার দিব্যি।

বিলু বললে—কাঁটাল খেয়ে না, একটা বিচি খেয়ে নেবেন নুন দিয়ে। আর কোনো অসুখ করবে না। ওই রে ! খোকন কেঁদে উঠলো দিদির ঘরে। দিদি

বোধহয় সারাদিন খাটাখাটুনির পরে ঘুমিয়ে পড়েচে—শীগ্‌গির যা নিলু—

নিলু ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। ঘেঁটুফুলের পাপড়ির মত সাদা জ্যোৎস্না বাইরে।

রামকানাই কবিরাজ গত এক বছর গৃহহীন, আশ্রয়হীন হয়ে আছেন। সেবার তিনদিন নীলকুঠির চুনের গুদামে আবদ্ধ ছিলেন, দেওয়ান রাজারাম অনেক বুঝিয়েছিলেন, অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে রাজী করাতে পারেন নি রামকানাইকে। শ্যামচাঁদের ফলে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন চুনের গুদামে। নীলকুঠির সাহেবদের ঘরে বসে কি তিনি জল খেতে পারেন? জলস্পর্শ করেন নি সুতরাং ক'দিন। মর-মর দেখে তাঁকে ভয়ে ছেড়ে দেয়। নিজের সেই ছোট্ট দোচালা ঘরটাতে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, ঘরটা আছে বটে কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই, হাঁড়িকুড়ি ভেঙেচুরে তচনচ্‌ করেচে, তাঁর জড়িবুটির হাঁড়িটা কোথায় ফেলে দিয়েচে—তাতে কত কষ্টে সংগ্রহ করা সোঁদালি ফুলের গুঁড়ো, পুনর্ণবা, হলহলি শাকের পাতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নালিমূলের লতা এইসব জিনিস শুকনো অবস্থায় ছিল। দশ আনা পয়সা ছিল একটা নেকড়ার পুঁটুলিতে, তাও অন্তর্হিত। ঘরের মধ্যে যেন মত্ত হস্তী চলাফেরা করে বেড়িয়ে সব ওলট-পালট, লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েচে।

চাল ডাল কিছু একদানাও ছিল না ঘরে। বাড়ি এসে যে এক ঘটি জল খাবেন এমন উপায় ছিল না,—না কলসী, না ঘটি।

রাম সর্দারের খুনের মামলা চলেছিল পাঁচ-ছ' মাস ধরে। শেষে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তার কি একটা মীমাংসা করে দিয়ে যান।

রামকানাই আগে দু'একটা রোগী যা পেতেন, এখন ভয়ে তাঁকে আর কেউ দেখাতো না। দেখালে দেওয়ান রাজারামের বিরাগভাজন হতে হবে। রামকানাইকে তিন-চার মাস প্রায় অনাহারে কাটাতে হয়েছে। পৌষ মাসের শেষে রামকানাই অসুখে পড়লেন। জ্বর, বুকে ব্যথা। সেই ভাঙা দোচালায়

একা বাঁশের মাচাতে পড়ে থাকেন, কেউ দেখবার নেই, নীলকুঠির ভয়ে কেউ তাঁর কাছেও ঘেঁষে না।

একদিন ফর্সা শাড়ি-পড়া মেমেদের মত হাতকাটা জামা গায়ে দেওয়া এক স্ত্রীলোককে তাঁর দীন কুটিরে ঢুকতে দেখে রামকানাই রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

—এসো মা বোসো। তুমি ক'নে থেকে আসচো? চিনতি পারলাম না যে।

স্ত্রীলোকটি এসে তাঁকে দূর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। বললে—আমারে চিনতে পারবেন না, আমার নাম গয়া।

রামকানাই এ নাম শুনেছিলেন, চমকে উঠে বললেন—গয়া মেম?

—হাঁ বাবাঠাকুর, ঐ নাম সবাই বলে বটে।

—কি জন্যি এসেচো মা? আমার কত ভাগ্যি।

—আপনার ওপর সায়েবদের মধ্যি ছোটসায়েব খুব রাগ করেচে। আর করেচে দেওয়ানজি। কিন্তু বড়সায়েব আপনার ওপর এ-সব অত্যাচারের কথা অনাচারের কথা কিছুই জানে না। আপনি আছেন কেমন?

—জ্বর। বুকে ব্যথা। বড় দুর্বল।

—আপনার জন্যি একটু দুধ এনেছিলাম।

—আমি তো জ্বাল দিয়ে খেতি পারবো না। উঠতি পারচি নে। দুধ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও মা।

—না বাবাঠাকুর, আপনার নাম করে এনেলাম—ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না। আপনি না খান, বেলগাছের তলায় ঢেলি রেখে দিয়ে যাবো। আমার কি সেই ভাগ্যি, আপনার মত ব্রাহ্মণ মোর হাতের দুধ সেবা করবেন।

রামকানাই শঠ নন, বলেই ফেললেন—আমি মা শূদ্রের দান নিই না।

গয়া চতুর মেয়ে, হেসে বললে—কিন্তু মেয়ের দান কেন নেবেন না বাবাঠাকুর? আর যদি আপনার মনে হ্যাচাং-প্যাচাং থাকে, মেয়ের দুধির দাম আপনি সেরে উঠে দেবেন এর পরে। তাতে তো আর দোষ নেই?

—হ্যাঁ, তা হতি পারে মা।

—বেশ। সেই কথাই রইল। দুধ আপনি সেবা করুন।

—জ্বাল দেবে কে তাই ভাবচি। আমার তো উঠবার শক্তি নেই।

গয়া মেম ভয়ে ভয়ে বললে—বাবাঠাকুর, আমি জ্বাল দিযে দেবো?

—তা ছাও। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মা। দান না নিলিই হোলো। তাতেও তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমার বাপ-ঠাকুরদা কখনো দান নেন নি, আমি নিলি পতিত হবো বুড়োবয়সে। তবে কি জানো, খেতি হবে আমায় তোমাদের জিনিস। পাড় হয়ে পড়লাম কিনা! কে করবে বলো? কে দেবে?

—মুই দেবানি বাবাঠাকুর। কিছু ভাববেন না। আপনার মেয়ে বেঁচি থাকতি কোনো ভাবনা নেই আপনার।

বড়সাহেব শিপ্‌টন্‌ সেইদিন সন্ধ্যার সময় ছোটসাহেবকে ডেকে পাঠাল।

ছোটসাহেব ঘরে ঢুকে বললেন—Good afternoon, Mr Shipton.

—I say, good afternoon, David. Now, what about our poor Kaviraj? I hear there's smoething amiss with him?

—Good heavens! I know very little about him.

—It is very good of you to know little about the poor old man! My Ayah Gaya was telling me, he is down with fever and of course she did her best. She was very nice to him. But how is it you are alone? Where is our precious Dewan?

—There. Speeding up Mark Khatians. Shall I send for him?

— No. And, after the rather unsatisfactory experience you had of his ways and things, see that he does not get a free hand in chastising and chastening people. You understand?

— Yes, Mr. Shipton.

—Well, what have you been up to all day ?

—I was checking up audit accounts and—

—That's so. Now, listen to my words. Our guns were intact but they ceased fire while you were standing idly by with your wily Dewan waiting for orders No, David, I really think, the way you did it was ever so odd and tactless. Mend up your ways to Kaviraj. I mean it. You know, there aren t any secrets. You see ?

—Yes Mr Shipton.

—Now you can retire. I am dreadfully tired. Things are coming to a head. If you don't mind, I will rather dine in my room with Mrs.

—Please yourelf, Mr. Shipton. Good night.

ছোটসাহেব ঘর থেকে বারান্দায় চলে যেতে শিপ্‌টন্‌ সাহেব তাকে ডেকে বললেন—Look here David, there's a funny affair in this week's paper. Ram Gopal Ghosh that native orator who speaks like Burke, has spoken in the Calcutta Town Hall last week in support of Indians entering the Civil Service ! What the devil the government is up to I do not know, David. Why do they allow these things to go on, beyond me. Things are not looking quite as they ought to Here s another—you know Harish Mookherjee, the downy old bird, of the Hindu Patriot ?

—Yes, I think so,

—He led a deputation the other day to our old Guv'nor against us, planters. You see ?

—Deputation ! I would have scattered their deputation with the toe of my boot.

—But the old man talked to them like a benevolent blooming father. That is why I say David, things are coming to a head. Tell your precious old Dewan to carb his poop. Shall I order a tot of rum ?

—No, thank you, Mr. Shipton. Really I've got to go now.

দেওয়ান রাজারাম অনেক রাত্রে কুঠি থেকে বাড়ি এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে হাঁক দিলেন—ওরে !

গুরুদাস মুচি সহিস এসে লাগাম ধরলে ঘোড়ার। ঘরে ঢোকবার আগে স্ত্রীর উদ্দেশে ডেকে বললেন—গঙ্গাজল দাও, ওগো ! ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন জগদম্বা পূজোর ঘরের দাওয়ায় বসে কি পূজো করচেন যেন। রাজারামের মনে পড়লো আজ শনিবার, স্ত্রী শনির পূজোতে ব্যস্ত আছেন। রাজারাম হাতমুখ ধুয়ে আসতেই জগদম্বা সেখান থেকে ডেকে বললেন—পুঁথি কে পড়বে ?

—আমি যাচ্চি দাঁড়াও। কাপড় ছেড়ে আসচি।

দেওয়ান রাজারাম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গরদের কাপড় পরে কুশাসনে বসে তিনি ভক্তি সহকারে শনির পাঁচালি পাঠ করলেন। শনি পূজোর উদ্দেশ্য শনির কুদৃষ্টি থেকে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ রক্ষা পাবেন, ঐশ্বর্য বাড়বে, পদবৃদ্ধি হবে। শনি পুঁথি শেষ করে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করলেন, যেমন তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন। সাহেবদের সংসর্গে থাকেন বলে এটা তাঁর আরও বিশেষ করে দরকার হয়ে থাকে—গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকেন না পর্যন্ত।

জগদম্বা তাঁর সামনে একটু শনিপূজোর সিন্নি আর একবাটি মুড়কি এনে দিলেন। খেয়ে এক ঘটি জল ও একটি পান খেয়ে তিনি বললেন—আজ কুঠিতে কি ব্যাপার হয়েচে জানো ?

জগদম্বা বললেন—বেলের শরবত খাবা ?

—আঃ, আগে শোনো কি বলচি। বেলের শরবত এখন রাখো।

—কি গা ? কি হয়েচে ?

—বড়সায়েব ছোটসায়েবকে খুব বকেচে।

—কেন ?

—রামকানাই কবিরাজকে আমরা একটু কচা-পড়া পড়িয়েছিলাম। ওর দুষ্টুমি ভাঙতি আর আমারে শেখাতি হবে না। নীলকুঠির মুখ ছোট করে দিয়েচে ওই ব্যাটা সেই রামুসর্দারের খুনের মামলায়। জেলার ম্যাজিস্টার ডক্কিন্‌সন্‌ সাহেব যাই বড়সায়েবকে খুব মানে, তাই এযাত্রা আমার রক্ষে। নইলে আমার জেল হয়ে যেতো। ও বাঞ্চৎকে এমন কচা-পড়া দিইছিলাম যে আর ওঁকে এ দেশে অন্ন করি খেতি হেতো না। তা নাকি বড়সায়েব বলেচে, অমন কোরো না। নীলকুঠির জোরজুলুমের কথা সরকার বাহাদুরের কানে উঠেচে। কলকাতায় কে আছে হরিশ মুখুয্যে, ওরা বড্ড লেখালেখি করচে খবরের কাগজে। খুব গোলমালের সৃষ্টি হয়েচে। এখন অমন করলি নীলকর সাহেবদের ক্ষেতি হবে। আমারে ডেকি ছোটসায়েব বললে—গয়া মেম এই সব কানে তুলেচে বড়সায়েবের। বিটি আসল শয়তান।

—কেন, গয়া মেম তোমাকে তো খুব মানে ?

—বাদ দ্যাও। যার চরিত্তির নেই,তার কিছুই নেই। ওর আবার মানামানি। কিছু যে বলবার যো নেই, নইলে রাজারাম রায়কে আর শেখাতি হবে না কাকে কি করে জব্দ করতি হয়।

—তোমাকে কি ছোটসায়েব বকেচে নাকি ?

—আমারে কি বকবে ? আমি না হলি নীলির চাষ বন্ধ ! কুঠিতি হাওয়া খেলবে—ভোঁ ভোঁ। আমি আর প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন না থাকলি এক কাঠা জমিতেও নীলির দাগ মারতি হবে না কারো! নবু গাজিকে কে সোজা করেছিল? রাহাতুনপুরির প্রজাদের কে জব্দ করেছিল ? ছোটসায়েব বড়সায়েব কোনো সায়েবেরই কর্ম নয় তা বলে দেলাম তোমারে। আজ যদি এই রাজারাম রায়

চোখ বোজে—তবে কালই—

জগদম্বা অপ্রসন্ন সুরে বললেন—ও আবার কি কথা? শনিবারের সন্ধ্যেবেলা? দুর্গা দুর্গা—রাম রাম! অমন কথা বলবার নয়।

—তিলুরা এসেছিল কেউ?

—নিলু খোকাকে নিয়ে এসেছিল। খোকা আমাকে গাল টিপে টিপে কত আদর করলে। আহা, ওই চাঁদটুকু হয়েচে, বেঁচে থাক। ওদের সবারি সাধ-আহ্লাদের সামগ্রী। একটু ছানা খেতি দেলাম। বেশ খেলে টুক্‌টুক্‌ করে।

—ছানা খেতি দিও না, পেট কামড়াবে।

কথা শেষ হবার আগেই তিলু খোকাকে নিয়ে এসে হাজির। খোকা বেশ বড় হয়ে উঠেচে। ওর বাবার বুদ্ধি পেয়েচে। রাজারামকে দু'হাত নেড়ে বললে—বড়দা—

রাজারাম খোকাকে কোলে নিয়ে বললেন—বড়দা কি মণি, মামা হই যে?

খোকা আবার বললে—বড়দা।—

তার মা বললে—ঐ যে তোমাকে আমি বড়দা বলি কিনা? ও শুনে শুনে ঠিক করেচে এই লোকটাকে বড়দা বলে।

খোকা বললে—বড়দা।

রাজারাম খোকার মুখে চুমু খেয়ে বললেন—তোমার মা'রও বড়দা হলাম, আবার তোমারও বড়দা বাবা? ভবানী কি করচে?

তিলু বললে—উনি আর চন্দর মামা বসে গল্প করচেন, আমি কাঁটাল ভেঙ্গে দিয়ে এলাম খাবার জন্যি। নিতে এসেছিলাম একটা ঝুনো নারকোল। ওঁরা মুড়ি খেতি চাইলেন ঝুনো নারকোল দিয়ে—

—নিয়ে যা তোর বৌদিদির কাছ থেকি। একটা ছাড়া দুটো নিয়ে যা—

এই সময়ে জগদম্বা জানালার কাছে গিয়ে বললেন—ওগো, তোমারে কে বাইরে ডাকচে—

—কেডা?

—তা কি জানি। গোপাল মাইন্দার বলচে।

রাজারাম খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন বাইরে যে এসেছিল তাকে দেখে। সে হোল বড়সায়েবের আরদালি শ্রীরাম মুচি। এমন কি গুরুতর দরকার পড়েচে যে এত রাত্রে সায়েব আরদালি পাঠিয়েচে!

—কি রে রেমো?

—কর্তামশায়, দু'সায়েব এক জায়গায় বসে আছে বড় বাংলায়। মদ খাচ্চে। কি একটা জরুরী খবর আছে। আমারে বললে—ঘোড়ায় চড়ে আসতি বলিস্। এখুনি যেন আসে।

—কেন জানিস?

—তা মুই বলতি পারবো না কর্তামশায়। কোনো গোলমেলে ব্যাপার হবে। নইলি এত রাত্তিরি ডাকবে কেন? মোর সঙ্গে চলুন। মুই সড়কি এনিচি সঙ্গে করে। মোদের শত্তুর চারিদিকি। রাতবেরাত একা আঁধারে বেরোবেন না।

রাজারাম হাসলেন। শ্রীরাম মুচি তাকে আজ কর্তব্য শেখাচ্চে। ঘোড়ায় চড়ে তিনি একটা হাঁক মারলে দু'খানা গাঁয়ের লোক থরহরি কাঁপে। তাঁকে কে না জানে এই দশ-বিশখানা মৌজার মধ্যে। আধঘণ্টার মধ্যে রাজারাম এসে সেলাম ঠুকে সাহেবদের সামনে দাঁড়ালেন। সাহেবদের সামনে ছোট টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস। বড়সায়েব রূপোর আলবোলাতে তামাক টানচে—তামাকের মিঠেকড়া মৃদু সুবাস ঘরময়। ছোটসাহেব তামাক খায় না, তবে পান দোক্তা খায় মাঝে মাঝে, তাও বড়সাহেব বা তার মেমকে লুকিয়ে। বড়সাহেব ছোটসাহেবের দিকে তাকিয়ে কি বললে ইংরেজিতে। ছোটসাহেব রাজারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—দেওয়ান ভারি বিপদের মধ্যি পড়ে গেলাম যে! (সেটা রাজারাম অনেক পূর্বেই অনুমান করেচেন)।

—কি সায়েব?

—কলকাতা থেকে এখন খবর এল, নীল চাষের জন্যি লোক নারাজ হচ্চে। গবর্ণমেণ্ট তাদের সাহায্য করচে। কলকাতায় বড় বড় লোকে খবরের কাগজে হৈ-চৈ বাধিয়েচে। এখন কি করা যায় বলো। গুলকো, গুভরত্নপুর, উলুসি,

সাতবেড়ে, ন'হাটা এই গাঁয়ে কত জমি নীলির দাগ মারা বলতি পারবা ?

রাজারাম মনে মনে হিসাব করে বললেন—আন্দাজ সাতশো সাড়ে সাতশো বিঘে।

এই সময় বড়সাহেব বললে—কট জমিটে ডাগ আছে ?

রাজারাম সসম্ভ্রমে বললেন—ওই যে বললাম সায়েব (হুজুর বলার প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না)—সাতশো বিঘে হবে।

এই সময় বিবি শিপ্‌টন্‌ বড় বাংলার সামনে এসে নামলেন টম্‌টম্‌ থেকে। ভজা মুচি সহিস পেছন থেকে এসে মেমসাহেবের হাত থেকে লাগাম নিলে এবং তাঁকে টম্‌টম্‌ থেকে নামতে সাহায্য করলে। ঘোর অন্ধকার রাত—মেমসাহেব এত রাতে কোথায় গিয়েছিল ? রাজারাম ভাবলেন কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেলেন না।

মেমসাহেব ওদের দিকে চেয়ে হেসে কি ইংরেজিতে বললে। ও হরি ! ওটা কি ? ভজা মুচি একটা মরা খরগোশ নামাচ্ছে টম্‌টমের পাদানি থেকে। মেমসাহেবের হাতের ভঙ্গিতে সেটা ভজা সসম্ভ্রমে এনে সাহেবদের সামনে নামালে। মেমসাহেবের হাতে বন্দুক। অন্ধকার মাঠে নদীর ধারে খরগোশ শিকার করতে গিয়েছিল মেমসাহেব তাহোলে।

মেমসাহেব ওপরে উঠতেই এই দুই সাহেব উঠে দাঁড়ালো। (যত্তো সব !) ওদের মধ্যে খানিকক্ষণ কি বলাবলি ও হাসাহাসি হোলো। মেমসাহেব রাজারামের দিকে তাকিয়ে বললে—কেমন হইল শিকার ?

বিনয়ে বিগলিত রাজারাম বললেন—আজ্ঞে, চমৎকার।

—ভালো হইয়াছে ?

—খুব ভালো। কোথায় মারলেন মেমসায়েব ?

—বাঁওড়ের ধারে—এই ডিকে—খড় আছে।

—খড় ?

ভজা মুচি মেমসাহেবের কথার টীকা রচনা করে বলে—সবাইপুরির বিশ্বেসদের খড়ের মাঠে।

—ওঃ, অনেকদূর গিয়েছিলেন এই রাত্তিরি।

—আমার কাছে বন্দুক আছে। ভয় কি আছে? ভূটে খাইবে না।

—আজ্ঞে না, ভূত কোথা থেকি আসবে?

—নো, নো, ভজা বলিটেছিল মাটে ভূট আছে। আলো জ্বলে। যায় আসে, যায় আসে—কি নাম আছে ভজা। আলো ভূট?

ভজা উত্তর দেবার আগে রাজারাম বললেন—আজ্ঞে আমি জানি। এলে ভূত। আমি নিজে কতবার মাঠের মধ্যি এলে ভূতির সামনে পড়িচি। ওরা মানুষেরে কিছু বলে না।

বড়সাহেব এই সময় হেসে বললেন—টোমার মাথা আছে। ভূট আছে! উহা গ্যাস আছে। গ্যাস জ্বলিয়া উঠিল টো টুমি ভূট দেখিল।...(এর পরের কথাটা হোলো মেমসাহেবের দিকে চেয়ে ইংরিজিতে। রাজারাম বুঝলেন না।) ...খরগোশ কেমন?

—আজ্ঞে খুব ভালো।

—টুমি খাও?

—না সাহেব, খাইনে। অনেকে খায় আমাদের মধ্যি, আমি খাইনে।

এই সময় প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন ও গিরিশ সরকার মুহুরী অনেক খাতাপত্র বয়ে নিয়ে এসে হাজির হোলো। রাজারাম ঘুঘু লোক। তিনি বুঝলেন আজ সারারাত কুঠির দপ্তরখানায় বসে কাজ করতে হবে। আমীন দাগ-মার্কার খতিয়ান এনে হাজির করচে কেন? দাগের হিসেব এত রাত্রে কি দরকার?

ছোটসাহেব কি একটা বললে ইংরিজিতে। বড়সাহেব তার একটা লম্বা জবাব দিলে হাত-পা নেড়ে—খাতার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। ছোটসাহেব ঘাড় নাড়লে।

তারপর কাজ আরম্ভ হোলো সারারাত-ব্যাপী। ছোটসাহেব, প্রসন্ন আমীন, তিনি, গিরিশ মুহুরী ও গদাধর চক্রবর্তী মুহুরীতে মিলে। কাজ আর কিছুই নয়, মার্কা-খতিয়ান বদলানো, যত বেশি জমিতে নীলের দাগ দেওয়া হয়েচে বিভিন্ন গ্রামে, তার চেয়ে অনেক কম দেখানো। জরীপের আসল

খতিয়ান দৃষ্টে নকল খতিয়ান তৈরী করার নির্দেশ দিলে ডেভিড্ সাহেব।

রাজারাম বললেন—সায়েব একটা দরকারী জিনিসের কি হবে?

ডেভিড—কি জিনিস?"

—প্রজাদের বুড়ো আঙুলের ছাপ? তার। কি হবে? দাগ খতিয়ানে আমাদের সুবিধের জন্যে আঙুলের ছাপ নিতি হয়েছিল। এখন তারা নকল খাতায় দেবে কেন? যে সব বদমাইশ প্রজা। নবু গাজির মামলায় রাহাতুনপুর শুদ্ধ আমাদের বিপক্ষে। রামু সর্দারের খুনের মামলায় বাঁধালের প্রজা সব চটা। কি করতি হবে বলুন।

—বুড়ো আঙুলের ছাপ জাল করতি হবে।

—সে বড় গোলমেলে ব্যাপার হবে সায়েব। ভেবে কাজ করা ভালো।

—তুমি ভয় পেলি চলবে কেন দেওয়ান? ডিক্সিন্‌সনের কথা মনে নেই? এক খানা আর দু'পেগ হুইস্কি।

—এক খানা নয় সায়েব, অনেক খানা। আপনি ভেবে দেখুন কাশি-তলার মাঠের সে ব্যাপার আপনার মনে আছে তো? আমরাই পিরিধারী জেলেকে ফাঁসি দিয়েছিলাম। তখনকার দিনে আর এখনকার দিনে তফাৎ অনেক। শ্রীরাম বেয়ারাকে এখন সড়কি নিয়ে রাত্রে পথ চলতি হয় সায়েব। আজই শোনলাম ওর মুখি।

ভোর পর্যন্ত কুঠির দপ্তরখানায় মোমবাতি জ্বেলে কাজ চলল। সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত [illegible] ডেভিড্ নিজেও বিশ্রাম নেয়নি বা কাজে ফাঁকি দেয়নি। সূর্য ওঠবার আগেই বড়সাহেব এসে হাজির হোলো। দুই সাহেবে কি কথাবার্তা হোলো. বড়সাহেব রাজারামকে বললেন—মার্কা খতিয়ান বদল হইল?

—আজ্ঞে হাঁ।

—সব ঠিক আছে?

—এখনো তিন দিনির কাজ বাকি সায়েব। টিপ-সইয়ের কি করা যাবে সায়েব? অত টিপ-সই কোথায় পাওয়া যাবে দাগ খতিয়ানে আপনিই বলুন!

—করিটে হইবে।

—কি ক'রে করা যাবে আমার বুদ্ধিতে কুলুচ্চে না। শেষ কালডা কি জেল খেটি মরবো? টিপসই জাল করবো কি করে?

—সব জাল হইল টো উহা জাল হইবে না কেন? মাথা খাটাইতে হইবে। পয়সা খরচ করিলে সব হইয়া যাইবে। মন দিয়া কাজ করো। টোমার ও প্রসন্ন আমীনের দু'টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িল এ মাস হইটে।

মাথা নিচু করে দুই হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন রাজারাম—আপনার খেয়েই তো মানুষ, সায়েব। রাখতিও আপনি মারতিও আপনি।

কি একটা ইংরিজি কথা বলে বড়সাহেব চলে গেল ঘর থেকে বেরিয়ে।

দুপুর বেলা।

প্রসন্ন আমীন আজ অনেকখানি এগিয়ে এনেচে। গিরিশ মুহুরী গদাধর মুহুরীকে নিচু সুরে বললে—খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা, ও গদাধর?

গদাধর চোখের চশমার দড়ি খুলে ফেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—রাজারাম ঠাকুরকে বলো না।

—আমি পারবো না। আমার লজ্জা করে।

—লজ্জার কি আছে? পেট জ্বলচে না?

—তা তো জ্বলচে।

—তবে বলো। আমি পারবো না।

এমন সময় নরহরি পেশকার বারান্দার বাহির থেকে সকলকে ডেকে বললে—দেওয়ানজি। আমীনবাবু। সব চান হয়েচে? ভাত তৈরী। আপনারা নেয়ে আসুন।

দেওয়ান রাজারাম বললেন—আমার এখনো অনেক দেরি। তোমরা খেয়ে নেও গিয়ে।

শেষ পর্যন্ত সকলেই একসাথে খেতে বসলেন—দেওয়ানজি ছাড়া। তিনি নীলকুঠিতে অন্নগ্রহণ করেন না। স্নানাহ্নিক না করেও খান না। এখানে সে

সবের সুবিধে নেই তত।

নরহরি পেশকার ভালো ব্রাহ্মণ, সে-ই রান্না করেচে, যোগাড় দিয়েচে গোলাপ পাঁড়ে। তা ভালোই রেঁধেচে। না, সাহেবদের নজর উঁচু, খাটিয়ে নিয়ে খাওয়াতে জানে। মস্ত বড় রুই মাছের ঝোল, পাঁচ-ছখানা করে দাগাব মাছ ভাজা, আমের অম্বল, মুড়ি-ঘণ্ট ও দই।

গদাধর মুহুরী পেটুক ব্যক্তি, শেষকালে বলে ফেললে—ও পেশকারমশায়, বলি সব করলেন, একটু মিষ্টির ব্যবস্থা করলেন না?

সে সময় রসগোল্লার রেওয়াজ ছিল না। এ সময়ে, মিষ্টি বলতে বুঝতো চিনির মঠ, বাতাসা বা মণ্ডা। নরহরি পেশকার বললে—কথাটা মনে ছিল না। নইলি ছোটসায়েব দিতি নারাজ ছিল না।

গদাধর মুহুরী ভাতের দলা কোঁৎ করে গিলে বললে—না, সায়েবরা খাওয়াতে জানে, কি বলো প্রসন্নদাদা?

প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন ক'দিন থেকে আজ অন্যমনস্ক। তার মন কোনো সময়েই ভালো থাকে না। কি একটা কথা সে সব সময়েই ভাবচে···ভাবচে। গদাধরের কথার উত্তর দেবার মত মনের সুখ নেই। এই যে কাজের চাপ, এই যে বড় মাছ দিয়ে ভাতের ভোজ—অন্য সময় হোলে, অন্য দিন হোলে তার খুব ভালো লাগতো—কিন্তু আজ আর সে মন নেই। কিছুই ভালো লাগে না, খেতে হয় তাই খেয়ে যাচ্চে, কাজ করতে হয় তাই কাজ করে যাচ্চে, কলের পুতুলের মত। আর সব সময়ে সেই এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান।

সে কি ব্যাপার? কি ধ্যান, কি জ্ঞান?

প্রসন্ন আমীন গয়া মেমের প্রেমে পড়েচে।

সে যে কি টান, তা বলার কথা নয়। কাকে কি বলবে? গয়া মেম বড্ড উঁচু ডালের পাখি। হাত বাড়াবার সাধ্য কি প্রসন্ন চক্কত্তির মত সামান্য লোকের? গয়া মেম সুদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েচে এই একটা মস্ত সান্ত্বনা। সুদৃষ্টিতে চাওয়া মানে গয়া মেম জানতে পেরেচে প্রসন্ন আমীন তাকে ভালোবাসে আর এই ভালোবাসার ব্যাপারে গয়া অসন্তুষ্ট নয় বরং প্রশ্রয় দিচ্চে মাঝে মাঝে।

এই যে বসে খাচ্চে প্রসন্ন চক্কত্তি—সে মানসনেত্রে কার সুঠাম তনুভঙ্গী, কার আয়ত চক্ষুর বিলোল দৃষ্টি, কার সুন্দর মুখখানি ওর চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠচে? ভাতের দলা গলার মধ্যে ঢুকচে না চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার জন্যে। সে কার কথা মনে হয়ে?···ছোটসাহেবের মদগর্বিত পদধ্বনিও সে তুচ্ছ করেচে কার জন্যে? প্রসন্ন আমীন এতদিন পরে সুখের মুখ দেখতে পেয়েচে। মেয়েমানুষ কখনো তার দিকে সুনজরে চেয়ে দেখেনি। কত বড় অভাব ছিল তার জীবনে। প্রথমবার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, গোঙা, গেঙিয়ে গেঙিয়ে কথা বলতো, নাম যদিও ছিল সরস্বতী। গোঙা হোক, সরস্বতী কিন্তু বড় যত্ন করতো স্বামীকে। তখন সবে বয়েস উনিশ-কুড়ি। প্রসন্নর বাবা রতন চক্কত্তি ছেলেকে বড় কড়া শাসনে রাখতেন। বাবা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন, বলবার জো ছিল না ছেলের। সাধ্য কি?

সরস্বতী রাত্রে পান্তাভাত খেতে দিয়ে লেবু কেটে দিত, তেঁতুলগোলা, লঙ্কা আর তেল দিত মেখে খাবার জন্যে। চড়কের দিন একখানা কাপড় পেয়ে গোঙা স্ত্রীর মুখে কি সরল আনন্দ ফুটে উঠতো। বলতো, আমার বাপের বাড়ি চলো, উচ্ছে দিয়ে কাঁটালবীচি চচ্চড়ি খাওয়াবো। আমাদের গাছে কত কাঁটাল! এত বড় বড় এক একটা! এত বড় বড় কোয়া!

হাত ফাঁক করে দেখাতে।

আবার রসকলির গান গাইতো আপন মনে গোঙানো সুরে। হাসি পায়নি কিন্তু সে গান শুনে কোনো দিন। মনে বরং কষ্ট হোতো। না, দেখতে শুনতে ভালো না বরং কালো, দাঁত উঁচু। তবুও পুষলে বেড়াল-কুকুরের ওপরেও তো মমতা হয়।

সরস্বতী পটল তুললো প্রথমবার ছেলেপিলে হতে গিয়ে। আবার বিয়ে হোলো রাজনগরের সনাতন চৌধুরীর ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে। অন্নপূর্ণা দেখতে শুনতে ভালো এবং গৌরবর্ণের মেয়ে বলেই বোধ হয় একটু বেশ গুমুরে। সে এখনো বেঁচে আছে তার বাপের বাড়িতে। ছেলে মেয়ে হয়নি। কোনোদিন মনে-প্রাণে স্বামীর ঘর করেনি। না করার কারণ বোধ হয় ওর বাপের বাড়ির

সচ্ছলতা। অমন কেলে ধানের সরু চিড়ে আর শুকো দই কারও ঘরে হবে না। সাতটা গোলা বাপের বাড়ির উঠোনে।

অন্নপূর্ণা বড় দাগা দিয়ে গিয়েছিল জীবনে। পয়সার জন্য এতো? ধানের মরাইয়ের অহঙ্কার এতো? ৺সনাতন চৌধুরীরই বা ক'টা ধানের গোলা। যদি পুরুষমানুষ হয় প্রসন্ন চক্কত্তি, যদি সে রতন চক্কত্তির ছেলে হয়—তবে ধানের মরাই কাকে বলে সে দেখিয়ে দেবে—ওই অন্নপূর্ণাকে দেখাবে একদিন।

একদিন অন্নপূর্ণা তাকে বললে, বেশ মনে আছে প্রসন্ন চক্কত্তির, চৈত্র মাস, গুমোট গরমের দিন, ঘেঁটুফুল ফুটেচে বাড়ির সামনের বাঁশনি বাঁশের ঝাড়ের তলায়, বললে—আমার নারকোল ফুল ভেঙে বাউটি গড়িয়ে দেবা?

প্রসন্ন চক্কত্তির তখন অবস্থা ভালো নয়, বাবা মারা গিয়েচেন, ও সামান্য টাকা রোজগার করে গাঁড়াপোতার হরিপ্রসন্ন মুখুয্যের জমিদারী কাছারীতে। ও বললে—কেন, বেশ তো নারকোল ফুল, পর না, হাতে বেশ মানায়।

—ছাই! ও গাঁথা যায় না। বিয়ের জিনিস, ফঙ্গবেনে জিনিস! আমায় বাউটি গড়িয়ে দ্যাও।

—দেবো আর দুটো বছর যাক।

—দু'বছর পরে আমি মরে যাবো।

—অমন কথা বলতে নেই, ছিঃ—

—এক কড়ার মুরোদ নেই, তাই বলো। এমন লোকের হাতে বাবা আমায় দিয়ে দিল তুলে! দোজবরে বিয়ে আবার বিয়ে? তাও যদি পুষতো তাও তো বুঝ দিতে পারি মনকে। অদৃষ্টের মাথায় মারি ঝাঁটা সাত ঘা।...

এই বলে কাঁদতে বসলো পা ছড়িয়ে সেই সতেরো বছরের ধাড়ী মেয়ে। এতে মনে ব্যথা লাগে কি না লাগে? তার পরের বছর আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি চলে গেল, আর আসেনি। সে আজ সাত-আট বছরের কথা।

এর পরে ও রাজনগরে গিয়েচে দু'তিনবার বৌকে ফিরিয়ে আনতে। অন্নপূর্ণার মা গুচ্ছির কথা শুনিয়ে দিয়েচে জামাইকে। মেয়ে পাঠায়নি। বলেচে—মুরোদ থাকে তো আবার বিয়ে কর গিয়ে। তোমাদের বাড়ি ধানসেদ্ধ করবার জন্যি

আর চাল কুটবার জন্যি আমার মেয়ে যাবে না। খাগতা কোনোদিন হয়, পালকি নিয়ে এসে মেয়েকে নিয়ে যেও।

আর সেখানে যায় না প্রসন্ন চক্কত্তি।

বিলের ধারে সেদিন বসেছিল প্রসন্ন আমীন।

গয়া মেম আর তার মা বরদা বাগ দিনী আসে এই সময়। শুধু একটি বার দেখা। আর কিছু চায় না প্রসন্ন চক্কত্তি।

আজ দূরে গয়া মেমকে আসতে দেখে ওর মন আনন্দে নেচে উঠলো। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

গয়া একা আসচে। সঙ্গে ওর মা বরদা নেই।

কাছে এসে গয়া প্রসন্নকে দেখে বললে—খুড়োমশায়। একা বসে আছেন!

—হ্যাঁ।

—এখানে একা বসে?

—তুমি যাবে তাই।

—তাতে আপনার কি?

—কিছু না। এই গিয়ে—তোমার মা কোথায়?

—মা ধান ভানচে। পরের ধান সেদ্দ শুকনো করে রেখেচে, যে বর্ষা নেমেচে, চাল দিতি হবে না পরকে? যার চাল সে শোনবে? বসুন, চললাম।

—ও গয়া—

—কি?

—একটু দাঁড়াবা না?

—দাঁড়িয়ে কি করবো? বিষ্টি এলি ভিজে মরবো যে!

প্রসন্ন চক্কত্তি মুগ্ধ দৃষ্টিতে গয়ার দিকে চেয়ে ছিল।

গয়া বললে—ভাখচেন কি?

প্রসন্ন লজ্জিত সুরে বললে—কিছু না। দেখবো আবার কি? তুমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলি আবার কি দেখবো?

—কেন, আমি থাকলি কি হয় ?

—ভাবচি, এমন বেশ দিনটা —

গয়া রাগের স্বরে বললে—ওসব আবোল-তাবোল এখন শোনবার আমার সময় নেই। চললাম।

—একটু দাঁড়াও না গয়া ? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে দাঁড়ালি ?

—না, আমি সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতি পারবো না এখানে। ঐ দেখুন, দেয়া কেমন ঘনিয়ে আসচে।

ঘাট বাঁওড়ের বিলের ওপারে ঘন সবুজ আউশ ধানের আর নীলের চারার ক্ষেতের ওপরে ঘন, কালো শ্রাবণের মেঘ জমা হয়েচে। সাদা বকের দল উড়চে দূর চক্রবালের কোলে, মেঘপদবীর নিচে নিচে, হু হু ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক বয়ে এল শ্যামল প্রান্তরের দিক থেকে, সোঁ সোঁ শব্দ উঠলো দূরে, বিলের অপর প্রান্ত যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেচে বৃষ্টির ধারায়। রথচক্রের নাভির মত দেখাচ্চে স্বচ্ছজল বিল বৃষ্টিমুখর তীরবেষ্টনীর মাঝখানে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—গয়া ভিজবে যে, বৃষ্টি তো এল। চলো, আমার বাসায়।

—না, আমি কুঠিতি চললাম—

—ও গয়া, শোনো আমার কথা। ভিজবা।

—ভিজি ভিজবো।

—আচ্ছা গয়া আমি ভালোর জন্যি বলচি নে ? কেউ নেই আমার বাসায়। চলো।

—না, আমি যাবো না। আপনাকে না খুড়োমশায় বলে ডাকি ?

—ডাকো তাই কি হয়েচে ? অন্যায় কথাডা কি বললাম তোমারে ? বিষ্টিতে ভিজবা, তাই বলচি আমার ঘরটা নিকটে আছে—সেখানে আশ্রয় নেবা। খারাপ কথা এডা ?

—না, বাজে কথা শোনবার সময় নেই। আপনি ছুট দিন, ওই দেখুন তাকিয়ে বিলির ওপারে—

—আমার ওপর রাগ করলে না তো, ও গয়া, শোনো ও গয়া, মাথা খাও, ও গয়া—

গয়া ছুটতে ছুটতে হেঁকে বললে—না, না। কি পাগল! এমন মানুষও থাকে?

মিনতির স্বরে প্রসন্ন চক্কত্তি হেঁকে বললে—কাউকে বলে দিও না যেন, ও গয়া! মাইরি!···

দূর থেকে গয়া মেমের স্বর ভেসে এল—ভেজবেন না—বাড়ি যান খুড়োমশাই—ভেজবেন না—বাড়ি যান—

বিলের শামুক আবার কতটুকু সুধা আশা করে চাঁদের কাছে?

ওই যথেষ্ট না?

রামকানাই কবিরাজ আশ্চর্য না হয়ে পারেন নি যে আজকাল নীলকুঠির লোকেরা তাঁকে কিছু বলে না।

আজ আবার গয়া মেম এসে তাঁকে দুধ দিয়ে গিয়েচে, এটা ওটা সেটা প্রায়ই নিয়ে আসে। রামকানাই দাম দিতে পারবেন না বলে আগে আগে নিতেন না, এখন গয়া মেয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে দেওয়ার পথটা সহজ ও সুগম করেচে। আবার লোকজন ডাকে কবিরাজকে। ঝিঙে, নাউ, দু'আনিটা সিকিটা (কচিৎ)—এই হোল দর্শনী ও পারিশ্রমিক।

নালু পালের স্ত্রী তুলসীর ছেলেপিলে হবে, পেটের মধ্যে বেদনা, কি কি অসুখ। হরিশ ডাক্তার দিনকতক দেখেছিল, রোগ সারেনি। লোকে বললে—তোমার পয়সা আছে নালু, ভালো কবিরাজ দেখাও—

রামকানাই কবিরাজ ভালোর দলে পড়েন না, কেননা তিনি গরীব। অর্থেরই লোকে মান দেয়, সততা বা উৎকর্ষের নয়। রামকানাই যদি আজ হরিশ ডাক্তারের মত পালকিতে চেপে রুগী দেখতে বেরুতো, তবে হরিশ ডাক্তারের মত আট আনা ভিজিট তিনি অনায়াসেই নিতে পারতেন।

নালু পাল কি মনে ভেবে রামকানাই কবিরাজকে ডাক দিলে। রামকানাই

রোগী দেখে বললে, ওষুধ দেবো কিন্তু অনুপান যোগাড় করতি হবে, কলমীশাকের রস, সৈন্ধব লবণ দিয়ে সিদ্ধ। ভাঁড়ে করে সে রস রেখে দিতে হবে সাতদিন।

নালু পাল আর সেই নালু পাল নেই, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে ব্যবসা করে। আটচালা ঘর বেঁধেচে গত বৎসর। আটচালা ঘর তৈরী করা এ সব পাড়াগাঁয়ে বড়মানুষির লক্ষণ, আর চরম বড়মানুষি অবিশ্যি দুর্গোৎসব করা! তাও গত বৎসর নালু পাল করেচে। অনেক লোকজনও থাইয়েচে। নাম বেরিয়ে গিয়েচে বড়মানুষ বলে। ওর ঘরের মধ্যে নতুন কড়ি-বাঁধানো আলমারী, নক্সা-করা হাঁড়ির তাক রঙিন দড়ির শিকেতে ঝুলোনো, খেরোমোড়া শীতলপাটি, কাঁসার পানের ডাবর, ঝকঝকে করে মাজা পিতলের দীপগাছা—সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির সমস্ত উপকরণ আসবাব বর্তমান। রামকানাইয়ের প্রশংসমান দৃষ্টি রোগিণীর ঘরের সাজসজ্জার ওপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ আছে দেখে নালু পাল বললে—এইবার ঘূর্ণীর কুমোরদের তৈরী মাটির ফল কিছু আনবো ঠিক করিচি। ওই কড়ির আলনাটা ছাখচেন, আড়াই টাকা দিয়ে কিনেচি বিনোদপুরের এক ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে। তাঁর নিজের হাতে গাঁথা।

—বেশ, চমৎকার দ্রব্যটি।

—অসুখ সারবে তো, কবিরাজমশাই?

—না সারলি মাধবনিদান শাস্তরডা মিথ্যে। তবে কি জানো, অনুপান আর সহপান ঠিকমত চাই। ওষুধ রোগ সারাবে না, সারাবে ঠিকমত অনুপান আর সহপান। কলমীশাকের রস খেতি হবে—সেটি হোলো অনুপান। বোঝলে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জলযোগ ব্যবস্থা হলো শসাকাটা, ফুলবাতাসা, নারকোল কোরা ও নারকোল নাড়ু। আচমনী জিনিস অর্থাৎ কোনো কিছু শস্যভাজা খাবেন না রামকানাই শূদ্রের গৃহে। এককাঠা চাল, মটরডালের বড়ি ও একটা আধুলি দর্শনী মিললো।

পথে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—কবিরাজমশাই—নমস্কার হই।

—ভালো আছেন জামাইবাবু?

—আপনার আশীর্বাদে। একটু আমার বাড়িতে আসতি হবে। ছেলেটার

জ্বর আর কাসি হয়েচে দু'তিন দিন, একটু দেখে যান।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

খোকা ওর মামীমার বুহুনি নক্সা-কাঁটা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। রামকানাই হাত দেখে বললেন—নবজ্বর। নাড়িতে রস রয়েচে। বড়ি দেবো, মধু আর শিউলিপাতার রস দিয়ে খাওয়াতি হবে।

ওর মা তিলু এবং ওর দুই ছোট মা উৎসুক ও শঙ্কিত মনে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ওরা এ গ্রামের বধূ নয়, কন্যা। সুতরাং গ্রাম্য প্রথানুযায়ী ওরা যার তার সামনে বেরুতে পারে, যেখানে সেখানে যেতে পারে। কিন্তু যদি এ গ্রামের বধূ হতো, অন্য জায়গার মেয়ে—তাহলে অপরিচিত পরপুরুষ তো দূরের কথা, স্বামীর সঙ্গে পর্যন্ত যথন তথন দিনমানে সাক্ষাৎ করা বা বাক্যালাপ করা দাঁড়াতো বেহায়ার লক্ষণ।

তিলু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে—খোকার জ্বর কেমন দেখলেন, কবিরাজ মশাই।

—কিছু না মা, নবজ্বর। এই বর্ষাকালে চারিদিকি হচ্চে। ভয় কি?

—সারবে তো?

—সারবে না তো আমরা রইচি কেন?

নিলু বললে—আপনার পায়ে পড়ি কবিরাজমশাই। একটু ভালো করে দেখুন খোকারে।

—মা, আমি বলচি তিন দিন বড়ি খেলি খোকা সেরে ওঠবে। আপনারা ভয় পাবেন না।

—ওর গলার মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয় কেন?

—কফ কুপিত হয়েচে, রসস্থ নাড়ী। ও রকম হয়ে থাকে। কিছু ভেবো না। আমার সামনে এই বড়িটা মেড়ে খাইয়ে দাও মা। খল আছে?

—খল আনচি সিধু কাকাদের বাড়ি থেকে।

তিলু বললে—কবিরাজমশাই, বেলা হয়েচে, এখানে দুটি খেয়ে তবে যাবেন। দুপুরবেলা বাড়িতি লোক এলি না খাইয়ে যেতি দিতি আছে?

আপনাকে দুটো ভাত গালে দিতিই হবে এখানে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বললেন—শাক আর ভাত। গরীবের আয়োজন।

রামকানাই বড় অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন এদের অমায়িক ব্যবহারে ও দীনতা প্রকাশের সম্পদে। কেউ কখনো তাঁকে এত আদর করেনি, এত সম্মান দেয়নি। তাতে এরা আবার দেওয়ানজির ভগ্নিপতি, ওদের বাড়ির জামাই।

তিলু দুখানা বড় পিঁড়ি পেতে দুজনকে খেতে দিলে।—এটা নিন, ওটা নিন, বলে কাছে বসে কখনো কি রামকানাই কবিরাজকে কেউ খাইয়েচে? মনে করতে পারেন না রামকানাই। মুগের ডাল, পটল ভাজা, মাছের ঝাল, আমড়ার টক আর ঘরে-পাতা দই, কাঁটাল, মর্তমান কলা। নাঃ, কার মুখ দেখে আজ যে ওঠা! অবাক হয়ে যান রামকানাই।

খাওয়ার পরে রামকানাই একটি গুরুতর প্রশ্ন করে বসলেন ভবানী বাঁড়ুয্যেকে।

—আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি জ্ঞানী, সাধু লোক। সবাই আপনার সুখ্যেত করে। আমরা এমন কিছু লেখাপড়া শিখিনি। সামান্য সংস্কৃত শিখে আয়ুর্বেদ পড়েছিলাম তেঘরা সেনহাটির ৺পতিতপাবন (হাতজোড় করে প্রণাম করলেন রামকানাই) কবিরাজের কাছে। আমরা কি বুঝি-সুজি বলুন! আচ্ছা আদি সংবাদটা কি। আপনার মুখি শুনি।

—কি বললেন? কি সংবাদ?

—আদি সংবাদ?

—আজ্ঞে—ভালো বুঝতে পারলাম না কি বলচেন।

—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি মিলি তো জগৎটা সৃষ্টি করলেন।···এখন এর ভেতরের কথাটা কি একটু খুলে বলুন না। অনেক সময় একা শুয়ে শুয়ে ঘরের মধ্যে এসব কথা ভাবি। কি করে কি হোলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিপদে পড়ে গেলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জগৎটা সৃষ্টি করেননি, ভেতরের কথা তিনি কি করে বলবেন? কথা

বলবার কি আছে। পতঞ্জলি দর্শন মনে পড়লো, সাংখ্য মনে পড়লো, বেদান্ত মনে পড়লো—কিন্তু এই গ্রাম্য কবিরাজের কাছে—না! অচল। সে সব অচল। তাঁর হাসিও পেল বিলক্ষণ। আদি সংবাদ!

হঠাৎ রামকানাই বললেন—আমার কিন্তু একটা মনে হয়—অনেকদিন বসে বসে ভেবেচি, বোঝলেন? ও ব্রহ্মা বলুন, বিষ্ণু বলুন, মহেশ্বর বলুন—সবই এক। একে তিন, তিনি এক। তা ছাড়া এ সবই তিনি। কি বলেন?

ভবানী বাঁড়ুয্যের চোখের সামনে যদি এই মুহূর্তে রামকানাই কবিরাজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়ে ওপরের দুই হাতে বরাভয় মুদ্রা রচনা করে বলতেন—বৎস, বরং বৃণু—ইহাগতোঽস্মি। তা হোলেও তিনি এতখানি বিস্মিত হতেন না। এই সামান্য গ্রাম্য কবিরাজের মুখে অতি সরল সহজ ভাষায় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের কল্যাণময়ী বাণী উচ্চারিত হোলো এই সংস্কারবদ্ধ, অশিক্ষিত, মোহান্ধ, ঈর্ষাদ্বেষসঙ্কুল, অন্ধকার পাড়াগেঁয়ে এদো খড়ের ঘরে।

ভবানী বাঁড়ুযো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি মানুষ চেনেন। অনেক দেখেচেন, অনেক বেড়িয়েচেন। মুখ তুলে বললেন—কবিরাজমশাই, ঠিক বলেচেন। আপনাকে আমি কি বোঝাবো? আপনি জ্ঞানী পুরুষ।

—হঃ, এইবার ধরেচেন ঠিক জামাইবাবু! জ্ঞানী লোক একডা খুঁজে বার করেচেন—

তিলুও খুব অবাক হয়েছিল। সেও স্বামীর কাছে অনেক কিছু পড়েচে, অনেক কিছু শিখেচে, বেদান্তের মোটা কথা জানে। এভাবে সেকথা রামকানাই কবিরাজ বলবে, তা সে ভাবেনি। সে এগিয়ে এসে বললে—আমি অনেক কথা শুনেচি আপনার ব্যাপারে। যথেষ্ট অত্যাচার আপনার ওপর বড়দা করেচেন, নীলকুঠির লোকেরা করেছে—আপনি মিথ্যে সাক্ষী দিতে চাননি বলে টাকা খেয়ে সায়েবদের পক্ষে। অনেক কষ্ট পেয়েচেন তবু কেউ আপনাকে দিয়ে মিথ্যে বলাতি পারেনি রামু সর্দারের খুনের মামলায়। আমি সব জানি। কতদিন ভাবতাম আপনাকে দেখবো। আপনি আজ আমাদের ঘরে আসবেন, আপনারে খাওয়াবো—তা ভাবিনি। আপনার মুখির কথা শুনে বুঝলাম, আপনি সত্যি

আশ্রয় ক'রে আছেন বলে সত্যি জিনিস আপনার মনে আপনিই উদয় হয়েছে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে জানতেন না তিলু এত কথা বলতে পারে বা এভাবে কথা বলতে পারে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—ভালো।

তিলু হেসে বললে—কি ভালো?

—ভালো বললে। আচ্ছা কবিরাজমশাই, আপনার বয়েস কত?

—১১৩৪ সালের মাঘ মাসে জন্ম। তাহলি হিসেব করুন। সতোরই মাঘ।

—আপনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। দাদা বলে ডাকব আপনাকে।

তিলু বললে—আমিও। দাদা মাঝে মাঝে আপনি এসে এখানে পাতা পাড়বেন। পাড়বেন কিনা বলুন?

রামকানাই কবিরাজ ভাবচেন, দিনটা আজ ভালো। এদের মত লোক এত আদর করবে কেন নইলে?

—পাতা পাড়বো বৈকি। একশো বার পাড়বো। আমার ভগ্নীর বাড়ি ভাত খাবো না তো কম্‌নে খাবো? আচ্ছা, আজ যাই দিদি। আরো একটা রুগী দেখতি হবে সবাইপুরে। খোকারে যা দেলাম, বিকেলের দিকি জ্বর ছেড়ে যাবে। কাল সকালে আবার দেখে যাবো।

নিলু স্বক্তুনিতে ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে নিলে। খোকনকে ওর কাছে দিয়ে ওর মা গিয়েচে বড়দার বাড়ি। বড়দা বড় বিপদে পড়ে গিয়েচেন, তাঁকে নাকি কোথায় যেতে হবে সাহেবদের সঙ্গে সে কথা শুনতে গিয়েচে বড়দি।

খোকন বলছে—ছো মা—ছো মা—

—কি?

—দে।

—কি দেবো? না, আর গুড় খায় না।

খোকন বড় শান্ত। আপন মনে খেলতে খেলতে একটা তেলসুদ্ধ বাটি উপুড় করে ফেললে—তারপর টলতে টলতে আসতে লাগলো উনুনের দিকে।

—নাঃ, এবার পুড়ে ঝলসে বেগুনসেদ্ধ হয়ে থাকবি। আমি জানিনে বাপু!

রাঁধবো আবার ছেলে সামলাবো, তিনি রাজরাণী আর ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি যেতি পারলেন না! ও মেজদি--মেজদি—কেউ যদি বাড়িতি থাকবে কাজের সময়! বোস এখানে—এই!···দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। আবার তেলের বাটি হাতে নিইচিস?

খোকন বললে—বাটি।

—বাটি রাখো ওখানে।

—মা।

—মা আসচে বোসো। ঐ আসচে।

খোকন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে বললে—নেই।

তারপর হাত দুটি নেড়ে বললে—নেই নেই—যা—আঃ—

—আচ্ছা নেই তো নেই। চুপটি করে বোসো বাবা আমার—

—বাবা

—আসচেন। গিয়েচেন নদীতে নাইতি।

—মা।

—আসচে।

—মা।

—বাবা রে বাবা, আর বকতি পারিনে তোর সঙ্গে! বোসো—এই! গরম—গরম—পা পুড়ে যাবে! গরম সুক্তুনির ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়চে! ও মেজদি—

এইবার খোকন কান্না শুরু করলে। নিলুর গলায় তিরস্কারের আভাসে, কান্নার সুরে বলে—মা—আঁ—আঁ—

নিলু ছুটে এসে খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—ও আমার মানিক, কাঁদে না সোনামণি—রামমণি—শ্যামমণি—চুপ চুপ। কে কেঁদেচে? আমার সোনার খোকন কেঁদেচে। কেন কেঁদেচে? মেজদি—যা সব্ সব, যমের বাড়ি যা—আমার খোকনের খোয়ার করে পাড়া বেরুনো হয়েচে!

খোকন ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললে-- মা--

—কেঁদো না। আমি তোমায় বকিনি। আমি বক্‌লি বাবা আমার আর সহ্যি করতি পারেন না। আমি বকিনি। কি দিই হাতে? ওমা ওটা কি রে? পাখী?...

এমন সময় তিলু দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—এই যে সোনামণি—কাঁদচে কেন রে?

—তোমার আদুরে গোপাল একটা উঁচু সুর শুনলি অমনি ঠোঁট ওল্‌টান। চড়া কথা বলবার জো নেই।

নিলু বললে—দাদা কোথায় গিয়েচেন দেখে এলে?

—দাদা গিয়েচেন সায়েবদের কাজে। কোথায় তিতু মীর বলে একটা লোক, মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করচে সেই লড়াইতে নীলকুঠির সায়েবেরা লোকজন নিয়ে গিয়েচে, দাদাকেও নিয়ে গিয়েচে।

—তিতু মীর?

—তাই তো শুনে এলাম। বৌদিদি কেঁদে-কেটে অনত্থ করচে। লড়াই হেন ব্যাপার, কে বাঁচে কে মরে তার ঠিকানা কি আছে?

নিলু হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো পা ছড়িয়ে। তিলু যত বলে, যত সান্ত্বনা দেয়—নিলু ততই বাড়ায়—খোকা অবাক হয়ে ক্রন্দনরতা ছোট মা'র মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে ... নিজেও চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোলো বিলু। সে নিলুর ও খোকার কান্নার রব শুনে ভাবলে বাড়িতে নিশ্চয় একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেচে। সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—কি হোলো দিদি? নিলুর কি হোলো?...

তিলু বললে—দাদা তিতু মীরের লড়াইয়ে গিয়েচে শুনে কাঁদচে। তুই একটু বোঝা। ছেলেমানুষের মতো এখনো। দাদা ... ভালোবাসে বড়, এখনো ছেলেমানুষের মতো আবদার করে দাদার কাছে।

বিলু নিলুর পাশে বসে ওকে বোঝাতে লাগলো—যাঃ, ও কি? চুপ কর। ওতে অমঙ্গল হয়। কুঠিসুদ্ধ কত লোক গিয়েচে, ভয় কি সেখানে? ছিঃ, কাঁদে

না। তুই না থামলি খোকনও থামবে না। চুপ কর।

তিলু বললে—হ্যাঁ রে, আমাদের দাদা নয়? আমরা কি কাঁদচি? অমন করতি নেই। ওতে অমঙ্গল ডেকে আনা হয়, চুপ কর। দাদা হয়তো আজই এসে পড়বে দেখিস এখন। থাম বাপু—

তিলুর মুখের কথা শেষ হতে না হতে ভবানী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। প্রথম কথাই বললেন—দাদা এসেচেন তিতু মীরের লড়াই ফেরতা। দেখা করে এলাম। এ কি? কাঁদচে কেন ও? কি হয়েচে?

—ও কাঁদচে দাদার জন্যি। বাঁচা গেল। কখন এলেন?

—এই তো ঘোড়া থেকে নামচেন।

নিলু কান্না ভুলে আগেই উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনেছিল। কথা শেষ হতেই বললে—চলো মেজদি, আমরা যাই বড়দাদাকে দেখে আসি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—যেও না।

—যাবো না? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করচে।

—আমি নিজে গিয়ে তত্ত্ব নিয়ে আসচি। তুমি গেলে তোমার গুণধর দিদি যেতে চাইবে। খোকাকে রাখবে কে?

তিলুও বললে—না যাস নে, উনি গিয়ে দেখে আসুন, সেই ভালো।

ওদের একটা গুণ আছে, ভবানী বারণ করলে আর কেউ সে কাজ করবে না। নিলু বললে—আপনার মনটা বড্ড জিলিপির পাক, জানলেন? আমার দাদার জন্যি আমার কি যে হচ্চে, আমিই জানি। দেখে আসুন, যান—

আধঘণ্টা পরে দেওয়ান রাজারামের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হয়েচে। তার মধ্যে ভবানী বাঁড়ুয্যেও আছেন।

ফণি চক্কত্তি বললেন—তারপর ভায়া, কোনো চোট লাগে নি তো!

রাজারাম রায় বললেন—না দাদা, তা লাগে নি, আপনাদের আশীব্বাদে যুদ্ধই হয় নি। এর আগে ওরা অনেক লোক নাকি মেরেছিল, সে হোলো নিরীহ গাঁয়ের লোক।

—তিতু মীর কেডা ?

—মুসলমানদের মোড়লপানা, যা বোঝলাম ওদের কথাবার্তার ভাবে। সেদিন বসে আছি হঠাৎ বড়সায়েবের কাছে চিঠি এল, তিতু মীর বলে একটা ফকির মহারাণীর সঙ্গে লড়াই বাধিয়েচে। নীলকুঠির লোকদের ওপর তার ভয়ানক রাগ। লুঠপাঠ করেচে, খুন-খারাবি হচ্চে।

—চিঠি দিলে কে বড়সায়েবের কাছে ?

—ডক্কিন্‌সন্ সায়েবের জায়গায় যে নতুন ম্যাজিস্টর এসেচেন, তিনি লিখেচেন তোমরা লোকজন নিয়ে এসো—যেখানে যত নীলকুঠির সায়েব ছিল, গিয়ে দেখি যমুনার ধারে আমবাগানে তাঁবু সব সারি সারি। লোকজন, ঘোড়া, আসবাব, বন্দুক। ওদিকে সরকারী সৈন্য এসেচে, তাদের তাঁবু। সে এক এলাহি কাণ্ড, দাদা। আমার তো গিয়ে ভারি মজা লাগতি লাগলো। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন গিয়েছিল, সে বড্ড দুঁদে। বললে, আমি দেখে আসি তিতু মীর কোথায় কি ভাবে আছে। আমাদের কারো ভয় হয় নি। যুদ্ধই তো হোলো না, একটা বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়েচে যমুনার ধারে।

—অনেক সায়েব জড়ো হয়েছিল ?

—বোয়ালমারি, পানচিতে, রঘনাথগঞ্জ, পালপাড়া, দীঘড়ে-বিষ্ণুপুর সব কুঠির সায়েব লোকজন নিয়ে এসেচে। বন্দুক, গুলি, বারুদ। মুরগি, হাঁস, খাসি যোগাচ্চে গাঁয়ের লোকে। একটা মেয়েছেলেক এমন মার মেরেচে তিতু মীরের লোক যে, তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝোঁঝালি দিয়ে পড়ছিল। তিতু মীরের কেল্লা ছিল এককোশ তিনপোয়া পথ দূরি। আমরা ছিলাম একটা আমবাগানে।

—যুদ্ধ কেমন হোলো ?

—তিতু মীর বলেছিল তার লোকজনদের সায়েবদের গোলাগুলিতি তার কিছুই হবে না। সরকারের সেপাইরা প্রথমবার ফাঁকা আওয়াজ করে। তিতু মীর তার লোকজনদের বললে—গোলাগুলি সে সব খেয়ে ফেলেচে। তখন আবার গুলি পুরে বন্দুক ছোঁড়া হোলো। বাইশজন লোক ফোৎ। তখন বাকি সবাই টেনে দৌড় মারলে। তিতু মীরকে বেঁধে চালান দিলে কলকেতা। মিটে

গেল লড়াই। তার পর আমরা সব চলে এলাম।

নীলমণি সমাদ্দার তামাক খেতে খেতে বললেন—আমরা সব ভেবে খুন। না জানি কি মস্ত লড়াইয়ের মধ্যি গেল রাজারাম দাদা। আরে তুমি হোলে গিয়ে গাঁয়ের মাথা। তুমি গাঁয়ে না থাকলি মনডা ভালো লাগে? শাম বাগদির বড় মেয়ে কুসুম বেরিয়ে গেল ওর ভগ্নিপতির সঙ্গে। মামুদপুর থেকে ওর বাবা ওরে ধরে নিয়ে এল। তার বিচের ছিল পরশু। তুমি না থাকতি হোলো না। আজ আবার হবে শুনচি।

সন্ধ্যাবেলা এল শাম বাগ্‌দি ও তার মেয়ে কুসুম।

রাজারাম বললেন—কি গা শাম?

—মেয়েডারে নিয়ে এ্যালাম কর্তাবাবুর কাছে। যা হয় বিচের করুন।

রাজারাম বিজ্ঞ বিষয়ী লোক, হঠাৎ কোনো কথা না বলে বললেন—তোর মেয়ে কোথায়?

—ওই যে আড়ালে দাঁড়িয়ে। শোন ও কুসী—

কুসুম সামনে এসে দাঁড়ালো, আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়েস, পূর্ণযৌবনা নিটোল, সুঠাম দেহ—এক ঢাল কালো চুল মাথায়, কালো পাথরে কুঁদে তৈরি করা চেহারা, আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটি। মুখখানি বেশ, রাজারাম কেবল গয়া মেমকেই এত সুঠাম দেখেচেন। মেয়েটার চোখে ভারি শান্ত, সরল দৃষ্টি।

রাজারাম ভাবলেন, বেশ দেখচি যে! ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল। বড়সায়েব যদি একবার দেখতে পায় তাহলে লুফে নেয়।

—নাম কি তোর?

—কুসুম।

—কেন চলে গিইছিলি রে?

কুসুম নিরুত্তর।

—বাবার বাড়ি ভালো লাগে না কেন?

কুসুম ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে রাজারামের দিকে চেয়ে বললে—মোরে পেট ভরে খেতি দেয় না সৎমা। মোরে বকে, মারে। মোর ভগিনপোত বললে—

মোরে বাড়ি কিনে দেবে, মোরে ভালোমন্দ খেতি দেবে—

—দিইছিল ?

—মোরে গিয়ে ধরে আনলে বাবা। কখন মোরে দেবে ?

—আচ্ছা ভালোমন্দ খাবি তুই, থাক আমার বাড়ি। থাকবি ?

—না।

—কেন রে ?

—মোর মন কেমন করবে।

—কার জন্যি ? বাবাকে ছেড়ে তো গিইছিলি। সৎমা বাড়িতি। কার জন্যি মন কেমন করবে রে ?

কুসুম নিরুত্তর।

ওর বাবা শাম বাগ্‌দি এতক্ষণ দেওয়ান রাজারামের সামনে সমীহ করে চুপ করে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বললে—মুই বলি শুনুন কর্তাবাবু। আমার এ পক্ষের ছোট ছেলেটা ওর বড্ড ন্যাওটো। তারি জন্যি ওর মন কেমন করে বলচে।

—তাই যদি হবে, তবে তারে ছেড়ে পালিয়েছিলি তো ? সে কেমন কথা হোলো ? তোদের বুদ্ধি-সুদ্ধিই আলাদা। কি বলে কি করে আবোল-তাবোল, না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। থাকবি আমার বাড়ি। ভালোমন্দ খাবি। বেশি খাটতি হবে না, গোয়ালগোবর করবি সকালবেলা।

শাম বাগ্‌দি বলচে—থাক কর্তাবাবুর বাড়ি, সব দিক থেকেই তোর সুবিধে হবে।

রাজারাম জগদম্বাকে ডেকে বললেন—ওগো শোনো, এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকবে আজ থেকে। ও একটু ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে। মুড়কি আছে ঘরে ?

জগদম্বা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়েছিলেন। বললেন—ও তো বাগ্‌দিপাড়ার কুসী না ? ও ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে কত এসেচে ওর দিদিমার সঙ্গে—মনে পড়ে না, হাঁরে ?

কুসুম ঘাড় নেড়ে বললে—মুই তখন ছেলেমানুষ ছেলাম। মোর মনে নেই।

—থাকবি আমাদের বাড়ি?

—হাঁ।

—বেশ থাক। চিঁড়ে মুড়কি খাবি? আয় চল রান্নাঘরের দিকি।

রাজারাম বললেন—মেয়ের মত থাকবি। আর গোয়াল পস্কার-মস্কার করবি। তোর মা'র কাছে চাবি যা যখন খেতি ইচ্ছে হবে। নারকোল খাবি তো কত নারকোল আছে, কুরে নিয়ে খাস্। মুড়কি মাখা আছে ঘরে। খাবার জন্যি নাকি আবার কেউ বেরিয়ে যায়? আমার বাড়ির জিনিস খেয়ে গাঁয়ের লোক এলিয়ে যায় আর আমার গাঁয়ের মেয়ে বেরিয়ে যাবে পেট ভরে খেতি পায় না বলে? তোর এ পক্ষের বৌটাকেও বলবি শাম, কাজডা ভালো করেনি। বলি, ওর মা নেই যখন, তখন কেডা ওরে দেখবে বল্।

শাম বিরক্তি দেখিয়ে বললে—বলবেন না সে স্মুন্দির ইস্ত্রীর কথা! মোর হাড় ভাজা-ভাজা করে ফেললে—মুই মাঠ থেকে ফিরলি মোরে বলে না যে দুটো চালভাজা খা। রোজ পান্তভাত, রোজ পান্তভাত। মুই বলি দুটো গরম ভাত মোরে দে, সেই স্থর্যি ঘুরে যাবে তখন দুটো ঝিঙে ভাতে দিয়ে ভাত দেবে। মরেও না যে, না হয় আবার একটা বিয়ে করি।

কুসুম মুখ টিপে হাসচে। বাবার কথায় তার খুব আমোদ হয়েচে বোধহয়।

রামকানাই কবিরাজ খেজুরপাতার চট পেতে দিলেন ভবানী বাঁড়ুযোকে। বললেন—জামাইবাবু! আসুন, আসুন।

—কি করছিলেন?

—ঈষের মূল সেদ্ধ করবো, তার যোগাড় করচি। এত বর্ষায় কোত্থেকে?

সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। অঝোরে বৃষ্টিপাত হচ্চে শ্রাবণের মাঝামাঝি। এ বাদলা তিন দিন থেকে সমানে চলচে। তিৎপল্লা গাছের ঝোপ বৃষ্টিতে ভিজে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্চে। মাটির পথ বেয়ে জলের স্রোত চলেছে ছোট ছোট নালার মত। বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। বাগদিপাড়ার নলে বাগদি,

অধর সর্দার, অধর সর্দারের তিন জোয়ান ছেলে, ভেঁপু মালি—এরা সব ঘুনি আর পোলো নিয়ে বাঁধালে জলের তোড়ে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করচে। বৃষ্টির গুঁড়ো ছাটে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া। রামকানাইয়ের ঘরের পেছনে একটা সোঁদালি গাছে এখনো দু'এক ঝাড় ফুল দুলচে। মাঠে ঘাসের ওপর জল বেধে ছোট পুকুরের মত দেখাচ্চে। পথে জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে। ঘরের মধ্যে চালের ফাঁক দিয়ে একটা নতুন তেলাকুচোর লতা ঢুকেচে, নতুন পাত গজিয়েচে তার চারু কমনীয় সবুজ ডগায়।

—তামাক সাজি বসুন। ভিজে গিয়েচেন যে! গামছাখানা দিয়ে মুছে ফেলুন—

—এ বর্ষায় তিন দিন আজ বাড়ি বসে। একটু সৎ চর্চা করি এমন লোক এ গাঁয়ে নেই—সবাই ঘোর বৈষয়িক। তাই আপনার কাছে এলাম।

—আমার কত বড় ভাগ্যি জামাইবাবু। দুটো চিড়ে খাবেন, দেবো? গুড় আছে কিন্তু।

—আপনি যদি খান তবে খাবো।

—দুজনেই খাবো, ভাববেন না। অতিথি এলেন ঘরে, দেবার কি আছে, কিছুই নেই। যা আছে তাই দেলাম। শিশিনিতি একটু গাওয়া ঘি আছে, মেখে দেবো?

—দেখি, আপনি কিনেচেন না নিজে করেন?

রামকানাই একটা ছোট্ট শিশি কাঠের জলচৌকি থেকে নিয়ে ভবানীর হাতে দিলেন। বললেন—নিজে তৈরি করি। গয়া মেম একটু ক'রে দুধ দেয়, আমারে বাবা বলে। মেয়েডা ভালো। সেই মেয়েডা এই শিশিনি এনে দিয়েচে সায়েবদের কুঠি থেকে। যে সরটুকু পড়ে, তাই জমিয়ে ঘি করি। ঘি আমাদের ওষুধে লাগে কিনা। অনেকে গব্য ঘৃত না মিশিয়ে বাজারের ভয়সা ঘি মেশায়—সেটা হোলো মিথ্যে আচরণ। জীবন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে শঠতা, প্রবঞ্চনা যারা করে, তারা তেনার কাছে জবাবদিহি দেবে একদিন কি ক'রে?

—আর কবিরাজ মশাই! দুনিয়াটা চলচে শঠতা আর প্রবঞ্চনার ওপরে।

চারিধারে চেয়ে দেখুন না। আমাদের এ গাঁয়েই দেখুন। সব ক'টি ঘুণ বিষয়ী। শুধু গরীবের ওপর চোখরাঙানি, পরের জমি কি ক'রে ফাঁকি দিয়ে নেবো, পরনিন্দা, পরচর্চা, মামলা এই নিয়ে আছে। কুয়োর ব্যাং হয়ে পড়ে আছে এই মোহগর্ভে।

রামকানাই ততক্ষণে গাওয়া ঘি মাখালেন চিড়েতে। গুড় পাড়লেন শিকেতে ঝুলোনো মাটির ভাঁড় থেকে। পাথরের খোরাতে ঘি-মাখা কাঁচা চিঁড়ে রেখে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে খেতে দিলেন।

ভবানীকে বললেন—কাঁচা লঙ্কা একটা দেবো?

—দিন একটা—

—আচ্ছা, একটু আদি সংবাদ শোনাবেন? ভগবান কি রকম? তাঁকে দেখা যায়? আপনারে বলি, এই ঘরে একলা রাত্তিরি অন্ধকারে বসে বসে ভাবি, ভগবানডা কেডা? উত্তর কেডা দেবে বলুন। আপনি একটু বলুন।

ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজেকে বিপন্ন বিবেচনা করলেন। রামকানাই কবিরাজ সৎ লোক, সত্যসন্ধ লোক। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এত বড় গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন? এই বৃদ্ধের পিপাসু মনের খোরাক যোগাবার যোগ্যতা তাঁর কি আছে? বিশেষ ক'রে বিশ্বের কর্তা ভগবানের কথা। যেখানে সেখানে যা তা ভাবে তিনি তাঁর কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন। বড্ড শ্রদ্ধা করেন ভবানী বাঁড়ুয্যে যাঁকে, তাঁর কথা এভাবে বলে বেড়াতে তাঁর বাধে। উপনিষদের সেই বাণী মনে পড়লো ভবানীর—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় ও মূঢ়তায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও অজ্ঞানী ব্যক্তি ভাবে, "আমি বেশ আছি, আমি কৃতার্থ!"

তিনিও কি সেই দলের একজন নন?

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক নয়? এ কি সে দলের একজন

নয়, যাঁরা :—

তপঃশ্রদ্ধে য হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষাচর্য্যাং চরন্ত
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অরণ্যে বাস করেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন, সেই সব নিরাসক্ত নির্লোভ ব্যক্তি সূর্যদ্বার-পথে সেইখানে যান, যেখানে সেই অব্যয়াত্মা অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান।

ভবানী বাঁড়ুয্যে কি কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রি করতে আসেন নি!

তিনি বিনীতভাবে বললেন—আমার মুখে কি শুনবেন? তিনিই বিরাট, তিনিই এই সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্য, তিনিই মন।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদুবাঙ মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্যবিদ্ধি—

রামকানাই কবিরাজ সংস্কৃতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নন, কথা শুনতে শুনতে চোখ বুজে ভাবের আবেগে বলতে লাগলেন—আহা! আহা! আহা!

তিনি ভবানীর হাত দুটি ধরে বললেন—কি কথাই শোনালেন, জামাইবাবু। এ সব কথা কেউ এখানে বলে না। মনটা আমার জুড়িয়ে গেল। বড্ড ভালো লাগে এসব কথা। বলুন, বলুন।

ভবানী বাঁড়ুয্যে নম্রভাবে সশ্রদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন :

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান—
আস্য জন্তো র্নিহিতং গুহায়াং

তিনি ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর, মহৎ থেকেও মহৎ। ইনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যেই বাস করেন। আসীনো দূরং ব্রজতি, উপবিষ্ট হয়েও তিনি দূরে যান, শয়ানো যাতি সর্বতঃ—শুয়ে থেকেও তিনি সর্বত্র যান।

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

যিনি দীপ্তিমান, যিনি অণুর চেয়েও সূক্ষ্ম। যাঁর মধ্যে সমস্ত লোক রয়েচে, সেই সব লোকের অধিবাসীরা রয়েচে—

রামকানাই চিঁড়ে খেতে খেতে চিঁড়ের বাটিটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখেচেন তাঁর ডান হাতে তখনো একটা আধ-খাওয়া কাঁচা লঙ্কা, মুখে বোকার মত দৃষ্টি, চোখ দিয়ে জল পড়চে। ছবির মত দেখাচ্চে সমস্তটা মিলে।···ভবানী বাঁড়ুয্যে বিস্মিত হোলেন ওঁর জলে-ভরা টসটসে চোখের দিকে তাকিয়ে।

খালের ওপারে বাবলা গাছের মাথায় সপ্তমীর চাঁদ উঠেছে পরিষ্কার আকাশে। হুতুম-প্যাঁচা ডাকচে নলবনের আড়ালে।

ভবানী অনেক রাত্রে বাড়ি রওনা হোলেন। শরতের আকাশে অগণিত নক্ষত্র, দূরে বনান্তরে কাঠঠোকরার তন্দ্রাস্তব্ধ রব, কচিৎ বা দু'একটা শিয়ালের ডাক—সবই যেন তাঁর কাছে অতি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল। আজ নিভৃত, নিস্তব্ধ রসে তাঁর অন্তর অমৃতময় হয়েচে বলে তাঁর বার বার মনে হতে লাগলো। রহস্যময় বটে, মধুরও বটে। মধুর ও রহস্যময় ও বিরাট ও সুন্দর ও বড় আপন সে দেবতা। একমাত্র দেবতা, আর কেউ নেই। যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস ও অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁর অপূর্ব আবির্ভাবে নৈশ আকাশ যেন থমথম করচে। এ সব পাড়াগাঁয়ে সেই দেবতার কথা কেউ বলে না। বধির বনতল ওদের পাশ-কাটিয়ে চলে যায়। নক্ষত্র ওঠে না, জ্যোৎস্নাও ফোটে না। সবাই আছে বিষয়সম্পত্তির তালে, দু'হাত এগিয়ে ভেরেণ্ডার কচা পুঁতে পরের জমি ফাঁকি দিয়ে নেবার তালে।

হে শান্ত, পরমব্যক্ত ও অব্যক্ত মহাদেবতা, সমস্ত আকাশ যেমন অন্ধকারে ওতপ্রোত, তেমনি আপনাতেও। তুমি দয়া করো, সবাইকে দয়া কোরো। খোকাকে দয়া কোরো, তাকে দরিদ্র কর ক্ষতি নেই, তোমাকে যেন সে জানে। ওর তিন মাকে দয়া কোরো।

তিলু স্বামীর জন্যে জেগে বসে ছিল। রাত অনেক হয়েচে, এত রাত্রে তো

কোথাও থাকেন না উনি? বিলু ও নিলু বার বার ওদের ঘর থেকে এসে জিগ্যেস করচে। এমন সময় নিলু বাইরের দিকে উঁকি মেরে বললে—ঐ যে মূর্তিমান আসচেন।

তিলু বললে—শরীর ভালো আছে দেখচিস তো রে?

—ব'লে তো মনে হচ্চে। বলি ও নাগর, আবার কোন্ বিন্দেবলীর কুঞ্জে যাওয়া হয়েছিল শুনি? বড়দিকে কি আর মনে ধরচে না? আমাদের না হয় না-ই ধরলো—

ভবানী এগিয়ে এসে বললেন—তোমরা সবাই মিলে এমন করে তুলেচ যেন আমি সুন্দরবনের বাঘের পেটে গিয়েচি। রাত্রে বেড়াতে বেরোবার জো নেই? রামকানাই কবিরাজের বাড়ি ছিলাম।

বিলু বললে—সেখানে কি আজকাল গাঁজার আড্ডা বসে নাকি?

নিলু বললে—নইলি এত রাত অবধি সেখানে কি হচ্ছিল?

তিলু বোনেদের আক্রমণ থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে চলে। কোনোরকমে ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে স্বামীর হাত-পা ধোবার জল এনে দিলে। বললে—পা ধুয়ে দেবো? পায়ে যে কাদা!

—ওই মাল্‌সি কাঁটালতলার কাছে ভীষণ কাদা।

—কি খাবেন?

—কিছু না। চিড়ে খেয়ে এসেচি কবিরাজের বাসা থেকে।

—না খেলি হবে না। ওবেলার চালকুমড়োর সুক্তুনি রাখতি বলেছিলেন—রয়েচে। সে কে খাবে? এক সরা সুক্তুনি রেখে দিইছিল নিলু। ও বড্ড ভালোবাসে আপনাকে—

—আচ্ছা, দাও। খোকনকে কি খাইয়েছিলে?

—দুধ।

—কাসি আর হয়নি?

—শুঁঠ গুঁড়ো গরমজলে ভিজিয়ে খেতি দিইচি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খেতে বসে তিলুকে সব কথা বললেন। তিলু শুনে বললে

—উনি অন্যরকম লোক, সেদিনও ঐ কথা জিগ্যেস করেছিলেন মনে আছে? আপনি সেদিন পড়িয়েছিলেন—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ—তাঁর চেয়ে বড় আর কিছু নেই, এই তো মানে?

—ঠিক।

—আমিও ভাবি—ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় পেরে উঠিনে। আপনি আমাকে আরও পড়াবেন। ভালো কথা, আমাদের দু'আনা ক'রে পয়সা দেবেন।

—কেন?

—কাল তেরের পালুনি। বনভোজনে যেতি হবে।

—আমিও যাবো।

—তা কি যায়? কত বৌ-ঝি থাকবে। আচ্ছা, তেরের পালুনির দিন বিষ্টি হবেই, আপনি জানেন?

—বাজে কথা।

—বাজে কথা নয় গো। আমি বলচি ঠিক হবে।

—তোমারও ঐ সব কুসংস্কার কেন? বৃষ্টির সঙ্গে কি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে বনে বসে খাওয়ার?

—আচ্ছা, দেখা যাক। আপনার পণ্ডিতি কতদূর টেঁকে!

ভাদ্র মাসের তেরোই আজ। ইছামতীর ধারে 'তেরের পালুনি' করবার জন্যে পাঁচপোতা গ্রামের বৌ-ঝিরা সব জড়ো হয়েচে। নালু পালের স্ত্রী তুলসীকে সবাই খুব খাতির করচে, কারণ তার স্বামী অবস্থাপন্ন। তেরের পালুনি হয় নদীর ধারের এক বহু পুরনো জিউলি গাছের আর কদম গাছের তলায়। এই জিউলি আর কদম গাছ দুটো একসঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে আছে যে কতদিন ধরে, তা গ্রামের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে কেউ বলতে পারে না। অতি প্রাচীন লোকদের মধ্যে নীলমণি সমাদ্দারের মা বলতেন, তিনি যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে, তখনও তিনি তাঁর শাশুড়ী ও দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে এই গাছতলায় তেরের

পালুনির বনভোজন করেছিলেন। গত বৎসর পঁচাশি বছর বয়সে নীলমণির মা দেহত্যাগ করেচেন।

মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করচে। এখানে আর রান্না হয় না, বাড়ি থেকে যার যার যেমন সঙ্গতি– খাবার জিনিস নিয়ে এসে কলার পাতা পেতে খেতে বসে, মেয়েরা ছড় কাটে, গান গায়, উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বৌ, তুমি ভালো ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে—যারা দারিদ্র্যের জন্যে তেমন কিছু আনতে পারেনি, তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না—এ একটি অলিখিত গ্রাম্য-প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।

যেমন আজ হোলো—তুলসী লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরে যতীনের বৌ আর বোন নন্দরাণীর কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ মেলামেশা ও ছোয়াছুঁয়ির খুব কড়াকড়ি না থাকলেও বামুনবাড়ির ঝি-বৌরা নদীর ধার ঘেঁষে খাওয়ার পাত পাতে, অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা মাঠের দিকে ঘেঁষে খেতে বসে। যতীনের বৌ এনেচে চালভাজা, দুটি মাত্র পাকা কলা ও একঘটি ঘোল। তাই খাবে ওর ননদ নন্দরাণী আর ও নিজে। তুলসী এসে বললে—ও স্বর্ণ, কেমন আছ ভাই ?

—ভালো দিদি। খোকা আসেনি ?

—না, তাকে রেখে এ্যালাম বাড়িতি। বড্ড দুষ্টুমি করবে এখানে আনলি। কি খাবা ও স্বর্ণ ?

—এই যে। ঘোলটুকু আমার বাড়ির। আজ তৈরী করিচি সকালে। তিন দিনের পাতা সর। একটু খাস তো নিয়ে যা দিদি।

তুলসী ঘোল নেওয়ার জন্যে একটা পাথরের খোরা নিয়ে এল, ওর হাতে দুখানা বড় ফেনি বাতাসা আর চারটি মর্তমান কলা।

—ও আবার কি দিদি ?

—নাও ভাই, বাড়ির কলা। বড় কাঁদি পড়েল আষাঢ় মাসে, বর্ষার জল পেয়ে ছড়া নষ্ট হয়ে গিয়েল।

তিলু বিলু খেতে এসেচে বনে, নিলু খোকাকে নিয়ে রেখেচে বাড়িতে। ওদের সবাই এসে জিনিস দিচ্চে, খাতির করচে, মিষ্টি কথা বলচে। দুধ, চিনির মঠ, আখের গুড়ের মুড়কি, খই, কলা, নানা খাবার। ওরা যত বলে নেবো না, ততই দিয়ে যায় এ এসে, ও এসে। ওরাও যা এনেছিল, নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূর (ওদের অবস্থা গ্রামের মধ্যে বড় হীন) সঙ্গে সমানে ভাগ করেচে।

—ও দিদি, কি খাবি ভাই ?

—দুটো চালভাজা এনেলাম তাই। আর একটা শসা আছে।

—দুধ নেই ?

—দুধ ক'নে পাবো ? গাই এখনো বিয়োয়নি।

—এখনো না ? কবে বিয়োবে ?

—আশ্বিন মাসের শেষাগোসা।

তিলুর ইঙ্গিতে বিলু ওদের দুজনকে চিঁড়ে, মুড়কি, বাতাসা, চিনির মঠ এনে দিলে। ষষ্ঠী চৌধুরীর স্ত্রী ওদের পাকাকলা দিয়ে গেলেন ছ'সাতটা।

ফণি চক্কত্তির পুত্রবধূ বললে—আমার অনেকখানি খেজুরের গুড় আছে, নিয়ে আসচি তাই।

তিলু বললে—আমি নেবো না ভাই, ওই ছোট কাকীমাকে দাও। অনেক মঠ আর বাতাসা জমেচে। বিধুদিদি, এবার ছড়া কাটলে না যে ? ছড়া কাটো শুনি।

বিধু ফণি চক্কত্তির বিধবা বোন, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস—একসময়ে সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল এ গ্রামে। বিধু হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে :—

আজ বলেচে যেতে
পান সুপুরি খেতে
পানের ভেতর মৌরি-বাটা
ইস্কে বিস্কে ছবি আঁটা

কলকেতার মাথা ঘষা
মেদিনীপুরের চিরুনি
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো
চাঁপাফুলের গাঁথুনি
আমার নাম সরোবালা
গলায় দেবো ফুলের মালা—

বিলু চোখ পাকিয়ে হেসে বললে—কি বিধুদিদি আমার নামে বুঝি ছড়া বানানো হয়েচে? তোমায় দেখাচ্চি মজা—বলে,

চালতে গাছে ভোমরার বাসা
সব কোণ নেই তার এক কোণ ঠাসা—

তোমারে আমি—আচ্ছা, একটা গান কর না বিধুদিদি? মাইরি নিধুবাবুর টপ্পা একখানা গাও শুনি—

বিধু হাত-পা নেড়ে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলো—

ভালোবাসা কি কথার কথা সই, মন যার সনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িতা লতা
মন যার সনে গাঁথা।

ও পাড়ার একটি অল্পবয়সী ‌লাজুক বৌকে সবাই বললে—একটা শ্যামা-বিষয়ক গান গাইতে। বৌটি ভজগোবিন্দ বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, কামদেবপুরের রত্নেশ্বর গাঙ্গুলীর তৃতীয়া কন্যা, নাম নিস্তারিণী। রত্নেশ্বর গাঙ্গুলী এদিকের মধ্যে একজন ভালো ডুগি-তবলা বাজিয়ে। অনেক আসরে বৃদ্ধ রত্নেশ্বরের বড় আদর। নিস্তারিণী শ্যামবর্ণা, একহারা, বড় সুন্দর ওর চোখ দুটি, গলার স্বর মিষ্টি। সে গাইলে বড় সু-স্বরে—

নীলবরণী নবীনা বরুণী নাগিনী-জড়িত জটা-বিভূষিণী
নীলনয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী।

গান শেষ হোলে তিলু পেছন থেকে গিয়ে ওর মুখে একখানা আস্ত চিনির মঠ গুঁজে দিলো। বৌটির লাজুক চোখের দৃষ্টি নেমে পড়লো, বোধ হয় একটু

অপ্রতিভ হোলো অতগুলি আমোদপ্রিয় বড় বড় মেয়েদের সামনে।

বললে—দিদি, ঠাকুরজামাইকে দিয়ে যান গে—

—তোর ঠাকুরজামাইকে তুই দেখেচিস নাকি?

বিলু এগিয়ে এসে বললে—কেন রে ছোটবৌ, ঠাকুরজামাইয়ের নাম হঠাৎ কেন? তোর লোভ হয়েচে নাকি? খুব সাবধান। ওদিকি তাকাবি নে। আমরা তিন সতীনে ঝ্যাঁটা নিয়ে দোরগোড়ায় বসে পাহারা দেবো, বুঝলি তো? ঢুকবার বাগ পাবি ক্যামন করে?

কাছাকাছি সবাই হি-হি করে হেসে উঠলো।

এমন সময়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল—ঠিক কি সেই সময়েই দেখা গেল স্বয়ং ভবানী বাঁড়ুয্যে রাঙা গামছা কাঁধে এবং কোলে খোকাকে নিয়ে আবির্ভূত।

নালু পালের স্ত্রী তুলসী বললে—ঐ রে! ঠাকুরজামাই বলতে বলতেই ওই যে এসে হাজির—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কাছে এসে বললেন—বেশ! আমাদের ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে দিয়ে—বেশ! ও বুঝি থাকে? ঘুম ভেঙেই মা-মা চীৎকার ধরলো। অতিকষ্টে বোঝাই—তাই কি বোঝে?

খোকা জনতার দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বললে—মা—

বিলু ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বললে—কেন, নিলু কোথায়? আপনার ঘাড়ে চাপানো হয়েচে কে বললে? নিলুর কোলে বসিয়ে দিয়ে আমি—

—বৌদিদিরা ডেকে পাঠালেন নিলুকে। বড়দাদার শরীর অসুখ করেচে—ও চলে গেল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে—

বৌ-ঝিরা ভবানীকে দেখে কি সব ফিস্‌ফিস্ করতে লাগলো জটলা করে, কেউ কথা বলবে না। সে নিয়ম এসব অঞ্চলে নেই। প্রবীণা বিধু এগিয়ে এসে বললে—ও বড়-মেজ-ছোট জামাইবাবু, সব বৌ-ঝিরা বলচে, ঠাকুর-জামাইকে আজ যখন আমরা পেয়ে গিইচি তখন আজ আর ছাড়চি নে—আমাদের—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কথা শেষ করতে না দিয়েই তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললেন—না, মাপ করুন বিধুদিদি, আমি একা পেরে উঠবো না—বয়েস হয়েচে—

এই কথাতে একটা হাসির বন্যা এসে গেল বৌ-ঝিদের মধ্যে। কারো চাপা হাসি, কেউ খিলখিল করে হেসে উঠলো, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ওদিকে, কেউ ঘোমটার আড়ালে খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো—হাসির সেই প্লাবনের মধ্যে ভাদ্র অপরাহ্নে নদীর ধারের কদম ডালে রাঙা রোদ আর ইছামতীর ওপারে কাশফুলের দুলুনি। কোথাও দূরে ঘুঘুর ডাক। নিস্তারিণীর কোলে খোকার অর্থহীন বকুনি। সব মিলিয়ে তেরের পালুনি আজ ভালো লাগলো নিস্তারিণীর। ঠাকুরজামাই কি আমুদে মানুষটি! আর বয়েস হোলেও এখনো চেহারা কি চমৎকার!

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নীলকুঠি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। মিঃ ডব্কিন্‌সন্ বদলি হয়ে যাওয়ার পরে অনেক দিন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নীলকুঠিতে পদার্পণ করেন নি। কাজেই অভ্যর্থনার আড়ম্বর একটু ভালো রকমই হোলো। খুব খানাপিনা, নাচ ইত্যাদি হয়ে গেল। যাবার সময় নতুন ম্যাজিস্ট্রেট কোলম্যান্ সাহেব বড়সাহেবকে নিভৃতে কয়েকটি সদুপদেশ দিয়ে গেলেন।

—Do you read native newspapers? You do? Hard times are ahead, Mr Shipton. Stuff some wisdom into the brains of your men. You understand? I hope you will not mind my saying so?

—Explain that to me.

—I will, presently.

আসল কথা ক্রমশঃ দিন খারাপ হচ্চে। দেশী কাগজওয়ালারা খুব হৈ-চৈ আরম্ভ করেচে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে হরিশ মুখুয্যে গরম গরম প্রবন্ধ লিখচে, রামগোপাল ঘোষ নীলকরদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করচে, নেটিভরা মানুষ হয়ে উঠলো, সে দিন আর নেই, একটু সাবধানে সব কাজ করে যাও।

আমাদের ওপর গবর্ণমেণ্টের গোপন সার্কুলার আছে নীলসংক্রান্ত বিবাদে আমরা যেন, যতদূর সম্ভব, প্রজাদের পক্ষে টানি।

কোলম্যান্ সাহেবের মোট বক্তব্য হোলো এই।

পরদিন বড়সাহেব ডেভিড্ সাহেবকে ডেকে বললে সব কথা। ডেভিড্ বোধ হয় একটু অসন্তুষ্ট হোলো। বললে—You see, I can work and I can do with very little sleep and I have never wasted time on liking people, Perhaps I am not clever enough—

—No David, we have a stake down here, in this god-forsaken land, you see ? What I want to drive at is this—

এমন সময়ে শ্রীরাম মুচি এসে বললে—সায়েব, বাইরে দপ্তরখানায় প্রজারা বসে আছে। খুব হাঙ্গামা বেধেচে। হিংনাড়া, রসুলপুরের বাগদিরা খেপেচে। তারা নাকি নীলির মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে নীলির চারা খেইয়ে দিয়েচে—

ডেভিড্ লাফিয়ে উঠে বললে—কনেকার প্রজা ? হিংনাড়া ? সাদেক মোড়ল আর ছিহরি সর্দার ওই দুটো বদমাইশের দিকি আমার অনেকদিন থেকে নজর আছে; শাসন কি করে করতি হয় তা আমি জানি।

শিপ্‌টন্ সাহেব ভয়ানক রেগে বলে উঠলেন—The devil that is ! I will come in with you this time. Will you like to come on a mouse-hunt to-morrow morning ?

—Sure I will.

—I wonder whether I ever told you these thieving people drove off some of our horses from the village ?

—My stomach ! You never did.

—Well, be ready to-morrow morning. May be we would kill off the mice right away.

—Sure..

পরদিন সকালে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল।

দুই ঘোড়ায় দুই সাহেব, পিছনে আর এক সাদা বড় ঘোড়ায় দেওয়ান রাজারাম রায়, আর একটা বাদামী রংয়ের ঘোড়ায় প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন এক লম্বা সারিতে চলেচে—ওদের পিছনে কুঠির লাঠিয়ালদের সর্দার রসিক মল্লিক। লোকে বুঝলে আজ একটা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার না হয়ে আর যায় না। হঠাৎ একস্থানে প্রসন্ন আমীন টুক করে নেমে পড়লো। হেঁকে রাজারামকে বললে—দেওয়ানজি, একটু এগিয়ে যান, ঘোড়ার জিন্‌টা ঢল হয়ে গেল, কষে নি—

তারপর মুখ উঁচু করে দেখলে, ওরা বেশ দু'কদম দূরে চলে গিয়েচে। প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়াটা কাদের একটা সোঁদালি গাছে বেঁধে রাস্তা থেকে সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত একখানা চালাঘরের বাইরে গিয়ে ডাকলে—গয়া, ও গয়া—

ভিতর থেকে গয়ার মা বরদা বাগ্‌দিনীর গলা শোনা গেল—কেডা গা বাইরে?

প্রসন্ন চক্কত্তি প্রমাদ গনলো। এ সময়ে বুড়ী থাকে না বাড়িতে, কুঠিতে মেমসাহেবদের কাজ করতে যায়—ছেলে ধরা, ছেলেদের স্নান করানো এই সব। ও আপদ আজ এখন আবার—আঃ, যতো হাঙ্গাম কি—প্রসন্ন চক্কত্তি গলা ছেড়ে বললে—এই যে আমি, ও দিদি--

—কেডা গা? আমীনবাবু? কি--এমন অসময়ে?

বলতে বলতে বরদা বাগদিনী এসে বাইরে দাঁড়ালো, বোধ হয় ধানসেদ্ধ করছিল—ধানের হাঁড়ির কালি হাতে মাখানো মাথায় ঝাঁটার মত চুলগুলো চুড়োর আকারে বাঁধা। মুখ অপ্রসন্ন।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—কে? দিদি? আঃ, ভালোই হোলো। ঘোড়াটার পায়ে কি হয়েচে, হাঁটতে পারচে না। একটু নারকোল তেল আছে?

—না, নেই। নারকোল তেল বাড়ন্ত--

—ও! তবে যাই।

বরদা বাগ্‌দিনী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রসন্ন আমীনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। প্রসন্ন চক্কত্তির কৈফিয়ৎ সে বিশ্বাস করেচে কিনা কে জানে। মেয়ের পেছনে

যে লোকজন ঘোরাফেরা করে তা বুঝি সে জানে না? কত অবাঞ্ছিত আবেদন ও প্রার্থনার জঞ্জাল সরিয়ে রাখতে হয় ঝাঁটা হাতে। কচি খুকি নয় বরদা বাগ্‌দিনী। আমীন মশায় বলে সন্দেহের অতীত এরা নয়, বয়স বেশি হয়েচে বলেও নয়। অনেক প্রৌঢ়, অনেক অল্পবয়সী, অনেক আত্মীয়কেও সে দেখলো। কাউকে বিশ্বাস নেই।

প্রসন্ন চক্কত্তি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল।

হিংনাড়া গ্রামের বাইরে চারিধারে নীলের ক্ষেত। এমন সময় নীলের চারা বেশ বড় বড় হয়েচে। বড়সাহেবকে ছোটসাহেব ডেকে দেখিয়ে বললে—See what they are up to.

এমন সময়ে দেখা গেল লাঠি হাতে একটি জনতা বাগ্‌দিপাড়া থেকে বেরিয়ে মাঠের আলে আলে ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসচে।

দেওয়ান রাজারাম বললেন—সায়েব, ওরা ঘিরে ফেলবার মতলব করচে। চলুন আরও এগিয়ে—

ডেভিড্ বললে—তুমি ফিরে যাও, এদের ঘরে আগুন দিতি হবে, লোকজন নিয়ে এসো।

রসিক মল্লিক লাঠিয়াল বললে—কিছু লাগবে না সায়েব। মুই এগিয়ে যাই, দাঁড়ান আপনারা—

বড়সাহেব বললে—You stay, আমি আর ছোটসায়েব যাইবেন। সড়কি আনিয়াছ?

—না সায়েব, সড়কি লাগবে না। মোর লাঠির সামনে একশো লোক দাঁড়াতে পারবে না। আপনি হঠে আসুন।

দেওয়ান রাজারাম ততক্ষণ ঘোড়া এগিয়ে হিংনাড়া গ্রামের উত্তর কোণের দিকে ছুটিয়েচেন। বড়সাহেব চেঁচিয়ে বললেন—রসিক, তোমার সহিট যাইবে ডেওয়ান—

কিছুক্ষণ পরে খুব একটা চীৎকার ও আর্তনাদ শোনা গেল। বাগ্‌দি পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ে ও ঝি-বৌয়েরা প্রাণপণে চেঁচাচ্চে ও এদিক-ওদিক

দৌড়চ্চে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রামধন বাগ্‌দি রাস্তার ধারের একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল, তার মাথায় লাঠির বাড়ি পড়তেই চীৎকার ক'রে মাটিতে পড়ে গেল, তার স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো, লোকজন ছুটে এল, হৈ-চৈ আরম্ভ হোলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বাগ্‌দিপাড়ায় আগুন লেগেচে। লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগলো। লাঠি হাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড় দিল নিজের নিজের বাড়ি অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে সামলাতে। এটা হোলো দেওয়ান রাজারামের পরামর্শ। বড়সাহেবকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে জনতা আগেই পলায়নপর হয়েছিল, কারণ বড়সাহেবকে সবাই যমের মত ভয় করে। ছোটসাহেব যতই বদমাইশ হোক, অত্যাচারী হোক, বড়সাহেব শিপ্‌টন্ হোলো আসল কূটবুদ্ধি শয়তান। কাজ উদ্ধারের জন্য সে সব করতে পারে। জমি বেদখল, জাল, ঘরজ্বালানি, মানুষ খুন কিছুই তার আটকায় না। তবে বড়সাহেবের মাথা হঠাৎ গরম হয় না। ছোটসাহেবের মত সে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়, হঠাৎ যা-তা করে না। কিন্তু একবার যদি সে বুঝতে পারে যে এই পথে না গেলে কাজ উদ্ধার হবে না, সে পথ সে ধরবেই। কোনো হীন কাজই তখন তার আটকাবে না।

আগুন তখুনি লোকজন এসে নিভিয়ে ফেললে। আগুন দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা, সে উদ্দেশ্য সফল হোলো। রসিক মল্লিককে সকলে বড় ভয় করে, সে জাতিতে নমঃশূদ্র, দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও সড়কি-চালিয়ে। আজ বছর আট-দশ আগে ও নিজের এক ছেলেকে শিয়াল ভেবে মেরে ফেলেছিল সড়কির খোঁচায়। সেটা ছিল পাকা কাঁটালের সময়। ওদের গ্রামের নাম নূরপুর, মহম্মদপুর পরগণার অধীনে। ঘরের মধ্যে পাকা কাঁটাল ছিল দরমার বেড়ার গায়ে ঠেস দেওয়া না। ন' বছরের ছোট ছেলে সন্দেবেলা ঘরের বেড়ার বাইরে বসে বেড়া ফুটো করে হাত চালিয়ে কাঁটাল চুরি করে খাচ্ছিল। রসিক খস্‌খস্ শব্দ শুনে ভাবলে শিয়ালে কাঁটাল চুরি করে খাচ্চে। সেই ছিদ্রপথে ধারালো সড়কির কাঁটাওয়ালা ফলার নিপুণ

চালনায় অব্যর্থভাবে লক্ষ্যবিদ্ধ করলো। বালককণ্ঠের মরণ-আর্তনাদে সকলে তেলের পিদীম হাতে ছুটে গেল। হাতেমুখে কাঁটালের ভুতুড়ি আর চাঁপা মাখা ছোট্ট ছেলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠে মাটি ভাসিয়ে দিচ্চে। চোখের দৃষ্টি স্থির, হাতের বাঁধন আল্‌গা। কেবল ছোট্ট পা দুখানা তখনো কোনো কিছুকে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্চে আবার পিছিয়ে যাচ্চে। সব শেষ হয়ে গেল তখুনি।

রসিক মল্লিক সে রাত্রের কথা এখনো ভোলেনি। কিন্তু আসলে সে দস্যু, পিশাচ। টাকা পেলে সে সব করতে পারে। রামু সর্দারকে সে-ই সড়কির কোপে খুন করেছিল বাঁধালের দাঙ্গায়। নেবাজি মণ্ডলের ভাই সাতু মণ্ডলকে চালকী গ্রামের খড়ের মাঠে এক লাঠির ঘায়ে শেষ করেছিল।

এ হেন রসিক মল্লিক ও বড়সাহেবকে একত্র দেখে বাগদিপাড়ার লোক একটু পিছিয়ে গেল।

রসিক হাঁক দিয়ে ডেকে বললে—কোথায় রে তাদের ছিহরি সর্দার! পাঠিয়ে দে সামনে। বড়সায়েবের হুকুম, তার মুণ্ডুটা সড়কির আগায় গিঁথে কুঠিতে নিয়ে যাই। মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তো সামনে এসে দাঁড়া ব্যাটা শেয়ালের বাচ্চা! এগিয়ে আয় বুনো শুওরের বাচ্চা! এগিয়ে আয় নেড়ি কুকুরের বাচ্চা! তোর বাবারে ডেকে নিয়ে আয় মোর সামনে, ও হারামজাদা!

ছিহরি সর্দার লাঠি হাতে এগিয়ে আসছিল, তার বৌ গিয়ে তাকে কাপড় ধরে টেনে না রাখলে সে এগিয়ে আসতে ভয় পেতো না—তবে খুব সম্ভবত প্রাণটা হারাতো। রসিক মল্লিকের সামনে সে দাঁড়াতে পারতো না। খুন জখম যার ব্যবসা, তার সামনে নিরীহ গৃহস্থ লাঠিয়াল কতক্ষণে দাঁড়াবে?

ছোটসাহেব বললে—রসিক, ব্যাটা ছিহরি আর সাদেককে ধরে আনতি পারবা?

বড়সাহেবের মেজাজ এতক্ষণে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে, সে বললে—I am afraid that would not be quite within the bounds of law. Let us return.

পরে হেসে বললেন—Sufficient unto the day—the evil thereof...

ছোটসাহেব মনে মনে চটলো বড়সাহেবের ওপর—ভাবলে সে বড় সাহেবের কথার শেষে বলে—Amen। কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠল না।

দেওয়ান রাজারাম ততক্ষণে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েচেন কুঠির দিকে। প্রসন্ন চক্কত্তিও সেই সঙ্গে ফিরছিল, কিন্তু সে একটি সুঠাম তন্বী ষোড়শী বধূকে আলুথালু অবস্থায় বাঁশবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখে সেখানে ঘোড়া দাঁড় করালে। কাছে লোকজন ছিল না কেউ। বৌটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বাঁশবনের ওদিকে ঘুরে যাবার চেষ্টা করতে প্রসন্ন চক্কত্তি গলার সুরকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে জিগ্যেস করলে—কেডা গা তুমি?

উত্তর নেই।

—বলি, ভয় কি গা? আমি কি সাপ না বাঘ! তুমি কেডা?

উত্তর নেই। আর্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল।

প্রসন্ন আমীন চট্ করে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে ঘোড়াটা বাঁশ-ঝাড়ের ওপারে বৌটির কাছে ঠেসে চালিয়ে দিলে। কিন্তু সেও বাগ্‌দিপাড়ার বৌ, বেগতিক বুঝে সে এক মরীয়া চীৎকার ছেড়ে দৌড়ে বেশি জঙ্গলের দিকে পালালো। সেই কাঁটাবনের মধ্যে ঘোড়া চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং ফিরতেই হোল প্রসন্ন চক্কত্তিকে। বাগ্‌দিপাড়ার বৌ-ঝি এমন সুঠাম দেখতে কেন যে হয়! ওদের মধ্যে দু'একটা যা চোখে পড়ে এক এক সময়! না সত্যি, ভদ্রলোকের মধ্যে অমন গড়ন-পিটন—হঁ্যা, ঢাকের কাছে টেমটেমি!

বড়সাহেব ছিহরি সর্দারকে বললে—টোমার মতলব কি আছে?

—নীল মোরা আর বোনবো না সায়েব। মোদের মেরেই ফেলুন আর যে সাজাই ছান।

—ইহার কারণ কি আছে?

—কারণ কি বলবো, মোদের ঘরে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই ঐ

নীলির জন্যি। মা কালীর দিব্যি নিয়ে মোরা বলিচি, নীল আর বোনবো না!

—কি পাইলে নীল বুনিটে ইচ্ছা আছে?

—নীল আর বোনবো না, ধান করবো। যত ধানের জমিতি আপনাদের আমীন গিয়ে দাগ মেরে আসবে, মোরা ধান বুনতি পারিনে। আপনারা নিজেদের জমিতে লাঙ্গল গরু কিনে নীলের চাষ করো—কেউ আপত্য করবে না। প্রজার জমি জোর করে বেদখল করে নীল করবা কেন সায়েব?

—টোমারে পাঁচশো টাকা বকশিশ ডিবো। তুমি নীল বুনিটে বাধা দিও না। প্রজা হাট করিয়া ডাও।

—মাপ করবেন সায়েব। মোর একার কথায় কিছু হবে না। মুই আপনারে বলচি শুনুন, তেরোখানা গাঁয়ের লোক একস্তার হয়ে জোট পেকিয়েচে। ভবানীপুর, নাটাবেড়ে, হুদো-মানিককোলির নীলকুঠির রেয়েতেরাও জোট পেকিয়েচে। হাওয়া এসেচে পূবদেশ থেকে আর দক্ষিণ থেকে।

বড়সাহেব এ সমস্ত সংবাদ জানেন। সেদিনকার সেই অভিযানের পর তাই তিনি আজ ছিহরি সর্দারকে কুঠিতে ডেকেছিলেন অনেক কিছু আশ্বাস দিয়ে। ছিহরি এ রকম বেঁকে দাঁড়াবে তা বড়সাহেব ভাবেন নি।

তবু বললেন—টুমি আমার কাছে চলিয়া আসিবে। চেষ্টা করিয়া ডেখো। অনেক টাকা পাইবে। কাছারিতে চাকুরি করিতে চাও?

—না সায়েব। মোরা সাত পুরুষ কখনো চাকরি করি নি। আর আপনাদের এট্টা কথা বলি সায়েব—মুই একা এ ঝড় সামলাতি পারবো না। জেলা জুড়ে ঝড় উঠেছে, একা ছিহরি সর্দার কি করবে? আপনি বুঝে গ্যাখো সায়েব—একা মোরে দোষ দিও না। মুই কুঠির অনেক নুন খেইচি—তাই সব কথা খুলে বললাম।

ডেভিড্ সাহেবকে ডেকে বড়সাহেব বললে· I say, David, this man swims in shallow water. Let him go safely out and see that no harm is done to him. Not worth the trouble.

সেদিন সন্ধ্যার পরে নীলকুঠিতে একটি গুপ্ত বৈঠক আহূত হোলো।

অনেক খবর এনে দিয়েচে নীলকুঠির চরের দল। জেলার প্রজাবর্গ ক্ষেপে উঠেচে, তারা নীলের দাদন আর নেবে না। সতেরোটা নীলকুঠি বিপন্ন। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের সভা হচ্চে, পঞ্চায়েৎ বৈঠক বসচে। কোনো কোনো মৌজায় নীলের জমি ভেঙে প্রজারা ডাঁটাশাক আর তিল বুনেচে—এ খবরও পাওয়া গিয়েচে। বৈঠকে ছিলেন কাছাকাছি নীলকুঠির কয়েকজন সাহেব ম্যানেজার, এ কুঠির শিপ্‌টন্ আর ডেভিড্। কোনো গোপনীয় ও জরুরী বৈঠকে ওরা কোনো নেটিভকে ডাকে না। ম্যালিসন্ সাহেব বলেচে—No native need be called, we shall make our decision known to them if necessary,

কোল্ডওয়েল্ সাহেব বললে—ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরো বন্দুকের জন্যে বলো। এ সময়ে বেশী আগ্নেয়াস্ত্র রাখা উচিত প্রত্যেক কুঠিতে অনেক বেশি করে।

কোল্ডওয়েল্ ভবানীপুর নীলকুঠির অতি দুর্দান্ত ম্যানেজার। প্রজার জমি বেদখল করবার অমন নিপুণ ওস্তাদ আর নেই। খুন এবং বেপরোয়া কাজে ওর জুড়ি মেলা ভার। তবে কিছুদিন আগে ওর মেম চলে গিয়েচে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে, তার কোনো পাত্তাই নেই, সেজন্য ওর মন ভালো নয়।

শিপ্‌টন্ সাহেব বললে—These blooming native leaders should be shot like pigs

কোল্ডওয়েল্ বললে—I say, you can go on with your pig sticking afterwards. Now decide what we should do with our Impression Registers. That is why we have met to-day.

এই সময়ে শ্রীরাম মুচি বেয়ারা শেরির বোতল ও অনেকগুলো ডিক্যাণ্টার টেতে সাজিয়ে এনে ওদের সামনে রেখে দিলে।

কোল্ডওয়েল্ বললে—No sherry for me. I will have a peg of neat brandy. Now, Shipton, old boy, let us see how you keep your Impression Registers. This man of your is reliable?

Now-a-days. walls have ears, you see!

শিপ্‌টন্‌ শ্রীরামের দিকে চেয়ে বললে—Oh, he is all right.

দাদন খাতা নীলকুঠির অতি দরকারী দলিল। সমস্ত প্রজার টিপসই নিয়ে অনেক যত্নে এই খাতা তৈরি করা হয়। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট এসে এই দাদন খাতা পরীক্ষা করে থাকেন। অধিকাংশ কুঠিতে দাদন খাতা দু'খাতা করে রাখা থাকে, ম্যাজিস্ট্রেটকে আসল খাতাখানা দেখানো হয়।

শিপ্‌টন্‌ দাদন খাতা পূর্বেই আনিয়ে রেখেছিল টেবিলে, খুলে সবাইকে দেখালে।

ম্যালিসন্‌ বললে—This is your original Register?

—Yes. The other one is in the office. This I keep always under lock and key.

—Sure. You have got this weeks Englishman?

—Sure I have.

কোল্ডওয়েল্‌ বললে—It is funny, a deputation waited on the Lieutenant Governor the other day. The blooming old fellow has given them a benediction.

শিপ্‌টন্‌ বললে—As he always does, the old padre!

তারপর খুব জোর পরামর্শ হোলো সাহেবদের। পরামর্শের প্রধান ব্যাপার হোলো, প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েচে—সাহেবদের নীলকুঠি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটা। হোলে স্ত্রীলোক ও শিশুদের চুয়াডাঙ্গার বড় কুঠিতে রাখা হবে, না কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হবে।

শিপ্‌টন বললে—I don't think the beggars would dare as much, I will keep them here all right.

কোল্ডওয়েল্‌ বললে—Please yourself, old boy. You are the same bull-headed Johnny Shipton as ever. Pass me a glass of sherry Mallison, will you?

ম্যালিসন্ ভুরু কুঁচকে হেসে বললে—Funny, is it not? You said you would have to do nothing with sherry, did you not?

—Sure I did. I was feeling out of sorts with the worries and troubles and also with the long ride through drenching rain. বেয়ারা, ইধারে আইসো। লেবো আনিটে পারিবে?

শিপ্‌টন্ শ্রীরাম মুচির দিকে চেয়ে বললে—বাগান হইটে লেবো লইয়া আসিবে সায়েবের জন্য। এক ডজন, দশটা আর দুইটা, লেবো লইয়া আসিবে, বুঝিলে?

—হাঁ, সায়েব।

শ্রীরাম মুচি চলে গেলে সাহেবদের আরো কিছুক্ষণ পরামর্শ চললো। ঠিক হোলো চুয়াডাঙ্গার বড় কুঠির ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠানো হবে কাল সকালেই। আগ্নেয়াস্ত্র সেখানে কি পরিমাণে আছে। সকল কুঠির মেম ও শিশুদের সেখানে পাঠানো ঠিক হয়েচে, সে কথা জানিয়ে দিতে হবে—সেজন্যে যেন বড় কুঠির ম্যানেজার তৈরি থাকে।

ম্যালিসন্ শিপ্‌টন্‌কে বললে—You oughtn't to be alone at present.

শিপ্‌টন্ মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললে—What do yau mean? Alone? Why, haven't I my own men? I must fight this out by myself. Leave everything to me,

—Well, all right then

সেদিন রাত্রে সায়েবরা সকলেই কুঠিতে থাকলো। অন্য সময় হোলে চলে যেতো যে যার ঘোড়ায় চড়ে—কিন্তু এসময় ওরা সাহস করলে না একা একা যেতে।

শেষরাত্রে খবর এল রামনগরের কুঠি লুঠ করতে এসেচিল বিদ্রোহী প্রজার দল। বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়াতে না পেরে হটে গিয়েচে। রামনগরের কুঠি এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, তার ম্যানেজার অ্যানড্রু সায়েব কত মেয়ের যে সতীত্ব নষ্ট করেচে তার ঠিক নেই। স্বজাতি মহলেও সেজন্যে তাকে

অনেকে সুনজরে দেখে না। ম্যালিসন্ শুনে মুখ বিকৃত করে ভুরু কুঁচকে বললে —Oh, the old beggar !

শিপ্‌টনের দিকে তাকিয়ে বললে—You don't see anything significant in that ?

শিপ্‌টন্ বললে— I don't see what you mean, I cannot carry on this indigo business here without my men, without that wily old dewan to help us, you see ? They will not fail me at least, I know.

—Very kind of them, if they dont.

সাহেবরা ছোট-হাজারি খেলে বড় অদ্ভুত ধরণের। এক এক কাঁসি পান্তা ভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাত্রের টেবিলের ঠাণ্ডা হ্যাম। একটা করে আস্ত শসা জন পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সর্ষের তেলে ভাজা। বহুদিন বাংলা দেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরই আহারবিহার এদেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েচে। ওরা আম-কাঁটালের রস দিয়ে ভাত খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মেশে, অনেককে ঘরেও রাখে। ওদের দেখে বিলেত থেকে নবাগত বন্ধু-বান্ধবেরা মুখ বেঁকিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—'Gone native !' ওরা গ্রাহ্যও করে না।

বেলা বাড়লে সাহেবরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। দিন চারেকের মধ্যে সংবাদ এল, আশপাশের কুঠির সব সাহেব স্ত্রীপুত্রদের সরিয়ে দিয়েচে চুয়াডাঙ্গার কুঠিতে অথবা কলকাতায়। দেওয়ান রাজারাম সর্বদা ঘোড়ায় করে কুঠির চারিদিকের গ্রামে বেড়িয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনিই একদিন সন্ধান পেলেন আজ সাতখানা গ্রামের লোক একত্র হয়ে নীলকুঠি লুঠ করতে আসবে গভীর রাত্রে। খবরটা তাঁকে দিলে নবু গাজি। একসময়ে সে বড়সাহেবের কাছ থেকে সুবিচার পেয়েছিল, সেটা সে বড় মনে রেখেছিল। বললে— দেওয়ানবাবু, আর যে সায়েবের যা খুশি হোক গে, এ সায়েব লোকটা মন্দ নয়।

এর কিছু না হয়—

দেওয়ান সাহেবদের বলে লোকজন তৈরি করে রাখলেন। দুই সাহেব বন্দুক নিয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। থানায় কোনো সংবাদ দিতে বড়সাহেবের হুকুম ছিল না। সুতরাং পুলিস আসে নি।

রাত দশটার পরে ইছামতীর ধারের পথে একটা হল্লা উঠলো। সাহেবরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলো। দেওয়ান রাজারাম দাঁড়িয়েছিলেন বালাখানা ও সমাধিস্থানের মাঝখানের ঝাউগাছের শ্রেণীর অন্ধকারে, সঙ্গে ছিল সড়কি-হাতে রসিক মল্লিক ও তার দলবল।

রসিক মল্লিক বললে—দোহাই দেওয়ান মশাই, এবার আমারে একটু দেখতি ছান। ওদের একটু সাম্বপানা করি। ওদের চুলকুনি মাঠো যদি না করি এবার, তবে মোর বাবার নাম তিরভঙ্গ মল্লিক নয়—

—দূর ব্যাটা, থাম্। কতকগুলো মানুষ খুন হোলেই কি হয়? অন্য জায়গায় হলি চলতো, এ যে কুঠির বুকির ওপরে। পুলিস এসে তদন্ত করলি তখন মুশকিল।

—লাস রাতারাতি গুম্ করে ফেলে দেবানি। সে ভারটা মোর ওপর দেবেন দেওয়ানমশাই—

—আচ্ছা, থাম্ এখন—যখন হুকুম দেবো, তার আগে সড়কি চালাবি নে—

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত। রাজারামের মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব। কখনো তাঁর হয় না। ঝাউগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েচে মাটির রাস্তার বুকে। তিলু বিলু নিলুর বিয়ে দিয়েচেন, ভাগ্নের মুখ দেখেচেন। জীবনের সব দায়িত্ব শেষ করেচেন। আজ যদি এই দাঙ্গায় এ পথের ওপর তার দেহ সড়কি-বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কোনো অপূর্ণ সাধ থাকবে তাঁর মনে? কিছু না। জগদম্বার ব্যবস্থা তিনি যথেষ্ট করেচেন। তালুক, বিষয়, ধানীজমি যা আছে, একটা বড় সংসার চলে। জমিদারির আয় বছরে—তা তিনশো-চারশো টাকা। রাজার হাল। নির্ভাবনায় মরতে পারবেন তিনি। সাহেবদের এতটুকু বিপদ আসতে দেবেন না। অনেক দিনের নুন খেয়েচেন।

বললেন—রসিক, ব্যাটা তৈরি থাক। তবে খুনটা, বুঝলি নে—যখন গায়ের ওপর এসে পড়বে।

ঝাউতলার অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার জালবুনুনি পথে অনেক লোকের একটা দল এগিয়ে আসচে. ওদের হাতে মশাল—সড়কি ও লাঠিও দেখা যাচ্ছে। রসিক হাঁকার দিয়ে বললে—এগিয়ে আয় ব্যাটারা—সামনে এগিয়ে আয়—তোদের ভুঁড়ি ফাঁসাই—

কতকগুলো লোক এগিয়ে এসে বললে—কেডা? রসিকদাদা?

—দাদা না, তোদের বাবা—

—অমন কথা বলতি নেই—ছিঃ, এগিয়ে এসো দাদা—

রসিককে হঠাৎ দেওয়ান রাজারাম আর পাশে দেখতে পেলেন না, ইতিমধ্যে সে কখন অদৃশ্য হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারে। অল্পক্ষণ পরে দেখলেন সামনের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছুটচে—আর ওদের মাঝখানে চর্কির মত কি একটা ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্চে, কিসের একটা ফলকে দু'চারবার চকচকে জ্যোৎস্না খেলে গেল! কি ব্যাপার? রসিক মল্লিক নাকি? ইস্! করে কি?

খুব একটা হল্লা উঠলো কুঠির হাতার বাইরে। তারপরেই সব নিস্তব্ধ। দূরে শব্দ মিলিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। সাহেবদের ঘোড়ার শব্দ একবার যেন রাজারাম শুনলেন বালাখানার উত্তরের পথে। এগিয়ে গেলেন রাজারাম। ঝাউতলার পথে, এখানে ওখানে লোক কি ঘাপ্‌টি মেরে আছে নাকি? না। ওগুলো কি?

মানুষ মরে পড়ে আছে। এক, দুই, তিন চার, পাঁচ! রসিক ব্যাটা এ করেচে কি! সব সড়কির কোপ। শেষ হয়ে গিয়েচে সব ক'টা।

—ও রসিক? রসিক?

রাজারামের মাথা ঝিম-ঝিম করে উঠলো। হাঙ্গামা বাধিয়ে গিয়েচে রসিক মল্লিক। এই সব লাস এখনই গুম করে ফেলতে হবে। সায়েবদের একবার জানানো দরকার।

আধঘণ্টা পরে। গভীর পরামর্শ হচ্চে দেওয়ান ও ছোটসাহেবের মধ্যে।

ডেভিড্ বললে—পাঁচটা লাস? লুকুবে কনে? সেটা বোঝো আগে। বাঁওড়ের জলে হবে না। বাঁধালের মুখে লাস বাধবে এসে।

—তা নয়, সায়েব। কোথাও ভাসাবো না। হীরে ডোম আর তার শালা কালুকে আপনি হুকুম দিন। আমি এক ব্যবস্থা ঠিক করিচি—

—কি?

—আগে করে আসি। তারপর এত্তেলা দেবো। আপনি ওদের হুকুম দিন। রাত থাকতি থাকতি কাজ সারতি হবে। ভোরের আগে সব শেষ করতি হবে। রক্ত থাকলি ধুয়ে ফেলতি হবে পথের ওপর। রসিক ব্যাটাকে কিছু জরিমানা করে দেবেন কাল।

সেই রাত্রেই সব কাজ মিটিয়ে ভোরের আগে রাজারাম বাড়ি এসে শুয়ে রইলেন। জগদম্বা জিগোস করলেন—বাবা, এত কাজের ভিড? রাত তো শেষ হতি চললো—

রাজারাম বললেন—হিসেব-নিকেশের কাজ চলচে কিনা। খাতাপত্তরের ব্যাপার। এ কি সহজে মেটে?

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে নিয়ে পাড়ায় মাছ খুঁজতে বার হয়েছিলেন। খোকা বেশ সুন্দর ফুটফুটে দেখতে. অনেক কথা বলে, বেশ টরটরে।

ভবানী খোকাকে বলেন—ও খোকন, মাছ খাবি?

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে—মাছ।

—মাছ?

—মাছ।

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যদু জেলে মাছ নিয়ে আসছে। যদু তাঁকে দেখে প্রণাম করে বললে—মাছ নেবেন গা?

—কি মাছ?

—একটা ভেটকি মাছ আছে, সের দেড়েক হবে।

—কত দাম দেবো ?

—তিন আনা দেবেন।

—বড্ড বেশি হয়ে গেল !

যদু জেলে কাঁধ থেকে বোঠেখানা নামিয়ে বললে—বাবু, বাজারডা কি পড়েছে ভেবে দেখুন দিকি। ছেলেবেলায় আউশ চালের পালি ছেল দু'পয়সা। তার থেকে উঠলো এক আনা। এখন ছ'পয়সা। মোর সংসারে ছ'টি প্রাণী খেতি। এককাঠা চালির কম এক বেলা হয় না। দু' বেলা তিন আনা চালেরই দাম যদি দিই, তবে মুন তেল, তরকারি, কাপড়, কবিরাজ, এসোজন, বোসোজন কোথেকে করি ? সংসার আর চালাবার জো নেই জামাইঠাকুর, আমাদের মত গরীব লোকের আর চলবে না—

ভবানী বাঁড়ুয্যে দ্বিরুক্তি না করে মাছটা হাতে নিয়ে ফিরলেন বাড়ির দিকে। বিলু ও নিলু আগে ছুটে এল। বিলু স্বামীর হাত থেকে মাছটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—কি মাছ ? ভেটকি না চিতল ? বাঃ—

নিলু বললে—চমৎকার মাছটা। ও খোকা, মাছ খাবি? আয় আমার কোলে—

খোকা বাবার কোলেই এঁটে রইল। বললে—বাবা—বাবা—

সে বাবাকে বড্ড ভালোবাসে। বাবার কোলে সব সময় উঠতে পারে না বলে বাবার কোলের প্রতি তার একটি রহস্যময় আকর্ষণ বিদ্যমান। বিলু চোখ পাকিয়ে বললে—আসবি নে ?

—না।

—থাক, তোর বাবা যেন তোরে খেতি দ্যায় ভাত রেঁধে।

—বাবা।

—মাছ খাবি নে তো ?

—খাই।

—খাই তো আয়—

খোকা আবেদনের সুরে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই দ্যাখো—

অর্থাৎ আমায় জোর করে নিয়ে যাচ্চে তোমার কোল থেকে। ভবানী জানেন খোকা এই কথাটি আজ অল্পদিন হোলো শিখেচে, এ কথাটা বড্ড ব্যবহার করে। বললেন—থাক আমার কাছে, ওকে একটু বেড়িয়ে আনি মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে।

নিলু বললে—মাছটার কি করবো বলে যান—

—যা হয় কোরো। তিলু কোথায়?

—বড়ি দিতি গিয়েচে বড়দার বাড়ির ছাদে। আপনার বাড়ির তো আর ছাদ নেই, বড়ি দেবে কোথায়? কবে কোঠা করবেন।

—যাও না দাদাকে গিয়ে বলো না, কুলীন কুমারী উদ্ধার করেচি, কিছু টাকা বার করতে লোহার সিন্দুক থেকে। দোতলা কোঠা তুলে ফেলচি। বিয়ে যদি না করতাম, থাকতে থুবড়ি হয়ে, কে বিয়ে করতো?

—এর চেয়ে আমাদের দাদা গলায় কলসী বেঁধে ইছামতীর জলে ডুবিয়ে দিলি পারতেন। কি বিয়েই দিয়েচেন—আগা মরি মরি! বুড়ো বর, তিন কাল গিয়েচে, এককালে ঠেকেচে—

—বিয়ে দিলেই পারতেন তো যুবো বর ধরে। তবে থুবড়ি হয়ে ঘরে ছিলে কেন এতকাল? উদ্ধার হোলেই তো পারতে। আমি পায়ে ধরে তোমাদের সাধতে গিয়েছিলাম?

—কান মলে দেবো আপনার—

বলেই নিলু ক্ষিপ্রবেগে হাত বাড়িয়ে স্বামীর কানটার অস্বস্তিকর সান্নিধ্যে নিয়ে এসে হাজির করতেই বিলু ধমক দিয়ে বলে—এই! কি হচ্চে?

নিলু ফিক ক'রে হেসে মাছটা নিয়ে ছুটে পালালো। ভবানী খোকাকে নিয়ে পথে বার হয়েই বললেন—কোথায় যাচ্চি বল তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—যাই -

—কোথায়?

—মাছ।

মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে যাবার পথে একটা বাবলাগাছের ওপর লতায়

ঝোপ, নিবিড় ছায়া সে স্থানটিতে, বাবলাগাছের ডালে কি একটা পাখী বাসা বেঁধেচে। ভবানী গাছতলার ছায়ায় গিয়ে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

—ঐ ছাখ খোকা, পাখী—

খোকা বলে—পাখী—

—পাখী নিবি?

—পাখী—

—খুব ভালো। তোকে দেবো।

খোকা কি সুন্দর হাসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে। না, ভবানীর খুব ভালো লাগে এই নিষ্পাপ, সরল শিশুর সঙ্গ। এর মুখের হাসিতে ভবানী খুব বড় কি এক জিনিস দেখতে পান।

—নিবি খোকা?

—হ্যাঁ—

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে। ভবানীর খুব ভালো লাগলো এই 'হ্যাঁ' বলা ওর। এই প্রথম ওর মুখে এই কথা শুনলেন। তাঁর কানে প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের ন্যায় ঋদ্ধিমান ও সুন্দর।

—কটা নিবি?

—আক্‌খানা—

—বেশ একখানাই দেবো। নিবি?

খোকা ঘাড় দুলিয়ে বলে—হ্যাঁ।

পরক্ষণেই বলে—বাবা।

—কি?

—মা—

—তার মানে?

—বাগ্নি—

—এই তো এলি বাড়ী থেকে। মা এখন বাড়ী নেই।

খোকা যে ক'টি মাত্র শব্দ শিখেচে তার মধ্যে একটা হোলো 'ওখেনে'। এই কথাটা কারণে অকারণে সে প্রয়োগ ক'রে থাকে। সম্প্রতি সে হাত দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বললে—ওখেনে—

—ওখেনে নেই। কোথাও নেই।

—ওখেনে—

—না, চল বেড়িয়ে আসি—কোল থেকে নামবি? হাঁটবি?

—আঁটি—

খোকা ভবানীর আগে আগে বেশ গুটুগুটু ক'রে হাঁটতে লাগলো। খানিকটা গিয়ে আর যায় না। ভয়ের স্বরে সামনের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—ছিয়াল!

—কই?

শিয়াল নয়, একটা বড় শামুক রাস্তা পার হচ্চে। ভবানী খোকার হাত ধরে এগিয়ে চললেন—চলো, ও কিছু নয়। খোকা তখনও নড়ে না, হাত দুটো তুলে দিলে কোলে উঠবে বলে। ভবানী বললেন—না, চলো, ওতে ভয় কি? এগিয়ে চলো—

খোকার ভাবটা হোলো ভক্তের অভিযোগহীন আত্মসমর্পণের মত। সে বাবার হাত ধরে এগিয়ে চললো শামুকটাকে ডিঙিয়ে, ভয়ে ভয়ে যদিও, তবুও নির্ভরতার সঙ্গে। ভবানী ভাবলেন—আমরাও যদি ভগবানের ওপর এই শিশুর মত নির্ভরশীল হতে পারতাম! কত কথা শেখায় এই খোকা তাঁকে। বৈষয়িক লোকদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে তাঁর যেন ভালো লাগে না আর।

এক মহান শিল্পীর বিরাট প্রতিভার অবদান এই শিশু। ওপরের দিকে চেয়ে বিরাট নক্ষত্রলোক দেখে তিনি কত সময় মুগ্ধ হয়ে গিয়েচেন। সেদিকে চেয়ে থাকাও একটি নীরব ও অকপট উপাসনা। পশ্চিমে তাঁর গুরুর আশ্রমে থাকবার সময় চৈতন্যভারতী মহারাজ কতবার আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন—ঐ দেখ সেই বিরাট অক্ষয় পুরুষ—

অগ্নির্মূর্দ্ধা চাক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগবৃত্তাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা —

অগ্নি যার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু, দিকসকল কর্ণ, বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় পৃথিবী—ইনিই সমুদয় প্রাণীর অন্তরাত্মা।

তিনিই আকাশ দেখতে শিখিয়েছিলেন। তিনি চক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে গিয়েচেন। তিনি শিখিয়েছিলেন যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বার হয় তেমনি সেই অক্ষর পুরুষ থেকে অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় এবং তাঁতেই আবার বিলীন হয়

উপনিষদের সেই অমর বাণী।

এই শিশু সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ, সুতরাং সেই অগ্নিই নয় কি? তিনি নিজেও তাই নয় কি? এই বনঝোপ, এই পাখীও তাই নয় কি?

এই নিষ্পাপ শিশুর হাসি ও অর্থহীন কথা অন্য এক জগতের সন্ধান নিয়ে আসে তাঁর কাছে। এই শিশু যেমন ভালোবাসলে তিনি খুশি হন, তিনিও তো ভগবানের সন্তান, তিনি যদি ভগবানকে ভালোবাসেন, ভগবানও কি তাঁর মত খুশি হন না?

তিনি বহুদিন চলে এসেচেন সাধুসঙ্গ ছেড়ে, সেখানে অমৃতনিস্যন্দিনী ভাগবতী কথা ব্যতীত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ ছিল না, অসীম তারাভরা যামিনীর বিভিন্ন যামগুলি ব্যেপে, বিনিদ্র জ্ঞানী ও ভক্ত অপ্রমত্ত মন সংলগ্ন করে রাখতেন বিশ্বদেবের চরণকমলে। হিমালয়ের বনভূমির প্রতি বৃক্ষপত্রে যুগযুগান্তব্যাপী সে উপাসনার রেখা আঁকা আছে, আঁকা আছে তুষারধারার রজতপটে। তাঁদের অন্তর্মুখী মনের মৌন প্রশান্তির মধ্যে যে নিভৃত বনকুঞ্জ, সেখানে সেই পরম সুন্দর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেমার্ঘ্য নিবেদিত হোতো আকুল আবেগের সুরভিতে।

আরও উচ্চ স্তরের ভক্তদের স্বচক্ষে তিনি দেখেন নি, কিন্তু তাঁদের সন্ধান নেমে

এসেচে তুষার-স্রোত বেয়ে বেয়ে উচ্চতর পর্বত শিখর থেকে, সে গম্ভীর সাধন-গুহার গহনে রথনাভির মত অবিচলিত ও সংযত আত্মা সকল অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেচেন জ্ঞানের শক্তিতে, প্রেমের শক্তিতে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিশ্বাস করেন তাঁরা আছেন। তিনি সাধুদের মুখে শুনেচেন। তাঁরা আছেন বলেই এই জুয়াচুরি, শঠতা, মিথ্যাচার, অর্থাসক্তি ভরা পৃথিবীতে আজও পাপপুণ্যের জ্ঞান আছে, ভগবানের নাম বজায় আছে, চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, বনকুসুমের গন্ধে অন্ধকার সুবাসিত হয়।

এই সব পাড়াগাঁয়ে এসে তিনি দেখচেন সবাই জমিজমা, টাকা, খাজনা, প্রজাপীড়ন, পরচর্চা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কখনো ভগবানের কথা তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না, কেউ কোনোদিন সৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করে না। ভগবান সম্বন্ধে এরা একেবারে অজ্ঞ। একটা আজগুবী, অবাস্তব বস্তুকে ভগবানের সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করে কিংবা ভয়ে কাঁপে, কেবলই হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, এ দাও, ও দাও—সেই পরমদেবতার মহান সত্তাকে, তাঁর অবিচল করুণাকে জানবার চেষ্টাও করে না কোনদিন। কার বৌ কবে ঘোমটা খুলে পথ দিয়ে চলেচে, কোন্ ষোড়শী মেয়ে কার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলেচে—এই সব এদের আলোচনা। এমন একটা ভালো লোক নেই, যার সঙ্গে বসে দুটো কথা বলা যায়—কেবল রামকানাই কবিরাজ আর বটতলার সেই সন্ন্যাসিনী ছাড়া। ওদের সঙ্গে ভগবানের কথা বলে সুখ পাওয়া যায়, ওরা তা শুনতেও ভালোবাসে। আর কেউ না এ গ্রামে। কখনো কোনো দেশ দেখে নি, কূপমণ্ডূকের দর্শন ও জীবনবাদ কি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েচে এদের হাব-ভাবে, আচরণে, চিন্তায়, কার্যে।

এই শিশুর সঙ্গ ওদের চেয়ে কত ভালো, এ মিথ্যা বলতে জানে না, বিষয়ের প্রসঙ্গ ওঠাবে না। পরনিন্দা পরচর্চা এর নেই, একটি সরল ও অকপট আত্মা ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এসে সবেমাত্র ঢুকেচে কোন্ অনন্তলোক থেকে, পৃথিবীর কলুষ এখনো যাকে স্পর্শ করে নি। কত দুর্লভ এ... সঙ্গ৷ সাধারণ লোকে কি জানে?

রাস্তার দু'দিকে বেশ বনঝোপ। শিশু গুটগুট করে দিব্যি হেঁটে চলেচে, এক জায়গায় আকাশের দিকে চেয়ে কি একটা বললে আপনার মনে।

ভবানী বললেন—কি রে খোকা, কি বলচিস ?

—আচিনি।

—কি আসিনি রে ? কি আসবে ?

—চান।

—চাঁদ এখন কি আসে বাবা ? সে আসবে সেই রাত্তিরে। চলো।

—খোকা ভয়ের স্বরে বললে—ছিয়াল।

—না, কোনো ভয় নেই—শেয়াল নেই।

—ও বাবা !

—কি ?

—মা—

—চলো যাবো। মা এখন বাড়ী নেই, আসুক। আমরা যেখানে যাচ্চি, সেখানে কি খাবি রে ?

—মুকি।

—বেশ চলো—কি খাবি ?

—মুকি।

মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জুটেচে, ভবানীকে দেখে ফণি চক্কত্তি বলে উঠলেন—আরে এসো বাবাজী, সকালবেলাই যে ! খোকনকে নিয়ে বেরিয়েচ বুঝি ? একহাত পাশা খেলা যাক এসো—

ভবানী হাসতে হাসতে বললেন—বেশিক্ষণ বসব না কাকা। আচ্ছা, খেলি এক হাত। খোকা বড্ড দুষ্টুমি করবে যে ! ও কি খেলতে দেবে ?

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—খোকাকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্চি দাঁড়াও, ও মুংলি—মুংলি—

—না থাক, কাকা। ও অন্য কোথাও থাকতে চাইবে না। কাঁদবে।

চণ্ডীমণ্ডপ হচ্চে পল্লীগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এইখানেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এ সব পাড়াগাঁয়ে আদৌ নেই, ওটা

বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। প্রত্যেক গৃহস্থের একখানা করে চণ্ডীমণ্ডপ আছে। সকাল থেকে সেখানে আড্ডা বসে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারাদিনে অন্ততঃ আধসের তামাক যোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই। গ্রামের মধ্যে চন্দ্র চাটুয্যে ফণি চক্কত্তি ও মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপই প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, রাজারাম রায় যদিও সম্পন্ন গৃহস্থ, তিনি নীলকুঠির কাজে অধিকাংশ সময়েই বাড়ীর বাইরে থাকেন তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা বসে না।

এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবন-সংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঁঠালের বাগান আছে, লাউ কুমড়োর মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে, ছ'মাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় বাখারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাখারির দাগ গুনে মাসকাবারি দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই সব অলস ধারাই লোক বেছে নিয়েছে। আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লীবাংলার জীবনধারার মধ্যে শেওলার দাম আর ঝাঁজি জমে উঠে জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের বক্ষপটে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।

ভবানী এসব লক্ষ্য করেছেন অনেকদিন থেকেই। এখানে বিবাহ করার পর থেকেই। তিনি পরিচিত ছিলেন না এমন জীবনের সঙ্গে। জানতেন না বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মানুষের জীবনধারাকে। চিরকাল তিনি পাহাড়ে প্রান্তরে জাহ্নবীর স্রোতোবেগের সঙ্গে, পাহাড়ী ঝর্ণার প্রাণচঞ্চল গতিবেগের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের আনন্দে কাল কাটিয়েচেন—পড়ে গিয়েচেন ধরা এখানে এসে বিবাহ করে। বিশেষ করে এই কূপমণ্ডূকদের দলে মিশে।

এদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্ধকারে আবৃত এদের সারাটা জীবনপথ। তার ওদিকে কি আছে, কখনও দেখার চেষ্টাও করে না।

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—ও খোকন তোমার নাম কি?

খোকা বিস্ময় ও ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে মহাদেব মুখুয্যের দিকে বড় বড় চোখ তুলে চাইলে। কোনো কথা বললে না।

—কি নাম খোকন?

—খোকন।

—খোকন? বেশ নাম। বাঃ, ওহে, এবার হাতটা আমার—দানটা কি পড়লো?

কিছুক্ষণ খেলা চলবার পরে সকলের জন্যে মুড়ি ও নারকোলকোরা এল বাড়ীর মধ্যে থেকে। খাবার খেয়ে আবার সকলে দ্বিগুন উৎসাহে খেলায় মাতলো। এমন ভাবে খেলা করে এরা, যেন সেটাই এদের জীবনের লক্ষ্য।

এমন সময় সত্যম্বর চাটুয্যের জামাই শ্রীনাথ ওদের চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকলো। সে কলকাতায় চাকুরি করে, সুতরাং এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। এ গ্রামের কোনো ব্রাহ্মণই এ পর্যন্ত কলকাতা দেখেন নি। এমন কি স্বয়ং দেওয়ান রাজারাম পর্যন্ত এই দলের। কেন-না কোনো দরকার হয় না কলকাতা যাওয়ার, কেন যাবেন তাঁরা একটি অজানা শহরের সাত অসুবিধা ও নানা কাল্পনিক বিপদের মাঝখানে! ছেলেদের লেখাপড়ার বালাই নেই, নিজেদের জীবিকার্জনের জন্যে পরের দোরে ধন্না দিতে হয় না।

ফণি চক্কত্তি বললেন—এসো বাবাজি, কলকেতার কি খবর?

শ্রীনাথ অনেক আজগুবী খবর মাঝে মাঝে এনে দেয় এ গাঁয়ে। বাইরের জগতের খানিকটা হাওয়া ঢোকে এরই বর্ণনার বাতায়ন পথে। সম্প্রতি এখনি সে একটা আজগুবী খবর দিলে। বললে—মস্ত খবর হচ্চে, আমাদের বড়লাটকে একজন লোক খুন করেচে।

সকলে একসঙ্গে বলে উঠলো—খুন করলে? কে খুন করলে?

—একজন ওহাবি জাতীয় পাঠান।

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—আমাদের বড়লাট কে যেন ছিল?

—লাড মেও।

—লাড 'মেও ?

চণ্ডীমণ্ডপে পাশাখেলা আর জমলো না। লর্ড মেয়ো মরুন বা বাঁচুন তাতে এদের কোনো কিছু আসে-যায় না—এই নামটাই সবাই প্রথম শুনলো। তবে নতুন একটা যা-হয় ঘটলো এদের প্রাত্যহিক একঘেয়েমির মধ্যে—সেটাই পরম লাভ। শ্রীনাথ খুব সবিস্তারে কলকাতার গল্প করলে —আপিস আদালত কিভাবে বন্ধ হয়ে গেল সংবাদ আসা মাত্রই।

বেলা দুপুর ঘুরে গেল, খোকাকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ী ফিরতেই তিলুর বকুনি খেলেন।

—কি আক্কেল আপনার জিজ্ঞেস করি ? কোথায় ছিলেন খোকাকে নিয়ে দুপুর পজ্জন্ত! ও খিদেয় যে টা-টা করচে ? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

খোকা দু'হাত বাড়িয়ে বললে—মা, মা—

ভবানী বললেন—রাখো তোমার ওসব কথা। লাড মেও খুন হয়েছেন শুনেচ ?

—সে আবার কে গা ?

—বড়লাট। ভারতবর্ষের বড়লাট।

—কে খুন করলে ?

—একজন পাঠান।

—আহা কেন মারলে গো ? ভারী দুঃখু লাগে।

লর্ড মেয়ো খুন হবার কিছুদিন পরেই নীলকরদের বড় সংটের সময় এল। নীলকর সাহেবদের ঘন-ঘন বৈঠক বসতে লাগলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজের আরদালি পাঠিয়ে যখন তখন পরোয়ানা জারি করতে লাগলেন।

রাজারাম ঘোড়ায় করে যাচ্ছিলেন নীলকুঠির দিকে, রামকানাই কবিরাজ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, বললে—একটু দাঁড়াবেন দেওয়ানবাবু ?

রাজারাম ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কি ?

—একটু দাঁড়ান। একটা কথা শুনুন। আপনি আর এগোবেন না। কানসোনার বাগ্‌দিরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ষষ্ঠীতলার মাঠে। আপনাকে

মারবে, লাঠি নিয়ে তৈরী আছে। আমি জানি কথাটা তাই বললাম। অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্যি দাঁড়িয়ে আছি।

—কে কে আছে দলে?

—তা জানিনে বাবু। আমি গরীব লোক। কানে আমার কথা গেল, তাই বলি, অধর্ম করতি পারবো না। ভগবানের কাছে এর জবাব দিতি হবে তো একদিন? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে সাবধান করে দেবার ভার তিনিই দিয়েচেন আমার ওপর।

তবুও রাজারাম ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়েচেন দেখে রামকানাই কবিরাজ হাতজোড় করে বললে—দেওয়ানবাবু, আমার কথা শুনুন—বড্ড বিপদ আপনার। মোটে এগোবেন না—বাবু শুনুন—ও বাবু কথাটা—

ততক্ষণে রাজরাম অনেকদূরে এগিয়ে চলে গিয়েছেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, রামকানাই লোকটা মাথা-পাগলা নাকি? এত অপমান হোলো নীলকুঠির লোকের হাতে, তিনিই তার মূল--অথচ কি মাথাব্যথা ওর পড়েছিল তাঁকেই সাবধান করে দিতে? মিথ্যে কথা সব।

ষষ্ঠীতলার মাঠে তাঁর ঘোড়া পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ শুরু হোলো। মস্ত বড় একটি দল লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। রাজারাম দেখলেন এদের মধ্যে বাঁধালের দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্‌দির বড ছেলে হারু আর তার শালা নারান বড় সর্দার।

পলকে প্রলয় ঘটলো। একদল চেঁচিয়ে হেঁকে বললে—ও ব্যাটা, নাম এখানে। আজ তোরে আর ফিরে যেতি হবে না—

নারান বললে—ও ব্যাটা সাহেবের কুকুর—তোর মুণ্ডু নিয়ে আজ ষষ্ঠীতলার মাঠে ভাঁটা খেলবো দ্যাখ্—

অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—অত কথায় দরকার কি? ঘাড় ধরে নামা—নেমিয়ে নিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে জেঁকে বসে কাতানের কোপে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দে—

হারু বললে—তোরা সর্—মুই দেখি—মোর বাবারে ওই শালা ঠেঙিয়ে

মেরেল লেঠেল পেটিয়ে—

একজন বললে—তোর সেই রসিকবাবা কোথায়? তাকে ডাক—সে এসে তোকে বাঁচাক—যমালয়ে যে এখুনি যেতে হবে বাছাধন।

সাঁই করে একটা হাত-সড়কি রাজারামের বাঁ দিকের পাঁজরা ঘেঁষে চলে গেল। রাজারামের ঘোড়া ভয় পেয়ে ঘুরে না দাঁড়ালে সেই ধাক্কাতেই রাজারাম কাবার হয়েছিলেন। তাঁর মাথা তখন ঘুরচে, চিন্তার অবকাশ পাচ্চেন না, চোখে সর্ষের ফুল দেখচেন, নারকোল গাছে যেন ঝড় বাধচে, কি যেন সব হচ্চে তার চারদিকে। রামকানাই কবিরাজ গেল কোথায়? রামকানাই?

তাঁর মাথায় একটা লাঠির ঘা লাগলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো।

আবার তাঁর বাঁ দিকের পাঁজরে খুব ঠাণ্ডা তীক্ষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হোলো। কি হচ্চে তাঁর? এত জল কোথা থেকে আসচে? কে একজন যেন বললে—শালা, রামুর কথা মনে পড়ে?

রাজারাম হাত উঠিয়েচেন সামনের একজন লোকের লাঠি আটকাবার জন্যে। এত লোকের লাঠি তিনি ঠেকাবেন কি করে? এত জল এলো কোথা থেকে? অতি অল্পক্ষণের জন্যে একবার চেয়ে দেখলেন নিজের কাপড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের যেন বমির ভাব হোলো। খুব জ্বর হোলে যেমন মাথা ঘোরে, দেহ দুর্বল হয়ে বমির ভাব হয়, তেমনি। পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে।…

তিলুর সুন্দর খোকাটা দূর মাঠের ওপ্রান্তে বসে যেন আনমনে হাসচে। কেমন হাসে! রাজারাম আর কিছু জানেন না। চোখ বুজে এল।

অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এসেছে গোটা দুনিয়াটায়।…

রামকানাই কবিরাজের ভীত ও আকুল আবেদনে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা যখন লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে গেল ষষ্ঠীতলার মাঠে, তখন রাজারামের রক্তাপ্লুত দেহ ধুলোতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দেহে প্রাণ নেই।

বছর খানেক পরে।

রাজারামের খুন হওয়ার পর এ অঞ্চলে যে হৈ-চৈ হয়েছিল, দিনকতক তা

থেমে গিয়েচে। রাজারামের পরে জগদম্বা সহমরণে যাবার জন্য জিদ ধরেছিলেন, তিলু, বিলু ও নিলু অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি। ভেবে ভেবে কেমন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এ অবস্থায় খুব সেবা করেছিল তিন ননদে মিলে। গত ৺দুর্গোৎসবের পর। তিন দিনের মাত্র জ্বর ভোগ করে জগদম্বা কদমতলার শ্মশানে স্বামীর চিতার পাশে স্থান গ্রহণ করেচেন। নিঃসন্তান রাজারামের সমুদয় সম্পত্তির এখন তিলুর খোকাই উত্তরাধিকারী। গ্রামের সবাই এদের অনুরোধ করেছিল রাজারামের পৈতৃক ভিটেতে উঠে গিয়ে বাস করতে, কেন ভবানী বাঁড়ুযো রাজী হননি তিনিই জানেন।

অতএব রাজারাম প্রদত্ত সেই একটুকরো জমিতে, সেই খড়ের ঘরেই ভবানী এখনো বাস করচেন। অবশেষে একদিন তিলু স্বামীকে কথাটা বললে।

ভবানী বললেন—তিলু, তুমিও কেন এ অনুরোধ কর।

—কেন বলুন বুঝিয়ে? কেন বাস করবেন না আপনার নিজের শ্বশুরের ভিটেতে?

—না। আমার ছেলে ঐ সম্পত্তি নেবে না।

—সম্পত্তিও নেবে না?

—না, তিলু রাগ কোরো না, বহু লোকের ওপর অত্যাচারের ফলেঐ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে—আমি চাইনে আমর ছেলে ওই সম্পত্তির অন্ন খায়। শোনো তিলু, আমি অনেক ভালো লোকের সঙ্গ করেছিলাম। এইটুকু জেনেচি. বিলাসিতা যেখানে, বাড়তি যেখানে, সেখানেই পাপ, সেখানেই আবর্জনা. আত্মা সেখানে মলিন। চৈতন্যদেব কি আর সাধে রঘুনাথ দাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ভালো নাহি খাবে আর ভালো নাহি পরিবে!"

—আপনি যা ভালো বোঝেন।—

—আমি তোমাকে অনেকদিন বলেচি তো, আমি অন্য পথের পথিক। তোমার দাদার—কিছু মনে করো না—কাজকর্ম আমার পছন্দ ছিল না কোনোদিন। রামু বাগদিকে খুন করিয়েছিলেন উনিই। রামকানাই কবিরাজের ওপর অত্যাচার উনিই করেন। সেই রামকানাই কিন্তু তাঁকে বিপদের ইঙ্গিত

দেয়। ভবিতব্য, কানে যাবে কেন? যাক গে ওসব কথা। আমার খোকা যদি বাঁচে, সে অন্যভাবে জীবনযাপন করবে। নির্লোভ হবে। সরল, ধার্মিক, সত্যপরায়ণ হবে। যদি সে ভগবানকে জানতে চায়, তবে সরলতা ও দীনতার মধ্যে ওকে জীবনযাপন করতে হবে। মলিন, বিষয়াসক্ত মনে ভগবদ্দর্শন হয় না। আমি ওকে সেইভাবে মানুষ করবো।

—ও কি আপনার মত সন্নিসি হয়ে যাবে?

—তুমি জানো, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নি। আমার গুরুদেব মহারাজ (ভবানী যুক্তকরে প্রণাম করলেন) বলেছিলেন—বাচ্চা, তেরা আবি ভোগ হ্যায়। সন্ন্যাস দেন নি। তিনি আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন ছবির মত। তবে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সংসারে থেকেও আমি যেন ভগবানকে ভুলে না যাই। অসত্য পথে, লোভের পথে, পাপের পথে পা না দিই। শ্রীমদ্ভাগবতে যাকে বলেছে 'বিত্তশাঠ্য নো', অর্থাৎ বিষয়ের জন্যে জালজুয়োচুরি, তা কোনো দিন না করি! আমার ছেলেকে আমি সেই পথে পা দিতে এগিয়ে ঠেলে দেবো? তোমার দাদার সম্পত্তি ভোগ করলে তাই হবে।

—তবে কি হবে দাদার সম্পত্তি?

—কেন তুমি?

—আমার ছেলে নেবে না, আমি নেবো? আমাকে কি যে ভেবেচেন আপনি?

—তবে তোমার দুই বোন?

—তাদেরই বা কেন ঠেলে দেবেন বিষয়ের পথে?

—যদি তারা চায়?

—চাইলেও আপনি স্বামী, পরমগুরু তাদের। তারা নির্বুদ্ধি মেয়েমানুষ, আপনি তাদের বোঝাবেন না কেন?

—তা হয় না তিলু। তাদের ইচ্ছে যদি থাকে, তারা বড় হয়ে গিয়েচে, ভোগের ইচ্ছে যদি থাকে তবে ভোগ করুক। জোর করে নিবৃত্ত করা যায় না।

—জোর করবেন কেন, বোঝাবেন। আমিই আগে তাদের মন বুঝি,

তারপর বলবো আপনাকে।

—বেশ তো,যদি কেউ না নেয়, ও সম্পত্তি গরিবদুঃখীর সেবায় অর্পণ কর গে তোমার দাদার নামে, বৌদিদির নামে। তাঁদের আত্মার উন্নতি হবে, তৃপ্তি হবে এতে।

সেই দিনেই বিকেলে হঠাৎ হলা পেকে এসে হাজির। দূর থেকে ডেকে বললে—ও বড়দি, খোকা কই ?

খোকাকে ডেকে তিলু বললে—ও কে রে ?

খোকা চেয়ে বললে—দাদা—

—দাদা না রে মামা।

—মামা।

হলা পেকে দু'গাছা সোনার বালা নিয়ে পরাতে গেল খোকার হাতে. তিলু বললে—না দাদা, ও পরাতি দেবো না।

—কেন দিদি ?

—উনি আগে মত না দিলি আমি পারিনে।

—সেবারেও নিতি ভাও নি। এবার না নিলি মোর মনে কষ্ট হবে না দিদিমণি ?

—তা কি করব দাদা। ও সব তুমি আন কেন ?

—ইচ্ছে করে তাই আনি। খোকন, তোর মামাকে তুই ভালবাসিস ?

খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হলা পেকের মুখের দিকে চেয়ে বললে—হঁা।

—কতখানি ভালোবাসিস্ ?

—আকৃখানা।

—একখানা ভালবাসিস্! বেশ তো।

খোকা এবার হাত বাড়িয়ে হলা পেকের বালা দুটো দু'হাতে নিলে। হলা পেকে হাততালি দিয়ে বললে—ওই ভাখো, ও নিয়েচে। খোকামণি পরবে বালা, তুমি দেবা না, বুঝলে না ?

ঠিক এই সময় ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে হলা পেকেকে দেখে বলে উঠলেন—আরে তুমি কোথা থেকে ?

হলা পেকে উঠে ভবানীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। ভবানী হেসে বললেন —খুব ভক্তি দেখচি যে! এবার কি রকম আদায় উশুল হোলো ? ও কি, ওর হাতে ও বালা কিসের ?

তিলু বললে—হলা দাদা খোকনের জন্যে এনেচে—

হলা পেকের মুখ শুকিয়ে গেল। তিলু হেসে বললে—শোনো তোমার খোকার কথা। হ্যাঁরে, তোর মামাকে কতখানি ভালোবাসিস্ রে ?

খোকা বললে—আক্‌খানা।

—তুই বুঝি বালা নিবি ?

—হ্যাঁ।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—না না, বালা তুমি ফেরত নিয়ে যাও। ও আমরা নেবো কেন ?

হলা পেকে ভবানীর সামনে কথা বলতে সাহস পেলে না, কিন্তু তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। তিলু বললে—আহা, দাদার বড় ইচ্ছে। সেবারও এনেছিল, আপনি নেন নি। ওর অন্নপ্রাশনের দিন।

ভবানী বললেন—আচ্ছা, তুমি এসব কেন নিয়ে এসে বিপদে ফেল বল তো ?

হলা পেকে নিরুত্তর। বোবার শত্রু নেই।

—যাও, রেখে দাও এ যাত্রা। কিন্তু আর কক্ষনো কিছু—

হলা পেকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখালো। সে ভবানীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে আচ্ছা, আর মুই আনচি নে কিছু। মোর আক্কেল হয়ে গিয়েচে। তবে এ সে জিনিস নয়। এ আমার নিজের জিনিস।

ভবানী বললেন আক্কেল তোমাদের হবে না—আক্কেল হবে মলে। বয়েস হয়েচে, এখনো কুকাজ কেন ? পরকালের ভয় নেই ?

তিলু বললে—এখন ওকে বকাঝকা করবেন না। ওর মুখ খিদেতে শুকিয়ে গিয়েচে। এসো তুমি দাদা রান্নাঘরের দিকি।

হলা পেকে সাহস পেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে গিয়ে বসলো তিলুর পিছু পিছু।

এই দুর্দান্ত দস্যুকে তিলু আর তার ছেলে কি ক'রে বশ করেছে কে জানে। পোষা কুকুরের মত সে দিব্যি তিলুর পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগলো সসঙ্কোচ আনন্দে।

বেশ নিকানো-গুছানো মাটির দাওয়া। উচ্ছেলতার ফুল ফুটে ঝুলছে খড়ের চাল থেকে। পেছনে শ্যাম চক্কত্তিদের বাঁশঝাড়ে নিবিড় ছায়া। শালিখ ও ছাতারে পাখী ডাকচে। একটা বসন্তবৌরি উড়ে এসে বাঁশগাছের কঞ্চির ওপরে দোল খাচ্ছে। শুকনো বাঁশপাতায় বালির সুগন্ধ বেরুচ্ছে। বনবিছুটির লতা উঠেছে রান্নাঘরের জানালা বেয়ে। তিলু হলা পেকের সামনে রাখলে এক খুঁচি চালভাজা, কাঁচা লঙ্কা ও একমালা ঝুনো নারকোল। এক থাবা খেজুরের গুড় রাখলে একটা পাথরবাটিতে।

হলা পেকের নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। সে এক খুঁচি চালভাজা নিমেষে নিঃশেষ করে বললে—থাকে তো আর দুটো ছান, দিদিঠাকরুণ—

—বোসো দাদা। দিচ্ছি। একটা গল্প করো ডাকাতির, করবে দাদা?

হলা পেকে আবার একধামি চালভাজা নিয়ে খেতে খেতে গল্প শুরু করলে, ভাণ্ডারখোলা গ্রামের নীলমণি মুখুয্যের বাড়ী অঘোর মুচি আর সে রণ-পা পরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ী গিয়ে দেখলে বাড়ীতে তাদের চার-পাঁচজন পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষও আট-দশটা। দুজন বাইরের চাকর, ওদের একজন আবার স্ত্রীপুত্র নিয়ে গোয়ালঘরের পাশের ঘরে বাস করে। ওদের মধ্যে পরামর্শ হোলো বাড়ীতে চড়াও হবে কিনা। শেষ পরে 'লুঠ' করাই ধার্য হোলো। ঢেঁকি দিয়ে বাইরের দরজা ভেঙে ওরা ঘরে ঢুকে ছাথে পুরুষেরা লাঠি নিয়ে, সড়কি নিয়ে তৈরি। মেয়েরা প্রাণপণে আর্তনাদ শুরু করেছে।

তিলু বললে—আহা!

—আহা নয়। শোনো আগে দিদিমণি। প্রাণ সে রাত্রে যাবার দাখিল হয়েছিল। মোরা জানিনে, সে বাড়ীর দাক্ষায়ণী বলে একটা বিধবা মেয়ে

গোয়ালঘর থেকে এমন সড়কি চালাতে লাগলো যে নিবারণ বুনোকে হার মানাতি পারে। একখানা হাত দেখালে বটে! পুরুষগুলোকে মোরা বাড়ীর বার হতি দেখলাম না।

—ওমা, তারপর?

—পুরুষগুলো দোতলার চাপা সিঁড়ি ফেলে দেলে, তারপর ওপর থেকে ইট ফেলতে লাগলো আর সড়কি চালাতে লাগলো। মোদের দলের একটা জখম হোল—

—মরে গেল?

—তখন মরে নি। মোল মোদের হাতে। যখন দাক্ষায়ণী অসম্ভব সড়কি চালাতি লাগলো, মোরা ছাখলাম ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালি মোরা দাঁড়িয়ে মরবো সব ক'টা, তখন মুখে ঝম্প বাজিয়ে দেলাম—

—সে আবার কি?

—এমন শব্দ করলাম যে মেয়েমানুষের পেটের ছেলে পড়ে যায়—করবো শোনবা? না থাক, খোকা ভয় পাবে। পুরুষ ক'টা যাতে ছাদ থেকে নামতি না পারে সে ব্যবস্থা করলাম। সাপের জিবের মত লিকলিকে সড়কির ফলা একবার এগোয় আর একবার পেছোয়—এক এক টানে এক একটা ভুঁড়ি হসকে দেওয়া যাচ্চে—ওদের তিন-চারটে জখম হোলো। মোদের তখন গাঁয়ের লোক ঘিরে ফেলেচে, পালাবার পথ নেই—ওদিকে দাক্ষায়ণী গোয়ালঘর থেকে সড়কি চালাচ্চে। অঘোর পালাবার ইশারা করলে- কিন্তু তখন পালাই মোরা কোন্ রাস্তা দিয়ে। তখন মোদের শেষ অস্ত্র চালালাম—দুই হাত্তা বলে লাঠির মার চালিয়ে তামেচা বাহেরা শির ঠিক রেখে পন্ পন্ ক'রে কুমোরের চাকের মত ঘুরতি ঘুরতি ভিড় কেটে বার হয়ে এসে পথ ক'রে দিই দলের সবাইয়ের। মোদের দলের যে লোকটা জখম হয়েল, তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে সরে পড়ি—আহা লোকটার নাম বংশীধর সর্দার, ভারি সড়কিবাজ ছেল—

—সে আবার কি কথা? নিজেরা মারলে কেন?

—না মারলি সনাক্ত হবে লাশ দেখে। বেঁচে থাকে তো দলের কথা ফাঁস

করে দেবে।

—কি সর্বনাশ!

—সর্বনাশ হোতো আর একটু হলি। তবে খুব পালিয়ে এয়েলাম। সোনার গহনা লুঠ করেলাম ত্রিশ ভরি।

—কি ক'রে? কোথা থেকে নিলে? মেয়েমানুষদের তো ওপরের ঘরে নিয়ে চাপা সিঁড়ি ফেলে দিল?

—তার আগেই কাজ হাসিল হয়েল। ডাকাতি করতি গেলে কি বিলম্ব করলি চলে? যেমন দেখা, অমনি গহনা ছিনিয়ে নেওয়া। তারপর যত খুশি চেঁচাও না—সারা রাত্তির পড়ে আছে তার জন্যি।

—এ রকম কোরো না দাদা। বড্ড পাপের কাজ। এ ভাত তোমাদের মুখি যায়? কত লোকের চোখের জল না মিশিয়ে আছে ঐ ভাতের সঙ্গে। ছিঃ ছিঃ—নিজের পেটে খেলেই হোলো?

হলা পেকে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—পাপ-পুণ্যির কথা বলবেন না। ও আমাদের হয়ে গিয়েচে, সে রাজাও নেই, সে দেশও নেই। জানো তো ছড়া গাইতাম আমরা ছেলেবেলায়:—

ধন্য রাজা সীতারাম বাংলা বাহাদুর
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর
বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে
রামী শামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্তানে যাবে।

তিলু হেসে বললে—আহা, ও ছড়া আমরা যেন আর জানিনে! ছেলেবেলায় দীনু বুড়ি বলতো শুনিচি—

—জানবা না কেন, সীতারাম রাজা ছেলো নলদী পরগণার। মাহ্মুদপুর হোলো তাঁর কেল্লা—মোর মামার বাড়ী হোলো হরিহরনগর, মাহ্মুদপুরির কাছে। মুই সীতারামের কেল্লার ভাঙা ইট পাথর, সীতারামের দীঘি, তার নাম সুখসাগর, ওসব দেখিচি। এখন অরুণ্যি-বিজেবন, তার মধ্যি বড় বড় সাপ থাকে, বাঘ থাকে—এট্টা পুরনো মস্ত মাদার গাছ ছেল জঙ্গলের মধ্যি, তার ফল খেতি যাতাম

ছেলেবেলায়—ভারি মিষ্টি—

খোকা বললে—মিষ্টি। আমি খাই—

—যেও বাবা খোকা—এনে দেবানি—আম পাকলে দেবানি—

—আম খাই—

—খেও। কেন খাবা না?

ভবানী বাঁড়ুয্যে স্নান ক'রে আহ্নিক করতে বসলেন। তিলু দু'চারখানা শসাকাটা, আধমালা নারকোলকোরা ও খানিকটা খেজুরের গুড় তাঁর জন্যে ওঘরে রেখে এল। হলা পেকে এক কাঠা চালের ভাত খেলে, ভবানীর খাওয়ার পরে। খেতেও পারে। ডাল খেলে একটি গামলা। খেয়েদেয়ে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে একটা কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া গেল মুখুযোপাড়ার দিকে। তিলু হলা পেকের দিকে তাকিয়ে বললে—দেখে এসো তো পেকে দা, কে কাঁদচে?

ভবানীও তাড়াতাড়ি দেখতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন—ফণিকাকার বড় জ্যাঠাই জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গিয়েচেন, গণেশ খবর নিয়ে এল—

তিলু বললে—ওমা, সে কি? জাহাজ-ডুবি?

—হাঁ। সার জন লরেন্স বলে একখানা জাহাজ—

—জাহাজের আবার নাম থাকে বুঝি?

—থাকে বৈকি। তারপর শোনো, সেই সার জন লরেন্স জাহাজ ডুবেচে সাগরে, পুরীর পথে। বহু লোক মারা গিয়েচে।

—ওগো এ গাঁয়েরই তো লোক রয়েচে সাত-আটজন। টগর কুমোরের মা, পেঁচো গয়লার শাশুড়ী আর বিধবা বড় মেয়ে ক্ষেন্তি, রাজু সর্দারের মা, নীলমণি কাকার বড় বৌদিদি। আহা, পেঁচো গয়লার মেয়ে ক্ষেন্তির ছোটো ছেলেটা সঙ্গে গিয়েচে মায়ের—সাত বছর মাত্তর বয়েস—

গ্রামে সত্যিই একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। নদীর ঘাটে, গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে, চাষীদের খামারে, বাজারে, নালু পালের বড় মুদিখানার দোকানেও

আড়তে 'সার জন লরেন্স' ডুবি ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

বাংলার অনেক জেলার বহু তীর্থযাত্রী এবার এই জাহাজ ডুবে মারা গিয়েছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সার জন লরেন্স জাহাজ-ডুবির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ-জন্যে।

গয়ামেম সবে বড় সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসেছে, এমন সময় প্রসন্ন আমীন তাকে ডেকে বললে—ও গয়া, শোনো—ও গয়া—

গয়া পেছন দিকে চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললে—আমার এখন ন্যাকরা করবার সময় নেই।

—শোনো একটা কথা বলি—

—কি ?

—ওবেলা বাড়ী থাকবা ?

—থাকি না থাকি আপনার তাতে কি ?

—না, তাই এমনি বলচি।

—এখানে কোনো কথা না। যদি কোনো কথা বলতি হয়, সন্জের পর আমাদের বাড়ি যাবেন, মার সামনে কথা কবে—

প্রসন্ন চক্কত্তি এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলে—না না, আমি এখানে কি কথা বলতি যাচ্চি—বলচি যে তুমি কেমন আছ, একটু রোগা দেখাচ্চে কিনা তাই।

—থাক, পথেঘাটে আর ঢঙ করতি হবে না—

না, এই গয়াকে প্রসন্ন চক্কত্তি ঠিকমত বুঝে উঠতেই পারলে না। যখন মনে হয় ওর ওপর একটু বুঝি প্রসন্ন হোলো-হোলো, অমনি হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। প্রসন্ন হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

পেছনদিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে প্রসন্ন চেয়ে দেখল বড় সাহেব শিপ্‌টন্ কোথায় বেরিয়ে যাচ্চে। বড় ভয় হোলো তার। বড় সাহেব দেখে ফেলছে নাকি, তার ও গয়ামেমের কথাবার্তা ? নাঃ—

সন্দে হবার এত দেরিও থাকে আজকাল! বাঁওড়ের ধারে বড় চটকা গাছে রোদ রাঙা হয়ে উঠলো, চড়ার ক্ষেতে ক্ষেতে ঝিঙের ফুল ফুটলো, শামকুট পাখীর ঝাঁক ইছামতীর ওপার থেকে উড়ে আকাইয়ের বিলের দিকে চলে গেল, তবুও সন্দে আর হয় না। কতক্ষণ পরে বাগ্‌দিপাড়ায়, কলুপাড়ায় বাড়ি বাড়ি সন্দের শাক বেজে উঠলো, বটতলার খেপী সন্নিসীনীর মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল।

প্রসন্ন চক্কত্তি গিয়ে ডাকলে একটু ভয়ে ভয়ে—ও বরদা দিদি—

প্রথমেই গয়ার নাম ধরে ডাকতে সাহস হয় না কিনা!

মেঘ না চাইতেই জল। প্রসন্ন চক্কত্তিকে মহাখুশি করে গয়ামেম ঘরের বাইরে এসে বললে—কি খুড়োমশাই?

—বরদাদিদি বাড়ি নেই?

—না, কেন?

—তাই বলচি।

গয়ামেম মুখ টিপে হেসে বললে—মার কাছে আপনার দরকার? তাহ'লি মাকে ডেকে আনি? যুগীদের বাড়ি গিয়েচে—

—না, না। বোসো গয়া, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি—

—কি?

—আচ্ছা আমাকে তোমার কেমনডা লাগে?

—বুড়োমানুষ, কেমন আবার লাগবে?

—খুব বুড়ো কি আমি? অন্যাই কথাডা বোলো না গয়া। বড় সায়েবের বয়স হই নি বুঝি?

—ওদের কথা ছাড়ান দ্যান। আপনি কি বলচেন তাই বলুন—

—আমি তোমারে না দেখি থাকতি পারিনে কেন বলো তো?

—মরণের ভগ্নদশা। এ কথা বলতি লজ্জা হয় না আমারে?

—লজ্জা হয় বলেই তো এতদিন বলতি পারি নি—

—খুব করেলেন। এখন বুঝি মুখি আর কিছু আটকায় না—

—না সত্যি গয়া, এত মেয়ে ছাখলাম কিন্তু তোমার মত এমন চুল, এমন ছিরি আর কোনোডা চকি পড়লো না—

—ওসব কথা থাক। একটা পরামর্শ দিই শুনুন—

—কি ?

—কাউকে বলবেন না বলুন ?

প্রসন্ন চক্কত্তির মুখ উজ্জ্বল দেখালো। এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে কোনদিন গয়া কথা বলে নি। কি বাঁকা ভঙ্গিমা ওর কালো ভুরু জোড়ার। কি মুখের হাসির আলো। স্বর্গ আজ পৃথিবীতে এসে ধরা দিল কি এই শরৎ দিনের অপরাহ্নে ?

কি বলবে গয়া ? কি বলবে ও ?

বুক ঢিপ ঢিপ করে প্রসন্ন আমীনের। সে আগ্রহের অধীরতায় ব্যগ্রকণ্ঠে বললে—বলো না গয়া, জিনিসটা কি ? আমি আবার কার কাছে বলতে যাচ্চি তোমার আমার তুজনের মধ্যেকার কথা ?

শেষদিকের কথাগুলো খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে প্রসন্ন চক্কত্তি। গয়া কিন্তু কথার ইঙ্গিতটুকু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সহজ সুরেই বললে—শুনুন বলি। আপনার ভালোর জন্যি বলচি। সায়েবদের ভেতর ভাঙন ধরেচে। ওরা চলে যাচ্চে এখান থেকে। বড় সায়েবের মেম এখান থেকে শীগগির চলে যাবে। মেম লোকটা ভালো। যাবার সময় ওর কাছে কিছু চেয়ে নেন গিয়ে। দেবে। লোক ভালো। কথাডা শোনবেন।

প্রসন্ন চক্কত্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে আগে থেকে কিছু-কিছু এ সম্বন্ধে যে অনুমান না করেছিল এমন নয়। সায়েবরা চলে যাবে···সায়েবরা চলে যাবে··· জানে সে কিছু কিছু। কিন্তু গয়া এভাবের কথা তাকে আজ এতদিন পরে বললে কেন ? তার সুখ-তুঃখে, উন্নতি-অবনতিতে গয়ামেমের কি ? প্রসন্ন চক্কত্তির সারা শরীরে পুলকের শিহরণ বয়ে গেল, সন্দেবেলার পাঁচমিশেলি আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ এতকাল পরে জীবনের শেষ প্রহরের দিকে যেন কি একটা নতুন জিনিসের সন্ধান পেলে প্রসন্ন।

সে বললে—সায়েবরা চলে যাচ্চে কেন ?

গয়া হেসে বললে—ওদের ঘুণি ডাঙায় উঠে গিয়েচে যে খুড়োমশাই! জানেন না ?

—শুনিচি কিছু কিছু।

—সমস্ত জেলার লোক ক্ষেপে গিয়েচে। রোজ চিঠি আসচে মাজিস্টর সায়েবের কাছ থেকে। সাবধান হতি বলচে। হাজার হোক সাদা চামড়া তো। মেমেদের আগে সরিয়ে দেচ্চে। আপনারেও বলি, একটু সাবধান হয়ে চলবেন। খাতক প্রজার ওপর আগের মত আর করবেন না। কথলি আর চলবে না—

—কেন, আমি মলি তোমার কি গয়া ?

প্রসন্ন চক্কত্তির গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠলো।

গয়া খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—নাঃ, আপনারে নিয়ে আর যদি পারা যায়! বলতি গ্যালাম একটা ভালো কথা, আর অমনি আপনি আরম্ভ করে দেলেন যা তা—

—কি খারাপ কথাডা আমি বললাম গয়া ?

কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ গাঢ়, বরং গাঢ়তর।

—আবার যতো সব বাজে কথা! বলি যে কথাডা বললাম, কানে গেল না ? দাঁড়ান—দাঁড়ান—

বলেই প্রসন্ন চক্কত্তিকে অবাক ও স্তম্ভিত করে গয়া তার খুব কাছে এসে তার পিঠে একটা চড় মেরে বললে—একটা মশা—এই দেখন—

সমস্ত দেহ শিউরে উঠলো প্রসন্ন আমীনের। পৃথিবী ঘুরছে কি বন্ বন্ করে ? গয়া বল্লে—যা বললাম, সেইরকম চলবেন—বুঝলেন ? কথা কানে গেল ?

—গিয়েচে। আচ্ছা গয়া, না যদি চলি তোমার কি? তোমার ক্ষেতিডা কি ?

গয়া রাগের সুরে বললে—আমার কলা! কি আবার আমার ? না শোনেন মরবেন দেওয়ানজির মত।

—রাগ করচো কেন গয়া ? আমার মরণই ভালো। কে-ই বা কাঁদবে

মলি পরে !···প্রসন্ন চক্কত্তি ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—আহাহা ! ঢঙ ! রাগে গা জ্বলে যায়। গলার সুর যেন কেষ্টযাত্রা—বললাম একটা সোজা কথা, না—কে কাঁদবে মলি পরে, কে হেন করবে, তেন করবে ! সোজা পথে চললি হয় কি জিগেস করি ?

—যাকগে।

—ভালোই তো।

—আমারে দেখলি তোমার রাগে গা জ্বলে, না ?

—আমি জানিনে বাপু। যত আজগুবী কথার উত্তর আমি বসে বসে এখন দিই ! খেয়ে দেয়ে আমার তো আর কাজ নেই···আসুন গিয়ে এখন, মা আসবার সময় হোলো—

– বেশ চললাম এখন গয়া।

—আসুন গিয়ে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ক্ষুণ্ণমনে কিছুদূর যেতেই গয়া পেছন থেকে ডাকলে—ও খুড়োমশাই—

প্রসন্ন ফিরে চেয়ে বললে—কি ?

—শুনুন।

—বল না কি ?

—রাগ করবেন না যেন !

—না। যাই এখন—

—শুনুন না।

—কি ?

—আপনি একটা পাগল !

—যা বলো গয়া। শোনো একটা কথা—কাছে এসো—

—না, এখান থেকে বলুন আপনি।

—নিধুবাবুর একটা টপ্পা শোনবা ?

—না আপনি যান, মা আসচে—

প্রসন্ন চক্কত্তি আবার কিছুদূর যেতে গয়া পেছন থেকে বললে—আবার আসবেন এখন একদিন—কানে গেল কথাডা ? আসবেন---

—কেন আসবো না ! নিশ্চয় আসবো। ঠিক আসবো।

দূরের মাঠের পথ ধরলো প্রসন্ন চক্কত্তি। অনেক দূর সে চলে এসেচে গয়াদের বাড়ি থেকে। বরদা দেখে ফেলে নি আশা করা যাচ্চে। কেমন মিষ্টি সুরে কথা কইলে গয়া, কেমন ভাবে তাকে সরিয়ে দিলে পাছে মা দেখে ফেলে !

কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত, তার চেয়েও আশ্চর্য, সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্চে, ওঃ, ভাবলে এখনো সারাদেহে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়, সেটা হচ্চে গয়ার সেই মশা মারা।

এত কাছে এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। অমন সুন্দর ভঙ্গিতে।

সত্যিই কি মশা বসেছিল তার গায়ে ? মশা মারবার ছলে গয়া কি তার কাছে আসতে চায় নি ?

কি একটা দেখিয়েছিল বটে গয়া, প্রসন্ন চক্কত্তির তখন কি চোখ ছিল একটা মরা মশা দেখবার ? সন্দে হয়ে এসেছে। ভাদ্রের নীল আকাশ দূর মাঠের উপর উপুড় হয়ে আছে। বাঁশের নতুন কোঁড়াগুলো সারি সারি সোনার সড়কির মত দেখাচ্ছে রাঙা রোদ পড়ে বনোজোলার যুগীপাড়ার বাঁশবনে-বনে। ওখানেই আছে গয়ার মা বরদা। ভাগ্যিস বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল! নইলে বরদা আজ উপস্থিত থাকলে গয়ার সঙ্গে কথাই হোতো না। দেখাই হোতো না। বৃথা যেতো এমন চমৎকার শরতের দিন, বৃথা যেতো ভাদ্রের সন্ধ্যা···

সারা জীবনের মধ্যে এই একটি দিন তার। চিরকাল যা চেয়ে এসেছিল, আজ এতদিন পরে তা কি মিললো ? নারীর প্রেমের জন্ম সারা জীবনটা বুভুক্ষু ছিল না কি ওর ?

প্রসন্ন চক্কত্তি অনেক দেরি করে আজ বাসায় ফিরলো। নীলকুঠির বাসা, ছোট্ট একখানা ঘর, তার সঙ্গে খড়ের একটা রান্নাঘর। সদর আমীন নকুল ধাড়া আজ অনুপস্থিত তাই রক্ষে, নতুবা বকিয়ে বকিয়ে মারতো এতক্ষণ।

বকবার মেজাজ নেই তার আজ। শুধু বসে বসে ভাবতে ইচ্ছে করছে···গয়া তার কাছ ঘেঁষে এসে মশা মারলে·· হয়, হয়। ধরা দেয়। স্বর্গের উর্বশী মেনকা রম্ভাও ধরা দেয়, সে চাইচে যে···

বর্ষা নামলো হঠাৎ। ভাদ্রসন্ধ্যা অন্ধকার ক'রে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামলো। খড়ের চালার ফুটো বেয়ে জল পড়ছে মাটির উনুনে। ভাত চড়িয়েছে উচ্ছে আর কাঁচকলা ভাতে দিয়ে। আর কিছু নেই, আর কিছু রান্না করবার দরকার কি? খাবার ইচ্ছে নেই। শুধু ভাবতে ভালো লাগে···শুধু গয়ামেমের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি, তার সে মুখের হাসি···গয়া তার কাছে ঘেঁষে এসে একটা চড় মেরেছে তার গায়ে মশা মারতে···

মশা কি সত্যই তার গায়ে বসেছিল?

আচ্ছা, এমন যদি হোতো—

সে ভাত রান্না করচে, গয়া হাসি-হাসি মুখে উঁকি দিয়ে বলতো এসে—খুড়োমশাই, কি করচেন?

—ভাত রাঁধচি গয়া।

—কি রান্না করচেন?

—ভাতে ভাত।

—আহা, আপনার বড় কষ্ট!

—কি করবো গয়া, কে আছে আমার? কি খাই না-খাই দেখচে কে?

—আপনার জন্যি মাছ এনেচি। ভালো খয়রা মাছ।

—কেন গয়া তুমি আমার জন্যি এত ভাবো?

—বড্ড মন কেমন করে আপনার জন্যি। একা থাকেন কত কষ্ট পান···

ভাত হয়ে গেল। ধরা গন্ধ বেরিয়েচে। সর্ষের তেলে ভাতে ভাত মেখে খেতে বসলো প্রসন্ন চক্কত্তি। রেড়ির তেলের জল-বসানো দোতলা মাটির পিদিমের শিখা হেলছে দুলছে জোলো হাওয়ায়। খাওয়ার শেষে- যখন প্রায় হয়ে এসেচে, তখন প্রসন্ন আবিষ্কার করলে পাতে সে নুন নেয় নি, উচ্ছে ভাতে, কাঁচকলা ভাতে আলুনি খেয়ে চলেছে এতক্ষণ।

আচ্ছা, মশাটা কি সত্যি ওর গায়ে বসেছিল ?

রামকানাই কবিরাজ সকালে উঠে ইছামতীতে স্নান ক'রে আসবার সময় দেখলেন কি চমৎকার নাক-জোয়ালে ফুল ফুটেছে নদীর ধারের ঝোপের মাথায়। বেশ পূজো হবে। বড় লোভ হোলো রামকানাইয়ের। কাঁটার জঙ্গল ভেদ করে অতি কষ্টে ফুল তুলে রামকানাইয়ের দেরি হয়ে গেল নিজের ছোট্ট খড়ের ঘরে ফিরতে।

রামকানাই রোজ প্রাতঃস্নান করে এসে পূজো ক'রে থাকেন গ্রাম্য-কুমোরের তৈরি রাধাকৃষ্ণের একটা পুতুল। ভালো লেগেছিল বলে ভাসানপোতার চড়কের মেলায় কেনা। বড় ভালো লাগে ঐ মূর্তির পায়ে নাক-জোয়ালে ফুল সাজিয়ে দিতে, চন্দন ঘষে মূর্তির পায়ে মাখিয়ে দিতে, দু'একটা ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে পুতুলটার আশেপাশে। নৈবেদ্য দেন কোনো দিন পেয়ারা কাটা, কোনো দিন পাকা পেঁপের টুকরো, এক ডেলা খাঁড় আখের গুড়।

পূজো শেষ করবার আগে যদি কেউ না আসে তবে অনেকক্ষণ ধরে পূজো চলে রামকানাইয়ের। চোখ চেয়ে এক-একদিন জলও পড়ে। লাজুক হাতে মুছে ফেলে দেন রামকানাই।

কে বাইরে থেকে ডাকলে—কবিরাজ মশাই ঘরে আছেন ?

—কে ? যাই।

—সবাইপুরির অম্বিক মণ্ডলের ছেলের জ্বর। যেতি হবে সেখানে।

—আচ্ছা আমি যাচ্ছি—বোসো।

পূজো-আচ্চা শেষ করে প্রসাদ নিয়ে বাইরে এসে রামকানাই সেই লোকটার হাতে কিছু দিলেন।

—কি অসুখ ?

—আজ্ঞে, জ্বর আজ তিন দিন।

—তুমি চলে যাও, আমি আরো দুটো রুগী দেখে যাব এখন—

রামকানাই দু'টুকরো শসা খেয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়েন। নানা

জায়গা ঘুরে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সবাইপুর গ্রামের অম্বিকা মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে ডাক দিলেন। অম্বিকা মণ্ডল বেগুনের চাষ করে, অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটির আজ কয়েক দিন জ্বর, ওষুধ নেই, পথ্য নেই। রামকানাই কবিরাজ খুব যত্ন ক'রে দেখে বললেন—এ নাড়ির অবস্থা ভালো না। একবার টাল খাবে—

বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে কবিরাজকে সেদিনটা সেখানে থাকতে বললে। তখনো যে তাঁর খাওয়া হয় নি সেকথা কেউ জানে না, কেউ কিছু বললেও না। রামকানাই কবিরাজ না খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বালকের শিয়রে বসে রইলেন। তারপর বাড়ি এসে সন্ধ্যা-আরাধনা ও রান্না করে রাত এক প্রহরের সময় আবার গেলেন রোগীর বাড়ি।

রামকানাইয়ের নাড়িজ্ঞান অব্যর্থ। রাতদুপুরের সময় রোগী যায়-যায় হোলো। সূচিকাভরণ প্রয়োগ ক'রে টাল সামলাতে হোলো রামকানাইয়ের ওদের ঘরের মধ্যে জায়গা নেই, পিঁড়েতে একটা মাদুর দিলে বিছিয়ে। ভোর পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে তিনি পুনরায় রোগীর নাড়ি দেখলেন। মুখ গম্ভীর করে বললেন—এ রুগী বাঁচবে না। বিষম সান্নিপাতিক জ্বর, বিকার দেখা দিয়েছে। আমি চললাম। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমাদের।

এতটা পরিশ্রমের বদলে একটি কানাকড়িও পেলেন না রামকানাই, সেজন্য তিনি দুঃখিত নন, তার চেয়ে রোগীকে যে বাঁচাতে পারলেন না, বড় দুঃখ হ'লো তাঁর সেটাই।

আজকাল একটি ছাত্র জুটেছে রামকানাইয়ের। ভজন-ঘাটের অক্রূর চক্রবর্তীর ছেলে, নাম নিমাই, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। সে ঘরের বাইরে দূর্বাঘাসের ওপরে মাধব-নিদানের পুঁথি হাতে বসে আছে। অধ্যাপক আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে।

রামকানাই তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন—বাপ নিমাই, বোসো। নাড়ির ঘা কি রকম রে?

—আজ্ঞে নাড়ির ঘা কি, বুঝতে পারলাম না।

—ক'ঘা দিলে সঙ্কটের নাড়ি?

—তিন-এর পর এক ফাঁক, চারের পর এক ফাঁক।

—তা কেন? সাত-এর পর, আটের পর হলি হবে না?

—আজ্ঞে তাও হবে।

—তাই বল। আজ একটা রুগী দেখলাম, সাতের পর ফাঁক। সেখান থেকেই এ্যালাম।

—বাঁচলো?

—স্বয়ং ধন্বন্তরির অসাধ্য—কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্য—সুশ্রুতে বলচে। বাবা, একটা কথা বলি। কবিরাজি তো পড়বার জন্যি এসেচ। শরীরে কোনো দোষ রাখবা না। মিথ্যে কথা বলবা না। লোভ করবা না। অল্পে সন্তুষ্ট থাকবা। দুঃখী গরিবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করবা। ভগবানে মতি রাখবা। নেশা-ভাঙ করবা না তবে ভালো কবিরাজ হতি পারবা। আমার গুরুদেব (উদ্দেশে প্রণাম করলেন রামকানাই) মঙ্গলগঞ্জের গঙ্গাধর সেন কবিরাজ সর্বদা আমাদের একথা বলতেন। আমি তাঁর বড় প্রিয় ছাত্র ছেলাম কিনা। তাঁর উপযুক্ত হই নি। আমরা কুলাঙ্গার ছাত্র তাঁর। নাড়ি ধরে যাকে যা বলবেন তাই হবে। বলতেন মনডা পবিত্র না রাখলি নাড়িজ্ঞান হয় না। কিছু খাবি?

ছাত্র সলজ্জমুখে বললে—না, গুরুদেব।

—তোর মুখ দেখে মনে হচ্চে কিছু খাস নি। কিবা খেতি দি, কিছু নেই ঘরে—একটা নারকোল আছে, খোড়া দিকি!

—দা আছে?

—ঐ বটকৃষ্ণ সামন্তদের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়, ওই নদীর ধারে বাঁশতলায় যে বাড়ি, ওটা। চিনতি পারবি, না সঙ্গে যাবো?

—না, পারবো এখন—

গুরুশিষ্য কাঁচা নারকোল ও অল্প দুটি ভাজা কড়াইয়ের ডাল চিবিয়ে খেয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কাজে মন দিলে—বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, ছাত্রের যদি বা হুঁশ থাকে তো গুরুর একেবারে নেই। 'মাধব নিদান' পড়াতে পড়াতে এল চরক, চরক থেকে এল কলাপ ব্যাকরণ, অবশেষে এসে পড়ে শ্রীমদ্ভাগবত। রাম-

কানাই কবিরাজ ভালো সংস্কৃতজ্ঞ, ব্যাকরণের উপাধি পর্যন্ত পড়েছিলেন।

ছাত্রকে বললেন—অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদার ধী।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতঃ পুরুষং পরং॥

অকাম অর্থাৎ বিষয়কামনাশূন্য হয়ে ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজনা করবে। বুঝলে বাবা, তাঁর অসীম দয়া - চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান

স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার নিধান—

তিনিই কৃপা করেন—একবার তাঁর চরণে শরণ নিলেই হোলো। মানুষের অজ্ঞতা দেখে তিনি দয়া না করলি কে করবে?

শিষ্য কাঠ সংগ্রহ করে আনলে বাঁশবন থেকে। গুরু বললেন—একটা ওল তুলে আনলি নে কেন বাঁশবন থেকে? আছে?

—অনেক আছে।

—নিয়ে আয়। বটকৃষ্টদের বাড়ি থেকে শাবল একখানা চেয়ে নে, আর ওদের দাখানা দিয়ে এসেচিস? দিয়ে আয়। বড় দেখে ওল তুলবি, খাবার কিছু নেই ঘরে। ওল-ভাতে সর্ষেবাটা দিয়ে আর—ওরে অমনি দুটো কাঁচা লংকা নিয়ে আসিস বটকেষ্টদের বাড়ি থেকে—

—মুখ চুলকোবে না, গুরুদেব?

—ওরে না না। সর্ষেবাটা মাখলি আবার মুখ চুলকোবে—

—ওল টাটকা তুলে খেতি নেই, রোদে শুকিয়ে নিতি হয় দু'একদিন—

—সে সব জানি। আজ ভাত দিয়ে খেতি হবে তো? তুই নিয়ে আয় গিয়ে, যা—তুইও এখানে খাবি—

ওল-ভাতে ভাত দিয়ে গুরুশিষ্য আহার সমাপ্ত ক'রে আবার পড়াশুনো আরম্ভ ক'রে দিলে। বিকেলবেলা হয়ে গেল, বাঁশবনে পিড়িং পিড়িং ক'রে ফিঙে পাখী ডাকচে, ঘরের মধ্যে অন্ধকারে আর দেখা যায় না, তখন গুরুর আদেশে শিষ্য নিমাই চক্রবর্তী পুঁথি বাঁধলে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে,—তাহোলে যাই গুরুদেব।

—ওরে, কি ক'রে যাবি? বাঁশবনের মাথায় বেজায় মেঘ করেচে—ভীষণ বৃষ্টি আসবে—ছাতিটাও তো আজ আনিস নি—

—বাঁটটা ভেঙে গিয়েচে। আর একটা ছাতি তৈরি করচি। ভালো কচি তালপাতা এনে কাদায় পুঁতে রেখে দিইচি। সাত-আট দিনে পেকে যাবে। সেই তালপাতায় পাকা ছাতি হয়—

—কেন, কেয়াপাতায় ভালো ছাতি হয়—

—টেকে না গুরুদেব। তালপাতার মত কিছু না—

—কে বললে টেকে না? কেয়াপাতার ছাতি সবাই বাঁধতি জানে না। আমি তোরে বেঁধে দেবো একখানা ছাতি—দেখবি—

শিষ্য বিদায় নিয়ে চলে যাবার কিছু পরেই গয়ামেম ঘরে ঢুকলো, হাতে তার একছড়া পাকা কলা। সে দূর থেকে রামকানাইকে প্রণাম করে দোরের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। রামকানাই বললেন—এসো মা, বোসো বোসো, দাঁড়িয়ে কেন? হাতে ও কি?

গয়া সাহস পেয়ে বললে—এক ছড়া গাছের কলা। আপনার চরণে দিতি এ্যালাম—আপনি সেবা করবেন।

—ও তো নিতি পারবো না—আমি কারো দান নিই নে—

—এক কড়া কড়ি দিয়ে নিন—

—রুগীদের বাড়ি থেকে নিই। ওতে দোষ হয় না। বটকেষ্ট সামন্ত আমার রুগী। হাঁপানিতে ভুগচে, ওর বাড়ি থেকে নিই এটা-ওটা। তুমি তো আমার রুগী নও মা—অবিশ্যি আশীর্বাদ করি রুগী না হতি হয়।

—রোগের জন্যি তো এ্যালাম, জ্যাঠামশাই—

—কি রোগ?

গয়া ইতস্তত: করে বললে—সর্দিমত হয়েচে। রাত্তিরে ঘুম হয় না।

—ঠিক তো?

—ঠিক বলচি বাবা। আপনি সাক্ষাৎ শিবতুল্য লোক। আপনার সঙ্গে মিথ্যে বললে নরকে পচে মরতি হবে না?

রামকানাই দুঃখিত স্বরে বললেন—না মা, ওসব কথা বলতি নেই। আমি তুচ্ছ লোক। আচ্ছা একটু ওষুধ তোমারে দিই। আদা আর মধু দিয়ি মেড়ে খাবা।

—আচ্ছা, বাবা—

—কি ?

—সব লোক আপনার মত হয় না কেন ? লোকে এত দুষ্টু বদমাইশ হয় কেন ?

—আমিও ওই দলের। আমি কি করে দলছাড়া হলাম ? এ গাঁয়ে একজন ভালো লোক আছে, দেওয়ানজির জামাই ভবানী বাঁড়ুয্যে। মিথ্যা কথা বলে না, গরীবের উপকার করে, লক্ষ্মীর সংসার, ভগবানের কথা নিয়ে আছে।

—আমি দেখিচি দূর থেকি। কাছে যেঁাত সাহসে কুলোয় না—সত্যি কথা বলচি আপনার কাছে। আমাদের জন্মো মিথ্যে গেল। জানেন তো সবি জ্যাঠামশাই—

—তাঁকে ডাকো। তাঁর কৃপা হোলি সবই হয়। তুমি তো তুমি, কত বড় বড় পাপী তরে গেল।

—জ্যাঠামশাই এক এক সময়ে মনে বড্ড খেদ হয়। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে যাই—মার জন্যি পারিনে। মা-ই আমাকে নষ্ট করলে। মা আজ মরে গেলি আমি একদিকে গিয়ে বেরোতাম, সত্যি বলচি, এক এক সময় হয় এমনি মনটা জ্যাঠামশাই—

রামকানাই চুপ করে রইলেন। তাঁর মন সায় দিল না এসময়ে কোনো কথা বলতে।

গয়া বললে—কলা নেবেন ?

—দিয়ে যাও। ওষুধটা দিয়ে দিই মা, দাঁড়াও। মধু আছে তো ? না থাকে আমার কাছে আছে, দিচ্ছি—

গয়া প্রণাম করে চলে গেল ওষুধ নিয়ে। পথে যেতে যেতে প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। গয়ার আসবার পথে সে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

—এই যে গয়া, কোথায় গিয়েছিলে ? হাতে কি ?

—ওষুধ খুড়োমশাই। এখানে দাঁড়িয়ে ?

—ভাবচি তুমি তো এ পথ দিয়ে আসবে!

—আপনি এমন আর করবেন না—সরে যান পথের ওপর থেকে—

—কেন, আমার ওপর বিরূপ কেন ? কি হয়েচে ?

—বিরূপ-সরূপের কথা না। আপনি সরুন তো—আমি যাই—

গয়া হনহন ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তি তেমন সাহস সঞ্চয় করতে পারলে না যে পেছন থেকে ডাকে। ফিরেও চাইলে না গয়া।

নাঃ, মেয়েমানুষের মতির যদি কিছু—

নীলবিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল সারা যশোর ও নদীয়া জেলায়। কাছারীতে সে খবরটা নিয়ে এল নতুন দেওয়ান হরকালী সুর।

শিপ্‌টন্ সাহেব কুঠির পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিল। হরকালী সুর সেলাম করে বললে—তেরোখানা গাঁয়ের প্রজা ক্ষেপেচে সায়েব। ছোটলাট আসচেন এই সব জায়গা দেখতে। প্রজারা তাঁর কাছে সব বলবে—

শিপ্‌টন্ মাথা নাড়া দিয়ে বললে—Here me, দেওয়ান! প্রজাশাসন কি করিয়া করিটে হয় টাহা আমি জানে! আগের দেওয়ানকে যাহারা খুন করিয়াছিল, টাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিয়াছি—these people want a revolt—do they ? সব নীলকুঠির সায়েবলোক মিলিয়া সভা হইয়াছিল, টুমি জানে ?

—জানি হুজুর। তখন আমি রণবিজয়পুরের কুঠিতে—

—ও, that রণবিজয়পুর! যেখানে জেফ্রিস সায়েব খুন হইলো ?

—খুন হন নি হুজুর। মদ খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন—

—ওসব নেটিভ আমলাদের কারসাজি আছে। It was a plot against

his life—আমি সব জানে। কে ম্যানেজার ছিল? রবিন্‌সন্?

—আজ্ঞে হুজুর।

—এখন কান পাতিয়া শোনো, I want a very intrepid দেওয়ান, যেমন রাজারাম ছিলো। But—

নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—He was not a brainy chap—something wrong with his think-box—বুড্‌ঢি ছিলো না! সাবধান হইয়া চলিটে জানিট না, সেজন্যে মরিলো। বণ্ডুক দেখিলে?

—হাঁ হুজুর।

—সাতটা নতুন গান্ আসিয়াছে। আমার নাম শিপ্‌টন্ আছে—কি করিয়া শাসন করিটে হয় তাহা জানে—I will shoot them like pigs.

—হুজুর!

—আমাদের সভাতে ঠিক হইয়াছে, আমরা হঠিব না। গভর্ণমেণ্টের কঠা শুনিব না। প্রয়োজন বুঝিলে খুন করিবে। মেমসায়েবদের এখানে রাখা হইবে না—আমি মেমসায়েবকে পাঠাইয়া ডিটেছি—

—কবে হুজুর?

—Monday next, by boat from here to মঙ্গলগঞ্জ। সোমবারে নৌকা করিয়া যাইবেন, নৌকা ঠিক রাখিবে।

—যে আজ্ঞে হুজুর। সব ঠিক থাকবে—সঙ্গে কে যাবে হুজুর?

—কি প্রয়োজন? I don't think that is necessary—

দেওয়ান হরকালী খুব ঘুঘু লোক। অনেক কিছু ভেতরের খবর সে জানে। কিন্তু কতটা বলা উচিত কতটা উচিত নয়, তা এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। মাথা চুলকে বললে—হুজুর, সঙ্গে আপনি গেলে ভালো হয়—

শিপ্‌টন্ ভুরু কুঁচকে বললে—She can take care of herself—তিনি নিজেকে রক্ষা করিটে জানেন। আমার যাইটে হইবে না—টুমি সব ঠিক কর।

—হুজুর, করিম লাঠিয়ালকে সঙ্গে দিতে চাই—

—What? Is it as worse as that? কিছু ডরকার নাই। টুমি

যাও। অত ভয় করিলে নীলকুঠি চালাইটে জানিবে না। ঠিক আছে।

—যে আজ্ঞে হুজুর—

—একটা কঠা শুনিয়া যাও। Are you sure there's as much as that? খবর লইয়া কি জানিলে?

—সাহস দেন তো বলি হুজুর—মেমসায়েবের সঙ্গে করিম লাঠিয়াল আর পাইক যেন যায়। ষড়যন্ত্র অনেক দূর গড়িয়েচে—

সাহেব শিস্ দিতে দিতে বললে—ও, this I never imagined possible! It will make me feel different—ইহা বিশ্বাস করা শকৃট। আচ্ছা, টুমি যাও। Leave everything to me—আমি যা-যা করিটে হইবে, সব করা হইবে, বুঝিলো?

হরকালী সুর বহুদিন বহু সাহেব ঘেঁটে এসেচে, উলটো-পালটা ভুল বাংলা আন্দাজে বুঝে বুঝে ঘুণ হয়ে গিয়েচে।

বললে—একটা কথা বলি হুজুর। আমার বন্দোবস্ত আমি করি, আপনার বন্দোবস্ত আপনি করুন। সেলাম, হুজুর—

তিন দিন পরে বড় সাহেবের মেম নীলকুঠির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুলতলার ঘাটে বজরায় চাপলো। সঙ্গে দশজন পাইকসহ করিম লাঠিয়াল, নিজে হরকালী সুর পৃথক নৌকায় বজরার পেছনে।

পুরানো কর্মচারীদের মধ্যে প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—মা, জগদ্ধাত্রী মা আমার! আপনি চলে যাচ্চেন, নীলকুঠি আজ অন্ধকার হয়ে গেল।...

প্রসন্ন আমীন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

মেমসাহেব বললে—Don't you cry my good man—আমীনবাবু, কাঁদিও না—কেন কাঁদে?

—মা, আমার অবস্থা কি করে গেলে? আমার গতি কি হবে মা? কার কাছে দুঃখু জানাবো, জগদ্ধাত্রী মা আমার—

চতুর হরকালী সুর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি চেপে রাখলে।

মেমসাহেব দ্বিরুক্তি না করে নিজের গলা থেকে সরু হারছড়াটা খুলে প্রসন্ন আমীনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রসন্ন শশব্যস্ত হয়ে সেটা লুফে নিলে দু'হাতে।

সকলে অবাক। হরকালী সুর স্তম্ভিত। করিম লেঠেল হাঁ ক'রে রইল।

বজরা ঘাট ছেড়ে চলে গেল।

প্রসন্ন আমীন অনেকক্ষণ বজরার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর উড়ানির খুঁটে চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে ঘাটের ওপরে উঠে চলে গেল।

বড় সাহেবের মেম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠির লক্ষ্মী চলে গেল।

গয়ামেম হাসতে হাসতে বললে—কেমন খুড়োমশাই? আদ্দেক ভাগ কিন্তু দিতি হবে—

দুপুর বেলা। নীল আকাশের তলায় উঁচু গাছে গাছে বহু ঘুঘুর ডাকে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ঘনতর ক'রে তুলেচে। শ্যামলতার সুগন্ধি ফুল ফুটেচে অদূরবর্তী ঝোপে। পথের ধারে বটতলায় দুজনের দেখা। দেখাটা খুব আকস্মিক নয়, প্রসন্ন চক্কত্তি অনেকক্ষণ থেকে এখানে অপেক্ষা করছিল। সে হেসে বললে—নিও তোমার জন্যেই তো হোল—

—কেমন, বলেছিলাম না?

—তুমিই নাও ওটা। তোমারেই দেবো—

—পাগল! আমারে অত বোক' পালেন? সায়েবসুবোর জিনিস আমি ব্যাভার করতি গেলে কি বলবে সবাই? ওতে আমি হাত দিই কখনো?

—তোমারে বড় ভালো লাগে গয়া—

—বেশ তো।

—তোমারে দেখলি এত আনন্দ পাই—

—এই সব কথা বলবার জন্তি বুঝি এখানে দাঁড়িয়ে ছেলেন?

—তা—তা—

—বেশ, চললাম এখন। শুনুন আর একটা কথা বলি। আপনি অন্ত জায়গায় চাকরির চেষ্টা করুন—

—সে আমি সব বুঝি। এদের দাপট কমেচে তা আমি দেখতে পাচ্চিনে, এত বোকা নই। শুধু তোমারে ফেলে কোনো জায়গায় যেতি মন সরে না—

—আবার ওই সব কথা!

—চলো না কেন আমার সঙ্গে?

—কনে?

—চলো যে'দিকি চোখ যায়—

গয়া খিল্ খিল্ করে হেসে বললে—এইবার তা'হলি ষোলকলা পুন্ন হয়। যাই এবার আপনার সঙ্গে যেদিকি দুই চোখ যায়—

প্রসন্ন চক্কত্তি ভাব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। গয়া হাসিমুখে বললে—কথা বলচেন না যে? ও খুড়োমশাই?

—কি বলবো? তোমার সঙ্গে কথা বলতি সাহস হয় না যে।

—খুব সাহস দেখিয়েচেন, আর সাহসে দরকার নেই। আপনারে একটা কথা বলি। মাবে ফেলে ক'নে যাবো বলুন! এতদিনে যাদের নুন খেলাম, তাদের ফেলে কোথায় যাবো? ওরা এতদিন আমারে খাইয়েচে, মাখিয়েচে, যত্ন-আত্তি কম করে নি—ওদের ফেলে গেলি ধম্মে সইবে না। আপনি চলে যান—ভাত খাচ্চেন ক'নে আজকাল? রেঁধে দিচ্চে কেডা?

প্রসন্ন চক্কত্তি কথার উত্তর দিতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। এসব কি ধরনের কথা? কেউ তাকে এমন ধরনের কথা বলেচে কখনো? ··আবার সেই আনন্দের শিহরণ নেমেচে ওর সর্বাঙ্গে। কি অপূর্ব অনুভূতি। গা ঝিম-ঝিম করে ওঠে যেন। চোখে জল এসে পড়ে। অন্যমনস্কভাবে বলে—ভাত? ভাত রান্না··ও ধরো···না, নিজেই রাঁধি আজকাল।

—একবার দেখতি ইচ্ছে হয় কি রকম রাঁধেন—

—প্রসাদ পাবা?

—সে আপনার দয়া। কি রান্না করবেন ?

—বেগুন ভাতে, মুগির ডাল। খয়রা মাছ যদি খোলার গাঙে পাই তবে ভাজবো—

—আপনি সত্যি সত্যি এত বেলায় এখনো খান নি ?

—না। তোমার জন্যি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কুঠি থেকে কখন বেরুবে তাই দাঁড়িয়ে আছি—

গয়া রাগের সুরে বললে—ওমা এমন কথা আমি কখনো শুনি নি! সে কি কথা ? আমি কি আপনার পায়ে মাথা কুটবো ? এখুনি চলে যান বাড়ি। কোনো কথা শুনচিনে। যান—

—এই যাচ্চি—তা—

—কথা-টথা কিছু হবে না! চলে যান আপনি—

গয়া চলে যেতে উদ্যত হোলে প্রসন্ন চক্কত্তি ওর কাছ ঘেঁষে (যতটা সাহস হয়, বেশি কাছে যেতে সাহসে কুলোয় কৈ ?) গিয়ে বললে—তুমি রাগ করলে না তো ? বল গয়া—

—না রাগ করলাম না, গা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এমন বোকামি কেন করেন আপনি ? যান এখন—

—রাগ কোরো না গয়া, তুমি রাগ করলি আমি বাঁচবো না।

ওর কণ্ঠে মিনতির সুর।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিকেলে বেড়াতে বেরুবেন. খোকা কাঁদতে আরম্ভ করলে—বাবা, যাবো—

তিলু ধমক দিয়ে বললে—না, থাকো আমার কাছে।

খোকা হাত বাড়িয়ে বললে—বাবা যাবো—

ভবানী বাঁড়ুয্যের ছাতি দেখিয়ে বলে—কে ছাতি ?

অর্থাৎ কার ছাতি!

ভবানী বললেন—আমার ছাতি। চল, আবার বিষ্টি হবে—

খোকা বললে—বিষ্টি হবে।

—হাঁ, হবেই তো।

ভবানীর কোলে উঠে খোকা যখন যায়, তখন তার মুখের হাসি দেখে ভাবেন এর সঙ্গ সত্যিই সৎসঙ্গ। খোকাও তাঁকে একদণ্ড ছাড়তে চায় না। বাপছেলের সম্বন্ধের গভীর রসের দিক ভবানীর চোখে কি স্পষ্ট হয়েই ফুটলো!

কোলে উঠে যেতে যেতে খোকা হাসে আর বলে—কাণ্ড! কাণ্ড!

এ কথার বিশেষ কি অর্থ সে-ই জানে। বোধ হয় এই বলতে চায় যে কি মজার ব্যাপারই না হয়েছে। ভবানী জানেন খোকা মাঝে মাঝে দুই হাত ছড়িয়ে বলে—কাণ্ড!

কাণ্ড মানে-তিনিও ঠিক জানেন না, তবে উল্লাসের অভিব্যক্তি এটুকু বোঝেন। কৌতুকের সুরে ভবানী বললেন—কিসের কাণ্ড রে খোকা?

—কাণ্ড! কাণ্ড!

—কোথায় যাচ্ছিস রে খোকা?

—মুকি আনতে!

—মুড়কি খাবে বাবা?

—হুঁ।

—চল কিনে দেবো।

ইছামতী নদী বর্ষার জলে কূলে-কূলে ভর্তি। খোকাকে নিয়ে গিয়ে একটা নৌকোর ওপর বসলেন ভবানী। দুই তী ঘন সবুজ বনঝোপ, লতা দুলচে জলের ওপর, বাবলার সোনালী ফুল ফুটেছে তীরবর্তী বাবলা গাছের নত শাখায়। ওপার থেকে নীল নীরদমালা ভেসে আসে, হল্‌দে বসন্তবৌরি এসে বসে সবুজ বননিকুঞ্জের ও ডাল থেকে ও ডালে।···

ভবানী বাঁড়ুয্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প! এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্ণে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে, স্থলে, উর্ধ্বে, অধে, দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পুবে। যেখানে তিনি সেখানে এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি

হাসে, অমন স্বন্দর বসন্তবৌরি পাখীর হলুদ রংয়ের দেহে ঝলক ফুটে ওঠে। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বনকলমী ফুল ওইরকম ফোটে জলের ধারে ঝোপে ঝোপে। তাঁর বাইরে কি আছে? জয় হোক তাঁর।

খোকা হাত ছাড়িয়ে বলে—কি জল! কি জল!

এগুলো সে সম্প্রতি কোথা থেকে যেন শিখেছে—সর্বদা প্রয়োগ করে।

ভবানী বললেন—খোকা, নদী বেশ ভালো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—ভালো।

—বাড়ি যাবি?

—হুঁ।

—তবে যে বললি ভালো?

—মার কাছে যাবো···

অন্ধকার বাঁশবনের পথে ফিরতে খোকার বড় ভয় হয়। দু'বছরের শিশু, কিছু ভালো বুঝতে পারে না·· সামনের বাঁশঝাড়টার ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ বড় ভয় হয়। বাবাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে বলে—বাবা ভয় করচে, ওতা কি?

—কই কি, কিছু না।

খোকা প্রাণপণে বাবার গলা জড়িয়ে থাকে। তাকে ভয় ভুলিয়ে দেবার জন্যে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—এগুলো কি জ্বলচে বনে?

খোকা চোখ খুলে চাইলে, এতক্ষণ চোখ বুজিয়ে রেখেছিল ভয়ে। চেয়ে দেখে বললে—জোনা পোকা।

ভবানী বললেন—কি পোকা বললি? চেয়ে দেখে বল—

—জোনা পোকা।

—মাকে গিয়ে বলবি?

—হুঁ।

—কোন্ মাকে বলবি?

—তিলুকে।

—কেন, নিলুকে না ?

—হু ।

—আর এক মায়ের নাম কি ?

—তিলু।

—তিলু তো হোলো, আর ?

—নিলু।

—আর একজন ?

—মা।

—আর এক মায়ের নাম বল—

—তিলু মা—

—দূর, তুই বুঝতে পারলি নে, তিলু মা হোলো, নিলু মা হোলো—আর একজন কে ?

—বিলু।

—ঠিক।

এখনো সামনে অগাধ বাঁশবনের মহাসমুদ্র। বড্ড অন্ধকার হয়ে এসেচে, আলোর ফুলের মত জোনাকী পোকা ফুটে উঠচে ঘন অন্ধকারে এ বনে ও বনে, এ ঝোপে ও ঝোপে। একটা পাখী কুস্বরে ডাকচে জিউলি গাছটায়। বনের মধ্যে ধুপ করে একটা শব্দ হোলো, একটা পাকা তাল পড়লো বোধ হয়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে নাটা-কাঁটার বনে।

খোকা আবার ভয়ে চুপ করে আছে।···

এমন সময়ে কোথায় দূরে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠলো। খোকা চোখ ভালো করে না চেয়ে দেখেই বললে—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা—নম নম—

ওর মায়েদের দেখাদেখি ও শিখেচে। একটুখানি চেয়ে দেখলে, চারদিকের অন্ধকার নিবিড়তর হয়েচে। ভয়ের স্বরে বললে—ও ভবানী—

—কি বাবা ?

—মার কাছে যাবো—ভয় করবে।

—চলো যাচ্চি তো—

—ভবানী—

—কি ?

—ভয় !

—কিসের ভয় ? কোনো ভয় নেই—

এই সময়ে কোথায় আবার শাঁখ বেজে উঠলো। খোকা অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললে—দুগ্‌গা দুগ্‌গা, নম নম।

ভবানী হেসে বললেন—ছাখো বাবা, এবার দুর্গানামে যদি ভয় কাটে···

সত্যি দুর্গানামে ভয় কেটে গেল। বনবাদাড় ছাড়িয়ে পাড়া আরম্ভ হয়ে গেল। ঘরে-ঘরে প্রদীপ জ্বলচে, গোয়ালে-গোয়ালে সাঁজাল দিয়েচে, সাঁজালের ধোঁয়া উঠচে চালকুমড়োর লতাপাতা ভেদ করে, ঝিঙের ফুল ফুটেচে বেড়ায় বেড়ায়।

ভবানী বললেন—ওই ছাখো আমাদের বাড়ি—

ঠিক সেই সময় আকাশের ঘন মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে। ঠাণ্ডা বাতাস বইলো। নিলু ছুটে এসে খোকাকে কোলে নিলে।

—ও আমার সোনা, ও আমার মানিক, কোথায় গিইছিলি রে ? বৃষ্টিতে ভিজে—আচ্ছা আপনার কি কাণ্ড, 'এই ভরা সন্দে মাথায়' মেঘে অন্ধকার বনবাদাড় দিয়ে ছেলেটাকে কি বলে নিয়ে এলেন ? অমন আসতি আছে ? তার ওপর আজ শনিবার—

খোকা খুব খুশি হয়ে মায়ের কোলে গেল একগাল হেসে।

তারপর দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিস্ময়ের স্বরে বললে— কাণ্ড কাণ্ড !

আজ বিলুর পালা। রাত অনেক হয়েচে। তিলু লালপাড় শাড়ি পরে পান সেজে দিয়ে গেল ভবানীকে। বললে—শিওরের জানলা বন্ধ করে দিয়ে যাবো ? বড়ো হাওয়া দিচ্চে বাদলার—

—তুমি আজ আসবে না ?

—না, আজ বিলু থাকবে।

—খোকা ?

—আমার কাছে থাকবে।

ভবানীর মন খারাপ হয়ে গেল। তিলুর পালার দিন খোকা এ ঘরেই থাকে, আজ তাকে দেখতে পাবেন না—ঘুমের ঘোরে সে তাঁর দিকে সরে এসে হাত কি পা দু'খানা ওঁর গায়ে তুলে দিয়ে ছোট্ট সুন্দর মুখখানি উঁচু ক'রে ঈষৎ হাঁ ক'রে ঘুমোয়। কি চমৎকার যে দেখায়!

আবার ভাবেন, কি অদ্ভুত শিল্প! ভগবানের অদ্ভুত শিল্প!

বিলু পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে এসে বিছানার একপাশে বসলো। হাতে পানের ডিবে।

ভবানী বললেন—এসো বিলুমণি, এসো—

বিলুর মুখ যেন ঈষৎ বিষণ্ণ। বললে—আমারে তো আপনি চান না!

—চাই নে ?

—চান না, সে আমি জানি। আপনি এখুনি দিদির কথা ভাবছিলেন।

—ভুল। খোকনের কথা ভাবছিলাম।

—খোকনকে নিয়ে আসবো ?

—না। তোমার কাছে সে রাতে থাকতে পারবে ?

—দাঁড়ান, নিয়ে আসি। খুব থাকতি পারবে।

একটু পরে ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়ে বিলু ঘরে ঢুকলো। হেসে বললো—দিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার পাশ থেকে খোকাকে চুরি করে এনেচি—

—সত্যি ?

—চলুন দেখবেন। অঘোরে ঘুমুচ্চে দিদি।

—ঘর বন্ধ করে নি ?

—ভেজিয়ে রেখে দিয়েচে—নিলু যাবে বলে। নিলু এখনো রান্নাঘরের কাজ সারচে। নিলু তো দিদির কাছেই আজ শোবে—দিদি ওবেলা বড়ির ডাল বেটে বড় নেতিয়ে পড়েচে। সোজা খাটুনিটা খাটে—

—খাটতে ছ্যাও কেন? ও হোলো খোকার মা। ওকে না খাটিয়ে তোমাদের তো খাটা উচিত।

—খাটতি দেয় কিনা! আপনি জানেন না আর! আপনার যত দরদ দিদির জন্যি। আমরা কেডা? কেউ নই। বানের জলে ভেসে এসেচি। নিন, পান খাবেন?

—খোকনের গায়ে কাঁথাখানা বেশ ভালো করে দিয়ে দাও। বড্ড ঠাণ্ডা আজ। পান সাজলে কে?

—নিলু। জানেন আজ নিলুর বড্ড ইচ্ছে ও আপনার কাছে থাকে।

—বাঃ, তুমি দিলে না কেন?

—ঐ যে বললাম, আপনি সবতাতে আমার দোষ দেখেন। দিদির সব ভালো, নিলুর সব ভালো। আমার মরণ যদি হোতো—

ভবানী জানেন, বিলু এরকম অভিমান আজকাল প্রায়ই প্রকাশ করে।

ওর মনে কেন যে এই ধরনের ক্ষোভ! মনে মনে হয়তো বিলু অসুখী। খুব শান্ত, চাপা স্বভাব—তবুও মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় মনের দুঃখ। তাই তো, কেন এমন হয়? তিনি বিলুকে কখনো অনাদর করেন নি সজ্ঞানে। কিন্তু মেয়েমানুষের সূক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টি হয়তো এড়ায় নি, হয়তো সে বুঝতে পেরেচে তাঁর সামান্য কোনো কথায়, বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে যে তিনি সব সময় তিলুকে চান। মুখে না বললেও হয়তো ও বুঝতে পারে।

দুঃখ হোলো ভবানীর। তিন বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করে বড় ভুল করেচেন। তখন বুঝতে পারেন নি—এ অভিজ্ঞতা কি করে থাকবে সন্ন্যাসী পরিব্রাজক মানুষের! তখন একটা ভাবের ঝোঁকে করেছিলেন, বয়স্থা কুলীন কুমারীদের উদ্ধার করবার ঝোঁকে। কিন্তু উদ্ধার করে তাদের সুখী করতে পারবেন কিনা তা তখন মাথায় আসে নি।

মনে ভেবে দেখলেন, সত্যি তিনি বিলুকে অনাদর করে এসেচেন। সজ্ঞানে করেন নি, কিন্তু যে ভাবেই করুন বিলু তা বুঝেচে। দুঃখ হয় সত্যিই ওর জন্যে।

ভবানী দেখলেন, বিলু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে কাঁদচে।

ওকে হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ছিঃ বিলু, ও কি ? পাগলের মত কাঁদচ কেন ?

বিলু কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার মরণই ভালো সত্যি বলচি, আপনি পরম গুরু, এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি পথের কাঁটা সরে যাই, আপনি দিদিকে নিয়ে, নিলুকে নিয়ে সুখী হোন।

—ও রকম কথা বলতে নেই, বিলু। আমি কবে তোমার অনাদর করিচি বলো ?

—ও কথা ছেড়ে দিন, আমি কিছু বলচি নে তো আপনাকে! সব আমার অদেষ্ট। কারো দোষ নেই—সরুন তো, খোকার ঘাড়টা সোজা করে শোয়াই—

ভবানী বিলুর হাত ধরে বললেন—হয়তো আমার ভুল হয়ে গিয়েচে বিলু! তখন বুঝতে পারি নি—

বিলু সত্যি ভবানীর আদরে খানিকটা যেন দুঃখ ভুলে গেল। বললে—না, অমন বলবেন না—

—না, সত্যি বলচি—

—খান একটা পান খান। আমার কথা ধরবেন না, আমি একটা পাগল—

এত অল্পেই বিলু সন্তুষ্ট! ভবানীর বড় দুঃখ হল আজ ওর জন্যে। কত হাসি-খুশি ওর মুখে দেখেছিলেন বিয়ের সময়ে, কত আশার ফুল ফুটে উঠেছিল ওর চোখের তারায় সেদিন। কেন ও ! জীবনটা তিনি নষ্ট করলেন ?

ইচ্ছে করে কিছুই করেন নি। কেন এমন হোলো কি জানি!

বিলুকে অনেক মিষ্টি কথা বলেন সেরাত্রে ভবানী। কত ভবিষ্যতের ছবি এঁকে সামনে ধরেন। তিনি যা পারেন নি, খোকা তা করবে। খোকা তার মা'দের সমান চোখে দেখবে। বিলু মনে যেন কোনো ক্ষোভ না রাখে।

মেঘভাঙা চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েচে। অনেক রাত হয়েচে ডুমুর গাছে রাত-জাগা কি পাখী ডাকচে।

হঠাৎ বিলু বললে—আচ্ছা আমি যদি মরে যাই, তুমি কাঁদবে নাগর ?

—ও আবার কি কথা ?

হেসে বিলু খোকার কাছে এসে বললে—কেমন সুন্দর দেয়ালা করচে দেখুন —স্বপ্ন দেখে কেমন সুন্দর হাসচে!...

সেবার পূজার পর বর্ষাশেষে কাশফুল ফুটেচে ইছামতীর দু'ধারে, গাঙের জল নেড়ে মাঠ ছুঁয়েচে, সকালবেলার সূর্যের আলো পড়েচে নাটা-কাঁটা বনের ঝোপে।

ছেলেমেয়েরা নদীর ধারে চোদ্দ শাক তুলতে গিয়েচে কালীপূজোর আগের দিন। একটি ছোট মেয়ে ভবানীর ছেলে টুলুর কাছে এসে বললে—তুই কিছু তুলতে পারচিস নে—দে আমার কাছে—

টুলু বললে—কি দেব? আমিও তুলবো। কৈ দেখি—

—এই ছাখ কত শাক, গাঁদামনি, বৌ-টুনটুনি, সাদা নটে, রাঙা নটে, গোয়ালনটে, ক্ষুদে ননী, শান্তি শাক, মটরের শাক, কাঁচড়াদাম কলমি, পুনর্ণবা—এখনো তুলবো রাঙা আলুরশাক, ছোলারশাক, আর পালংশাক—এই চোদ্দ। তুই ছেলেমানুষ, শাকের কি চিনিস্?

—আমায় চিনিয়ে ছাও, বাঃ—ও সয়ে দিদি—

অপেক্ষাকৃত একটি বড় মেয়ে এসে টুলুকে কাছে নিয়ে বললে—কেন ওকে ওরকম করচিস বীণা? ও ছেলেমানুষ, শাক চিনবে কি করে? আয় আমার সঙ্গে রে টুলু—

ফণি চক্কত্তির নাতি অন্নদা বললে—এত লোক জমচে কেন রে ওপারে? এই সকালবেলা?

সত্যিই, সকলে চেয়ে দেখলে নদীর ওপারে বহুলোক এসে জমেচে, কারো কারো হাতে কাপড়ের নিশেন। দেখতে দেখতে এপারেও অনেক লোক আসতে আরম্ভ করলে। অন্নদা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু বড়, সে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলে—ও কাপালী কাকা, আজ কি এখেনে?

যারা জমেচে এসে তারা সবাই চাষী লোক, বিভিন্ন গ্রামের। ওদের অনেককে এরা চেনে, দু'দশবার দেখেচে, বাকি লোকদের আদৌ চেনে না। একজন বললে—আজ ছোটলাটের কলের নৌকো যাবে নদী দিয়ে—নীলকুঠির

অত্যাচার হচ্চে, তাই দেখতি আসচে। সব পেরজা খেপে গিয়েচে, যশোর-নদে জেলায় একটা নীলির গাছ কেউ বুনবে না। তাই মোরা এসে দাঁড়িয়েচি ছোটলাট সায়েবরে জানাতি যে মোরা নীলচাষ করবো না—

টুলু শুনে অবাক হয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইল। খানিকটা কি ভেবে অন্নদাকে জিগ্যেস করলে—নীল কি দাদা?

—নীল একরকম গাছ। নীলকুঠির সায়েব টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যায় দেখিস নি?

—কলের নৌকো দেখবো আমি—টুলু ঘাড় দুলিয়ে বললে।

—চোদ্দ শাক তুলবি নে বুঝি? ওরে দুষ্টু—

অন্নদা ওকে আদর করে এক টানে এতটুকু ছেলেকে কোলে তুলে নিলে।

কিন্তু শুধু টুলু নয়, চোদ্দশাক তোলা উল্টে গেল সব ছেলেমেয়েরই। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল নদীর দু'ধার। দুপুরের আগে ছোটলাট আসচেন কলের নৌকোতে। চাষী লোকেরা জিগীর দিতে লাগলো মাঝে মাঝে। গ্রামের বহু ভদ্রলোক—নীলমণি সমাদ্দার, ফণি চক্কত্তি, শ্যাম গাঙ্গুলী, আরও অনেকে এসে নদীর ধারের কদমতলায় দাঁড়ালো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে ছেলেকে ডাকলেন—ও খোকা—

টুলু হাসিমুখে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে বললে—এই যে বাবা—

—চোদ্দ শাক তুলেচিস? তোর মা বলছিল—

—উঁহু বাবা। কে আসচে বাবা?

—ছোটলাট সার উইলিয়াম গ্রে—

—কি নাম? সার উইলিয়াম গ্রে?

—বাঃ, এই তো তোর জিবে বেশ এসে গিয়েচে!

আমি এখন বাড়ি যাবো না। ছোটলাট দেখবো।

—দেখিস এখন। বাড়ি যাবি, তোকে মুড়ি খাইয়ে আনি—

—না বাবা। আমি দেখি।

বেলা অনেকটা বাড়লো। রোদ চড়-চড় করচে। টুলুর খিদে পেয়েচে কিন্তু সে সব কষ্ট ভুলে গিয়েচে লোকজনের ভিড় দেখে।

থোকা বললে—ও বাবা—

—কি রে?

—কলের নৌকো কি রকম বাবা?

—তাকে ইষ্টিমার বলে। দেখিস এখন। ধোঁয়া ওড়ে—

—খুব ধোঁয়া ওড়ে?

—হুঁ।

—কেন বাবা?

—আগুন দেয় কিনা তাই।

এমন সময় বহুদূরের জনতা থেকে একটা চীৎকার শব্দ উঠলো। টুলু বললে—বাবা আমাকে কোলে কর—

ভবানী খোকাকে কাঁধে বসিয়ে উঁচু করে ধরলেন। বললেন—দেখতে পাচ্চিস?

খোকা ঘাড় দুলিয়ে চোখ সামনে থেকে আদৌ না ফিরিয়ে বললে—হু—উ—উ—

—কি দেখচিস?

—ধোঁয়া উঠচে বাবা—

—কলের নৌকো দেখতে পেলি?

—না বাবা, ধোঁয়া—ওঃ, কি ধোঁয়া!

অল্পক্ষণ পরে টুলুকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে মস্ত বড় কলের নৌকোটা একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর সামনে এসে উপস্থিত হোলো। জনতা "নীল মোরা করবো না লাটসায়েব, দোহাই মা মহারাণীর।" বলে চীৎকার ক'রে উঠলো। কলের নৌকোয় সামনে কাঠের কেদারায় বসে আছে অনেকগুলো সাহেব। নীলকুঠির যেমন একটা সাহেব নদীর ধারে পাখী মারছিল সেদিন অমনি দেখতে। ওদের মধ্যে একটা সাহেব ও কি করচে?

টুলু বললে—বাবা—

—চুপ কর—

—বাবা—

—আঃ, কি ?

—ও সায়েব অমন করচে কেন ?

—সবাইকে নমস্কার করচে।

—ও কে বাবা ?

—ওই সেই ছোটলাট। কি নাম বলে দিয়েচি ?

—মনে নেই বাবা।

—মনে থাকে না কেন খোকা ? ভারি অন্যায়। সার—

টুলু খানিকটা ভেবে নিয়ে বললে—উলিয়াম গ্রে—

—উইলিয়াম গ্রে—চলো এবার বাড়ি যাই—

—আর একটু দেখি বাবা—

—আর কি দেখবে ? সব তো চলে গেল।

—কোথায় গেল বাবা ?

—ইছামতী বেয়ে চূর্ণাতে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে গঙ্গায় পড়বে। তারপর কলকাতায় ফিরবে।

টুলু বাবার কাঁধ থেকে নেমে গুটগুট ক'রে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি চললো। সামনে পেছনে গ্রাম্যলোকের ভিড়। সকলেই কথা বলতে বলতে যাচ্চে। টুলু এমন জিনিস তার ক্ষুদ্র চার বছরের জীবনে আর দেখে নি। সে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েচে আজকার ব্যাপার দেখে। কি বড় কলের নৌকোখানা! কি জলের আছড়ানি ডাঙার ওপরে, নৌকোখানা যখন চলে গেল, কি ধোঁয়া! কেমন সব সাদা সাদা সায়েব!

তিলু বললে—কি দেখলি রে খোকা ?

খোকা তখন মার কাছে বর্ণনা করতে বসলো। দু'হাত নেড়ে কত ভাবে সেই আশ্চর্য ঘটনাটি মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে।

নিলু বললে—রাখ্—এখন চল আগে গিয়ে খেয়ে নিবি—আয়—

বিলু নেই। গত আষাঢ় মাসের এক বৃষ্টিধারামুখর বাদল রাত্রে স্বামীর কোলে

মাথা রেখে স্বামীর হাত দুটি ধরে তিন দিনের জ্বরবিকারে মারা গিয়েচে।

মৃত্যুর আগে গভীর রাত্রে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তুমি কে গো?

ভবানী মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে—আমি। কথা বোলো না। চুপটি করে শুয়ে থাকো, লক্ষ্মী—

—একটা কথা বলবো?

—কী?

—আমার ওপর রাগ করনি? শোনো—কত কথা তোমায় বলি নাগর—

—কাঁদচ নাকি? ছিঃ, ও কি?

—খোকনকে আমার পাশে নিয়ে এসে শুইয়ে দ্যাও। দ্যাও না গো?

—আনচি, এই যাই—তিলু তো এই বসে ছিল, দুটো ভাত খেতে গেল এই উঠে—তুমি কথা বোলো না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থাকার পর ভবানীর মনে হোলো বিলুর কপাল বড় ঘামচে। এখন কপাল ঘামচে, তবে কি জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে? তিলু খেয়ে এলে রামকানাই কবিরাজের কাছে তিনি একবার যাবেন। খানিক পরে বিলু হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে বললে—ওগো, কাছে এসো না—আপনারে তুমি বলচি, আমার পাপ হবে? তা হোক্ বলি, আর বলতি পারবো না তো! তুমি আবার আমার হবে, সামনের জন্মে হবে?—হয়ো, হয়ো—খোকাকে দুধ খাওয়ায় নি দিদি, ডাকো—

—কি সব বাজে কথা বকচো? চুপ ক'রে থাকতে বললাম না?

—খোকন কই? খোকন?

এই তার শেষ কথা। সেই যে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল, যখন খোকনকে নিয়ে এসে তিলু-নিলু ওর পাশে শুইয়ে দিলে, তখন আর ফিরে চায় নি। ভবানী বাঁড়ুয্যে রামকানাই কবিরাজের বাড়ি গেলেন তাঁকে ডাকতে। রামকানাই এসে নাড়ি দেখে বললেন—অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েচে—খোকাকে তুলে নিন মা—

নীলবিদ্রোহ তিন জেলায় সমান দাপটে চললো। সার উইলিয়ম গ্রে সব দেখে গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠালেন, নীলকরদের ইতিহাসে সে একখানা বিখ্যাত দলিল। তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল এর দু'বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশী কোনো বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর পাড়ি দিলে। দু'একটা কুঠির কাজ পূর্ববৎ চলতে লাগলো তবে সে দাপটের সিকিও কোথাও ছিল না।

শেষোক্ত দলের একজন হচ্ছে শিপ্‌টন সাহেব। ডেভিড্ সাহেব চলে গিয়েছিল স্ত্রীপুত্র নিয়ে, কিন্তু শিপটন্ ছাড়বার পাত্র নয়—হরকালী সুরের সাহায্য নিয়ে মিঃ শিপ্‌টন্ কুঠি চালাতে লাগলো আগেকার মত। পুরাতন কর্মচারীরা সবাই আগের মত কাজ চালাতে লাগলো।

নীলকর সাহেবদের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েচে আজকাল। আশপাশে কোনো নীলকুঠিতে আর সাহেব নেই, কুঠি বিক্রি করে চলে গিয়েচে। দু'একটা কুঠিতে সাহেব আছে, কিন্তু তারা নীলচাষ করে সামান্য, জমিদারি আছে—তাই চালায়।

এই পল্লীর নিভৃত অন্তরালে পুরনো সাহেব শিপ্‌টন্ পূর্ববৎ দাপটেই কিন্তু কাজ চালাচ্ছিল, ওকে আগের মত ভয়ও করে অনেকে। নীলবিদ্রোহের উত্তেজনা থেমে যাবার পরে সাহেবের প্রতি ভয়-ভক্তি আবার ফিরে এসেছিল। হরকালী সুরও গোঁপে চাড়া দিয়েই বেড়া। সাহেব টম্‌টম্ হাঁকিয়ে গেলে এখনো লোক সম্ভ্রমের চোখে চেয়ে দেখে। একদিন শিপ্‌টন্ তাকে ডেকে বললে—ডেওয়ান, এবার দুর্গা পূজা কবে হইবে?

হরকালী সুর বললেন—আশ্বিন মাসের দিকে, হুজুর।

--এবার কুঠিতে পূজা করো—

—খুব ভাল কথা হুজুর। বলেন তো সব ব্যবস্থা করি—

—যা টাকা খরচ হইবে, আমি দিবে। কবির গান দিটে হইবে।

—আজ্ঞে গোবিন্দ অধিকারীর ভালো যাত্রার দল বায়না ক'রে আসি হুকুম করুন।

—সে কি আছে ?

—যাত্রা, হুজুর। সেজে এসে, এই ধরুন রাম, সীতা, রাবণ—

—Oh understand, like a theatre. বেশ টুমি ঠিক কর—আমি টাকা দিবে।

—কোথায় হবে ?

—হলঘরে হইটে পারে।

—না হুজুর, বড় মাঠে পাল টাঙিয়ে আসর করতে হবে। গোবিন্দ অধিকারীর দল, অনেক লোক হবে।

—টুমি লইয়া আসিবে।

সেবার পূজার সময় এক কাণ্ড হোলো গ্রামে। নীলকুঠিতে প্রকাণ্ড বড় দুর্গাপ্রতিমা গড়া হোলো। মনসাপোতার বিশ্বম্ভর ঢুলি এসে তিন দিন বাজালে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনতে সতেরোখানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়লো।

তিলু স্বামীকে বললে—শুনুন, নিলু যাত্রা দেখতে যাবে বলচে কুঠিতে।

—সেটা কি ভালো দেখায়? মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েচে কিনা —গাঁয়ের আর কেউ যাবে ?

—নিস্তারিণী যাবে বলছিল। নালু পালের বৌ তুলসী যাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে—

—তারা বড়লোক, তাদের কথা ছেড়ে দাও। নালু পালের অবস্থা আজকাল গ্রামের মধ্যে সেরা। তারা কিসে যাবে ?

—বোধহয় পালকিতে। ওর বড় পালকি, নিলু ওতে যেতে পারে।

—গরুর গাড়ি ক'রে দেবো এখন। তুমিও যেও।

—আমি আর যাবো না—

—না কেন, যদি সবাই যায় তুমিও যাবে—

খোকার ভারি আনন্দ অত বড় ঠাকুর দেখে অমন সুন্দর যাত্রা দেখে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ যাবার অনুমতি পায় নি সমাজপতি৺চন্দ্র চাটুয্যের ছেলে কৈলাস চাটুয্যের।

হেমন্তের প্রথমে একদিন বিকালে শিপ্‌টন্ সাহেব ডাকালে হরকালী সুরকে। বললে—ডেওয়ান, গোলমাল হইলো—

—কি সায়েব ?

—এবার নীলকুঠি উঠিলো—

—কেন হুজুর ? আবার কোনো গোলমাল—

—কিছু না। সে গোলমাল আছে না। না, এ অন্য গোলমাল আছে। এক ডেশ আছে জার্মানি, টুমি জানে ? ও ডেশ হইটে নীল রং ইণ্ডিয়ায় আসিলো, সব দেশে বিক্রয় হইলো।

—সে দেশে কি নীলের চাষ হচ্ছে হুজুর ?

—সে কেন ? টুমি বুঝিলে না। কেমিক্যাল নীল হইটেছে—আসল, নীল নয়, নকল নীল। গাছ হইটে নয়—অন্য উপায়ে—by synthetic process—টুমি বুঝিবে না।

—ভালো নীল ?

—চমট্‌কার। আমি সেইজন্যই টোমাকে ডাকাইলাম—এই ডেখো—

হরকালী সুরের সামনে শিপ্‌টন্ একটা নীলরংয়ের বড়ি রেখে দিলে। অভিজ্ঞ হরকালী সেটা নেড়েচেড়ে দেখে সেটার রং পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললে না।

—ডেখিলে—

—হাঁ সায়েব।

—এ রং চলিলে আমাদের নীল রং কেন লোক কিনিবে ?

—এর দাম কত ?

শিপ্‌টন্ হেসে বললে—টাহা আগে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন ? আমি ভাবিটেছি ডেওয়ানের কি মাথা খারাপ হইল... ? কত হইটে পারে ?

—চার টাকা পাউণ্ড।

—এক টাকা পাউণ্ড, জোর ডেড় টাকা পাউণ্ড। হোলসেল হাণ্ড্রেড-ওয়েট

নাইনটি রুপীজ—নব্বুই টাকা। আমাদের ব্যবসা একডম gone west—মাটি হইলো। মারা যাইলো।

হরকালী সুর এ ব্যাপারে অনেকদিন লিপ্ত আছে। নীল সংক্রান্ত কাজে বিষম ঘুণ। সে বুঝে-সুজে চুপ করে গেল। সে কি বলবে? সে ভাবষ্যতের ছবি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে;

চাষের নীল বাজারে আর চলবে না। খরচ না পোষালে নীলচাষ অচল ও বাতিল হয়ে যাবে। সে ভাবলে—এবার ঘুনি ডাঙায় উঠে যাবে সায়েবের!

সেদিন হেমন্ত অপরাহ্ণে বড় সাহেব জেন্‌কিন্‌স শিপ্‌টন্ সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিল। রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা, হরিশ মুখুয্যের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ, পাদ্রি লংয়ের আন্দোলন (দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এ সময়ের পরের ব্যাপার), নদীয়া যশোরের প্রজাবিদ্রোহ, স্যার উইলিয়ম গ্রে'র গুপ্ত রিপোর্ট যে কাজ হাসিল করতে পারে নি, জার্মানি থেকে আগত কৃত্রিম নীলবড়ি অতি অল্পদিনের মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত করলে। কয়েক বছরের মধ্যে নীলচাষ একদম বাংলাদেশ থেকে উঠে গিয়েছিল।

শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম বিলাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। একটিমাত্র মেয়ে, সে সেখানেই তার ঠাকুরদাদার বাড়ি থাকে। শিপ্‌টন্ সাহেব এ দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইলে না।

একদিন নীলকুঠির বড় বারান্দার পাশে ছোট ঘরটাতে শুয়ে শুয়ে ইণ্ডিয়ান কর্ক গাছের সুগন্ধি শ্বেত পুষ্পগুচ্ছের দিকে চেয়ে সে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল। অন্যদিনের কথা।—

অনেকদূর ওয়েস্টমোর-ল্যাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লী। কেউ নেই আজ সেখানে। বৃদ্ধা মাতা ছিলেন, কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়েছেন। এক ভাই অষ্ট্রেলিয়াতে থাকে, ছেলেপুলে নিয়ে।—

তাদের গ্রামের সেই ছোট হোটেল—আগে ছিল একটা সরাইখানা, উইলিয়ম রিট্‌সন ছিল ল্যাণ্ডলর্ড তখন—কত লোকের ভিড় হোতো সেখানে! ল্যাঙডেল পাইক্‌স আর গ্রেট গেব্‌ল্ সামনে পড়তো···পনেরো শো ফুট উঁচু

পাহাড়·· ঐ সরাইখানায় কি ভিড় হয়তো যারা পাহাড় ছুটোতে উঠবে তাদের···

জলের ধারে উইলো আর মাউণ্টেন সেজ— বরোডেল গ্রামের পাশ কাটিয়ে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে চলে গেল পথটা—কতবার ছেলেবেলায় মস্ত একটা বড় কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে একা গিয়েচে বেড়াতে।— একটা বড় জলাশয়ে মাছ ধরতেও গিয়েচে কতদিন— এল্‌টার ওয়াটার— নামটা কত পুরনো শোনাচ্চে যেন। এল্‌টার ওয়াটার—এত বড় বড় পাইক আর স্থামন মাছ— কি মজা করেই ধরতো— হাইনোজ পাস যখন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েচে, তখন মাছ ঝুলিয়ে হাতে করে আসচে এল্‌টার ওয়াটার থেকে— পেছনে পেছনে আসচে ভালো ব্রীডের গ্রেট ডেন কুকুরটা, মনে পড়ে—The eagles is screamin' around us, the river's a-moanin' below—

গ্রাম্য ছড়া। এ্যাণ্ডি গাইত ছেলেবেলায়। মাছ ধরতে বসে এল্‌টার ওয়াটারের তীরে সে নিজেও কতবার গেয়েচে!

পুরানো দিনের স্বপ্ন—

— গয়া, গয়া?

গয়া এসে বলে— কি সায়েব?

— কাছে বসিয়া থাকো ডিয়ারি— what have you been up to all day? কোথায় ছিলে? কি করিটেছিলে?

—বসে আছি তো। কি আবার করবো।

— If I die here— যদি মরিয়া যাই টুমি কি করিবে?

— ও কি কথা? অমন বলে না, ছি:—

— টোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই কিন্টু রাখিবে কোথায়? চুরি ডাকাটি হইয়া যাইবে।

শিপ্‌টন্ সাহেব হি: হি: ক'রে হেসে উঠলো, বললে— একটা গান শোনো গয়া—listen carefully to the word— কঠা শুনিয়া যাও। Modern, you know?

গয়া বললে—আঃ, কি গাও না ? কটর-মটর ভালো লাগে না—

—Well, শোনো—

Yes, yes, the arm-y
How we love the arm-y
When the swallows come again
See them fly—the arm-y—

গয়া কানে আঙুল দিয়ে বললে—ওঃ বাবা, কান গেল, অত চেঁচায় না। ওর নাম কি সুর!

সাহেব বললে—ভালো লাগিল না! আচ্ছা টুমি একটা গাও—সেই যে—টোমার বডন চাঁদে যদি চরা নাহি পাবো—

—না সায়েব। গান এখন থাক।

—গয়া—

—কি ?

—আমি মরিলে টুমি কি করিবে ?

—ও সব কথা বলে না, ছিঃ—

—No, I am no milksop, I tell you—আমি কাজ বুঝি। নীল-কুঠির কাজ শেষ হইলো। আমি চলিয়া যাইব, না এখানে ঠাকিব ?

—কোথায় যাবে সায়েব ? এখানেই থাকো।

—টুমি আমার কাছে ঠাকিবে ?

—থাকবো সায়েব।

—কোঠাও যাইবে না ?

—না, সায়েব।

—ঠিক ? May I take it as a pledge ? ঠিক মনের কঠা বলিলে ?

—ঠিক বলচি সায়েব। চিরকাল তোমার কাছে আছি, অনেক খাইয়েচ মাখিয়েচ—আজ তোমার অসময়ে তোমারে ফেলে কনে যাবো ? গেলি ধম্মে সইবে, সায়েব!

পয়ামেঘকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে পিপটন্ বললে—Oh, my dear, dearie—you are not afriad of the Big Bad Wolf…I call it a brave girl!

নিস্তারিণী নাইতে নেমেছিল ইছামতীর জলে। কূলে কূলে ভরা ভাদ্রের নদী, তিৎপল্লার বড় বড় হলুদ ফুল ঝোপের মাথা আলো করেচে, ওপারের চরে সাদা কাশের গুচ্ছ দুলচে সোনালী হাওয়ায়, নীল বনকলমীর ফুলে ছেয়ে গিয়েচে সাঁইবাবলা আর কেঁয়ে-ঝাঁকার জঙ্গল, জলের ধারে বনকচুর ফুলের শিষ, জলজ চাঁদা ঘাসের বেগুনী ফুল ফুটে আছে তটপ্রান্তে, মটরলতা দুলচে জলের ওপরে, ছপাং ছপাং করে ঢেউ লাগচে জলে অর্ধমগ্ন বন্তেবুড়ো গাছের ডালপালায়।

কেউ কোথাও নেই দেখে নিস্তারিণীর বড় ইচ্ছে হোলো ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে। খরস্রোতা ভাদ্রের নদী, কুটো পড়লে দুখানা হয়ে যায়—কামট কুমীরের ভয়ে এ সময়ে কেউ নামতে চায় না জলে। নিস্তারিণী এসব গ্রাহ্যও করে না, ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দেওয়ার আরাম যে কি, যারা কখনো তা আস্বাদ করে নি, তাদের নিস্তারিণী কি বোঝাবে এর মর্ম? তুমি চলেচ স্রোতে নীত হয়ে ভাটির দিকে, পাশে পাশে চলেচে কচুরিপানার ফুল, টোকাপানার দাম, তেলাকুচো লতার টুকটুকে পাকা ফল সবুজের আড়াল থেকে উঁকি মারচে, গাঙশালিখ পানা-শেওলার দামে কিচকিচ করচে—কি আনন্দ! মুক্তির আনন্দ! নিয়ে যাবে কুমীরে, গেলই নিয়ে। সেও যেন এক অপূর্বতর, বিস্তৃততর মুক্তির আনন্দ!

অনেকদূর এসে নিস্তারিণী দেখলে গাঁয়ের ঘাটগুলো সব পেরিয়ে এসেচে। সামনে কিছুদূরে পাঁচপোতা গ্রাম শেষ হয়ে ভাসানপোতা গ্রামের গয়লাপাড়ার ঘাট। ডাইনে বনাবৃত তীরভূমি, বাঁয়ে ওপারে পটলের ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত—আরামডাঙার চাষীদের। সে ভুল করেচে, এতদূর আসা উচিত হয় নি একা একা। কে কি বলবে! এখন খরস্রোতা নদীর উজানে স্রোত ঠেলে সাঁতার দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এগুনোও উচিত নয়। দক্ষিণ তীরের বনজঙ্গলের

মধ্যে নামা যুক্তিসঙ্গত হবে কি? হেঁটে বাড়ি যেতে হবে ডাঙার ডাঙায়। পথও তো সে চেনে না।

সাঁতার দিয়ে ডাঙার দিকে সে এল এগিয়ে। বন্যেবুড়ো গাছের সারি সেখানে নত হয়ে পড়েচে নদীর জলের উপর ঝুঁকে, গাছে-পালায় লতায় পাতায় নিবিড়তর জড়াজড়ি, বন্য বিহঙ্গের দল জুটে কিচ কিচ্ করচে ঝোপের পাকা তেলাকুচো ফল খাওয়ার লোভে। বনের মধ্যে শুকনো পাতার ওপর কিসের খস্খস্ শব্দ—কি একটা জানোয়ার যেন ছুটে পালালো, বোধ হয় খেঁকশিয়ালী।

ডাঙায় ওঠবার আগে হাতের বাউটি জোড়া উঠিয়ে নিলে কব্জির দিকে, সিক্ত বসন ভালো ক'রে এঁটে পরে, কালো চুলের রাশ কপালের ওপর থেকে দু'পাশে সরিয়ে যখন সে ডান পা খানা তুলেচে বালির ওপর, অমনি একটা ঝিনুকের ওপর পা পড়লো ওর। ঝিনুকটা সে পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে শক্ত ক'রে মুঠি বেঁধে নিলে। তারপর ভয়ে ভয়ে বনের মধ্যেকার সুঁড়ি পথ দিয়ে বিছুটিলতার কর্কশ স্পর্শ গায়ে মেখে, সেয়াকুল-কাঁটায় শাড়ির প্রান্ত ছিঁড়ে অতিকষ্টে এসে সে গ্রাম-প্রান্তের কাওরাপাড়ার পথে পা দিলে। কাওরাদের বাড়ির ঝি-বৌয়ের দল ওর দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলে। খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেও বটে। ব্রাহ্মণপাড়ার বৌ, একা কোথায় এসেছিল এতদূর? ভিজে কাপড়, ভিজে চুলে?

বাড়ি পৌঁছে নিস্তারিণী দেখলে বাড়িতে ও পাড়ায় গোলমাল চলেচে, কান্নাকাটির রব শোনা যাচ্চে তার শাশুড়ীর, পিস্শাশুড়ীর। সে জলে ডুবে গিয়েচে বা তাকে কুমীরে নিয়ে গিয়েচে এই হয়েচে সিদ্ধান্ত। ফিরতে দেরি হচ্চে দেখে যারা স্নানের ঘাটে ওকে দৌড়ে দেখতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে বলেচে কোনো চিহ্নই ওর নেই কোনো দিকে। ওকে দেখে সবাই খুব খুশি হোলো। শাশুড়ী এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। প্রতিবেশিনীরা এসে স্নেহের অনুযোগ করলে কত রকম।

ভাত খাওয়ার পরে ননদ সুধামুখীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের পেছনের কুলতলায় সেই ঝিনুকখানা খুললে নিস্তারিণী। ঝিনুকের শাঁক দুজনে ঘেঁটে

ঘেঁটে দেখতে লাগলো। এসব গাঁয়ের সকলেই দেখে ঝিনুক পেলে। কুলের বীচির মত জিনিস হাতে ঠেকলো ওর।

—কি রে ঠাকুরঝি, এটা ত্যাখ তো?

—ওরে, এ ঠিক মুক্তো।

—দূর—

—ঠিক বলচি বৌদিদি। মাইরি মুক্তো।

—তুই কি ক'রে জানলি মুক্তো?

—চ দেখাবি মাকে।

—না ভাই ঠাকুরঝি এসব কাউকে দেখাস নে।

—চল না, তোর লজ্জা কিসের?

পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল এ বাড়ির বৌ ইছামতীতে নামী মুক্তো পেয়েচে ইছামতীর জলে। চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে দিনকতক এ কথা ছাড়া আর অন্য কথা রইল না। একদিন বিধু স্যাকরা এসে মুক্তোটা দেখেশুনে দর দিলে ষাট টাকা। নিস্তারিণীর স্বামী কখনো এত টাকা একসঙ্গে দেখে নি। বিধু স্যাকরা মুক্তোটা নিয়ে চলে যাবার কিছু আগে নিস্তারিণীর কি মনে হোলো, সে বললে—ও মুক্তো আমি বেচবো না—

সেইদিনই একজন মুসলমান ওদের বাড়ি এসে মুক্তোটা দেখতে চাইলে। দেখেশুনে দাম দিলে একশো টাকা নিস্তারিণী তবুও মুক্তো বিক্রি করতে চাইলে না।

এদিকে গাঁয়ের মধ্যে হুলুস্থুল। অমুকের বৌ একশো টাকা দামের মুক্তো পেয়েচে ইছামতীর জলে। একশো টাকা একসঙ্গে কে দেখেচে এই পাঁচপোতা গ্রামের মধ্যে? ভাগ্যিটা বড় ভালো ওদের। বৌয়ের দল ভিড় ক'রে ওর কপালে সিঁদুর দিতে এল, ওর শাশুড়ী নরহরিপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে মানতের পুজো দিয়ে এল। এ পাকা কলা পাঠিয়ে দেয়, ও পেঁপে পাঠিয়ে দেয়।

তিলুর সঙ্গে একদিন নিস্তারিণী দেখা করতে এলো। মুক্তোটা সে নিয়েই এসেচে। খোকা সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে

বললে—কি এটা ?

—মুক্তো।

—মুক্তো কি মা ?

—ঝিনুকের মধ্যি থাকে।

নিস্তারিণী খোকাকে কোলে নিয়ে বললে—ওকে আমি এটা দিয়ে দিতে পারি, দিদি।

—না, ও কি করবে ওটা ভাই ?

—সত্যি, দেবো ? ওর মুখ দেখলি আমি সব যেন ভুলে যাই—

তিলু নিস্তারিণীকে অতি কষ্টে নিবৃত্ত করলে। নিস্তারিণী খুব সুন্দরী নয় কিন্তু ওর দিক থেকে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। গ্রাম্যবধূর লজ্জা ও সংকোচ ওর নেই, অনেকটা পুরুষালি ভাব, ছেলেবেলায় গাছে চড়তে আর সাঁতার দিতে পটু ছিল খুব। ওর আর একটা দোষ হচ্চে কাউকে বড় একটা ভয় করে না, শাশুড়ীকে তো নয়ই, স্বামীকেও নয়।

তিলু ওকে ভালোবাসে। এই সমস্ত গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ, ভীরু গতানুগতিকতা এই অল্পবয়সী বধূকে তার জালে জড়াতে পারে নি। এ যেন অন্য যুগের মেয়ে, ভুল ক'রে অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে এসে জন্মেচে।

তিলু বললে—কিছু খাবি ?

—না।

—খই আর শসা ?

—তাও দিনি। বেশ লাগে।

এই নিস্তারিণীকেই একদিন তিলু অদ্ভুতভাবে নদীর ধারে আবিষ্কার করলে ঝোপের আড়ালে রায়পাড়ার কৃষ্ণকিশোর রায়ের ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে গোপনীয় আলাপে মত্ত অবস্থায়।

তিলু গিয়েছিল খোকাকে নিয়ে নদীতে গা ধুতে। বিকেলবেলা, হেমন্তের প্রথম, নদীর জল সামান্য কিছু শুকুতে আরম্ভ করেচে, শুকনো কালো ঘাসের

গন্ধে বাতাস ভরপুর, নদীর ধারের পলিমাটির কাদায় কাশফুল উড়ে পড়ে বীজসুদ্ধ আটকে যাচ্চে, নদীর ধারের ছাতিম গাছটাতে থোকা থোকা ছাতিম ফুল ফুটে আছে, সপ্তপর্ণ পুষ্পের সুরভি ভুর ভুর করচে হেমন্ত অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ও একটুখানি ঠাণ্ডার আমেজ লাগা বাতাসে।

এই সময় ভবানী স্ত্রী ও খোকার সঙ্গে নদীর ধারে প্রায়ই যান। নদীর এই শান্ত, শ্যাম পরিবেশের মধ্যে ভগবানের কথা খুব জমে। সেদিনও ভবানী আসবেন। তাঁর মত এই, খোকাকে নির্জনে এই সময় বসে বসে ভগবানের কথা বলতে হবে। ওর মন ও চোখ ফোটাতে হবে, উদার নীল আকাশের তলে বননীল দিগন্তের বাণী শুনিয়ে। ভবানী এলেন একটু পরে। তিলু বললে—ওই শ্লোকটা বুঝিয়ে দিন—

—সেই প্রশ্নোপনিষদেরটা? স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি?

—হুঁ।

—তিনি যজমানকে প্রতিদিন ব্রহ্মভাব আস্বাদ করান।

—তিনি কে?

—ভগবান।

—যজমান কে?

—যে তাঁকে ভক্তিপূর্বক উপাসনা করে।

—এখানে মনই যজমান, এরকম একটা কথা আগে আছে না?

—আছেই তো—ও কারা কথা বলচে? ঝোপের মধ্যে? দাঁড়াও—দেখি—

—এগিয়ে যাবেন না। আগে দেখুন কি—আমিও যাবো?

ওরা গিয়ে দেখলে নিস্তারিণী আর গোবিন্দ ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে একমনে আলাপে মত্ত—এবং দেখে মনে হচ্ছিল না যে ওরা উপনিষদ বা বেদান্তের আলোচনা করছিল নিভৃতে বসে। কারণ গোবিন্দ ডানহাতে নিস্তারিণীর নিবিড়কৃষ্ণ কেশপাশ মুঠি বেঁধে ধরেচে, বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি বলছিল। নিস্তারিণী ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে ওর মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চোখ তুলে চেয়ে ছিল।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে নিস্তারিণী মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। গোবিন্দ বনের মধ্যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। ভবানী বাঁড়ুয্যে পিছু হঠে চলে এলেন। নিস্তারিণী অপরাধীর মত মুখ নীচু করে রইল তিলুর সামনে। তিলু বনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—কে ওখানে চলে গেল রে? এখানে কি করচিস?

নিস্তারিণীর মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েচে। সে কোনো উত্তর দিলে না।

—কে গেল রে? বল্ না?

—গোবিন্দ।

—তোর সঙ্গে কি?

নিস্তারিণী নিরুত্তর।

—আর বাড়ি থেকে এতখানি এসে এই জঙ্গলের মধ্যি—বাঃ রে মেয়ে!

—আমার ভালো লাগে।

নিস্তারিণী অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর দিলে।

তিলু রাগের স্বরে বললে—মেরে হাড় ভেঙে দেবো, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! ভালো লাগাচ্চি তোমার? উনি এসেচেন নদীর ধারে এই বনের মধ্যি আধকোশ তফাত বাড়ি থেকে—কি, না ভালো লাগে আমার! সাপে খায় কি বাঘে খায়, তার ঠিক নেই! ধিঙ্গি মেয়ে, বলতি লজ্জা করে না? যা—বাড়ি যা—

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুর ক্রোধব্যঞ্জক স্বর শুনে দূর থেকে বললেন—ওগো, চলে এসো না—

তিলু তার উত্তর দিলে—থামুন আপনি।

নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে বললে—তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই, এখুনি যে গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে! মুখ দেখাবি কেমন করে, ও পোড়ারমুখী?

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

—আয় আমার সঙ্গে—চল্—পোড়ারমুখী কোথাকার! গুণ কত? সে মুক্তোটা আছে, না এর মধ্যি গোবিন্দকে দিয়েচিস?

—না। সেটা শাশুড়ীর কাছে আছে।

—আয় আমার সঙ্গে। বিছুটির লতার মধ্যি এখানে বসে আছে দুজনে! তোর মতো এমন নির্বোধ মেয়ে আমি যদি দুটি দেখেচি—কুন্তীঠাকরুন যদি একবার টের পায়, তবে গাঁয়ে তোমারে তিষ্ঠুতে দেবে?

—না দেয়, ইছামতীর জল তো আর কেউ কেড়ে নেয় নি!

—আবার সব বাজে কথা বলে! মেরে হাড় ভেঙে দেবো বলে দিচ্চি—মুখের ওপর আবার কথা? চল—ডুব দিয়ে নে নদীতে একটা। চল, আমি কাপড় দেবো এখন।

তিলু ওকে বাড়ি নিয়ে এসে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরালে। কিছু খাবার খেতে দিলে। ওকে কথঞ্চিৎ সুস্থ ক'রে বললে—কতদিন থেকে ওর সঙ্গে দেখা করচিস?

—পাঁচ-ছ'মাস।

—কেউ টের পায় নি?

—লুকিয়ে ওই বনের মধ্যি ও-ও আসে, আমিও আসি।

—বেশ কর! বলতি একটু মুখি বাধচে না ধিঙ্গি মেয়ের? আর দেখা করবি নে, বল্?

—আর দেখা না করলি ও থাক্‌তি পারবে না।

—ফের্! তুই আর যাবি নে, বুঝলি?

—হুঁ।

—কি হুঁ? যাবি, না যাবি নে?

নিস্তারিণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বললে—গোবিন্দ আমাকে একটা জিনিস দিয়েচে—

—কি জিনিস?

—নিয়ে এসে দেখাবো? কানে পরে, তাকে মাকড়ি বলে—

—কোথায় আছে?

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বললে—আমার কাছেই আছে—আচলে বাঁধা আছে

আমার এই ভিজে শাড়ির। আজই দিয়েচে নতুন গয়না। ওরকম এ গাঁয়ে আর কারো নেই। কলকেতা শহরে নতুন উঠেচে। ও গড়িয়ে এনে দিয়েচে। ওর মামাতো ভাই—কলকেতায় কোথায় যেন কাজ করে।

নিস্তারিণী নিয়ে এসে দেখালে নতুন গয়না ভিজে কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে এনে। তিলু উল্টেপাল্টে দেখে বললে—নতুন জিনিস, ভালো জিনিস কিন্তু তুই এ জিনিস নিতি পারবি নে। এ তোকে ফেরত দিতি হবে। ফেরত দিয়ে বলবি, আর কখনো দেখা হবে না। এবার আমি এ কথা চেপে দেবো। আর তো কেউ দেখে নি, আমরাই দেখেচি। কারুরি বলতে যাবো না আমরা। কিন্তু তোমারে একরম মহাপাপ করতি দেবো না কিন্তু। স্বামীকে ভালো লাগে না তোমার? স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে—

নিস্তারিণী মুখ নিচু ক'রে বললে—সে আমায় ভালোবাসে না—

—মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। ভালোবাসবে কি ক'রে? উনি এখানে ওখানে—

—তা না। আগে থেকেই। সে এ সব কিছু জানে না।

—স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে এসব করতি মনে মায়া হয় না?

—তুমি দিদি স্বামী পেয়েচ শিবির মত। অমন শিবির মত স্বামী আমরা পেলি আমরাও অমন কথা বলতাম। আহা—তিনি যে গুণবান! একখানা কাপড় চেয়েছিলাম বলে কি বকুনি, যেমন শাশুড়ীর, তেমনি সেই গুণবানের। বাপের বাড়ির একজোড়া গুজরীপঞ্চম ছিল, তা সেবার বাঁধা দিয়ে নালু পালের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল—আজও ফিরিয়ে আনার নাম নেই। এত বলি, কথা শোনে না। আনবে কোথা থেকি? ঐ তো সংসারের ছিরি! ধান এবার হয় নি, যা হয়েছিল তিনটে মাস টেনেটুনে চলেছিল। ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে দিয়ে কোমরে বাত ধরবার মত হয়েচে। এত করেও মন পাবার জো নেই কারো। কেন আমি থাকবো অমন শ্বশুরবাড়ি, বলে দাও তো দিদি।

সুন্দরী বিদ্রোহিনীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেচে। মুখে একটি অদ্ভুত গর্ব ও

যৌবনের দীপ্তি, নিবিড় কেশপাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে সারা পিঠ জুড়ে। বড় মায়া হোলো এই অসমসাহসী বধূটির ওপর তিলুর। গ্রামে কি হুলস্থুল পড়ে যাবে জানাজানি হয়ে গেলে এ কথা—তা এ কিছুই জানে না।

অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তিলু ওকে সন্দের আগে নিজে গিয়ে ওদের বাড়ি রেখে এল। বলে এল, তার সঙ্গে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল, এতক্ষণ তাদের বাড়ি বসেই গল্প করছিল। শাশুড়ী সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন—ওমা, আমরা দু'দুবার নদীর ঘাটে খোঁজ নিয়ে এ্যালাম—এ পাড়ার সব বাড়ি খোঁজলাম—বৌ বটে বাবা বলিহারি! বেরিয়েচে তিন পহর বেলা থাকতি আর এখন সন্দের অন্ধকার হোলো, এখন ও এল। আর কি বলবো মা, ভাজা ভাজা হয়ে গ্যালাম ও বৌ নিয়ে: আবার কথায় কথায় চোপা কি!

নিস্তারিণী সামান্য নিচু স্বরে অথচ শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—হ্যাঁ, তোমরা সব গুণের গুণমণি কিনা? তোমাদের কোনো দোষ নেই—থাকতি পারে না—

—শুনলে তো মা, শুনলে নিজের কানে? কথা পড়তি তস্ সয় না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চোপা!

বৌ বললে—বেশ।

তিলু ধমক দিয়ে বললে—ও কি রে? ছিঃ—শাশুড়ীকে অমন বলতি আছে?

সন্দের দেরি নেই। তিলু বাড়ি চলে গেল। বাঁশবনের তলায় অন্ধকার জমেচে, জোনাকী জ্বলচে কালকাসুন্দে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

এসে ভবানীকে বললে—দিন বদলে যাচ্চে, বুঝলেন? নিস্তারিণীর ব্যাপার দেখে বুঝলাম। কখনো শুনি নি ভদ্দরঘরের বৌ বনের মধ্যে বসে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করে। আমাদের যখন প্রথম বিয়ে হোলো, আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম ছিল না দিনমানে। এ গাঁয়ে এখনো তা নিয়ম নেই। অল্পবয়সী বৌরা দুপুর রাত্তিরি সবাই ঘুমুলি তবে স্বামীর ঘরে যায়—এখনো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—আমি বলেছিলাম না তোমাকে, খোকা তার বৌ নিয়ে এই গাঁয়ের রাস্তায় দিনমানে পাশাপাশি বেড়াবে—

—ওমা, বল কি ?

—ঠিক বলচি। সেদিন আসচে। তোমাদের ওই বৌটিকে দিয়েই দেখলে তো। দিনকাল বড্ড বদ্‌লাচ্চে।

প্রসন্ন চক্কত্তি আজকাল গয়ামেমের দেখা বড় একটা পায় না। মেমসাহেব চলে যাওয়ার পরে গয়া একরকম স্থায়ীভাবেই বড় সাহেবের বাংলোয় বাস করচে। যদি বা বাইরে আসে, পথেঘাটে দেখা মেলে কখনো-সখনো, আগের মত যেন আর নেই। আবার কখনো কখনো আছেও। খামখেয়ালী গয়া-মেমের কথা কিছু বলা যায় না। মন হোলো তো প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্পই করলে! খেয়াল না হোলো, ভালো কথাই বললে না।

নীলকুঠির কাজ খুব মন্দা। নীলের চাষ ঠিকই হচ্চে বা হয়ে এসেচেও এতদিন। প্রজারা ঠিক আগের মতই মানে বড় সাহেবকে বা দেওয়ানকে। কিন্তু নীলের ব্যবসাতে মন্দা পড়েচে। মজুদ নীল বাইরের বাজারে আর তেমন কাটে না। দাম এত কম যে খরচ পোষায় না। আর বছরের অনেক নীল গুদামে মজুদ রয়েছে কাটতির অভাবে। নীলকুঠির চাকরিতে আর আগের মত জুত নেই, কিন্তু এরা এখন নতুন চাকরি পাবেই বা কোথায়। বড় সাহেব নীলকুঠি থেকে একটি লোককেও বরখাস্ত করে নি, মাইনেও ঠিক আগের মত দিয়ে যাচ্চে কিন্তু তেমন উপরি পাওনা নেই ততটা, হাঁকডাক কমে গিয়েচে, নীলকুঠির চাকরির সে জলুস অন্তর্হিতপ্রায়।

শ্রীরাম মুচি একদিন প্রসন্ন চক্কত্তিকে বলেন—ও আমীনবাবু, আমার জমিটা আমাকে দিয়ে দিতি বলেন সায়েবকে।

—বলবো। সব চাকরদের জমি দিচ্চে নাকি ?

—বড় সায়েব বলেচে, ভজা, নফর আর আমাকে জমি দিতি। আপনি মেপে কুঠির খাসজমি থেকে তিন বিঘে করে জমি এক এক জনকে দিয়ে দেবেন।

—সায়েবের হুকুম পেলেই দেবো। আমরা পাবো না ?

—আপনি বলে নিতি পারেন সায়েবকে। শুধু চাকর-বাকরকে দেবে

বলেচে। আপনাদের দেবে না গয়ামেমকে দেবে পনেরো বিঘে।

—অ্যাঁ, বলিস কি ?

—সে পাবে না তো কি আপনি পাবা ? সে হোলো পেয়ারের লোক সায়েবের।

ঠিক দুদিন পরে দেওয়ান হরকালী সুর পরোয়ানা পেলেন বড় সাহেবের—গয়ামেমের জমি আমীনকে দিয়ে মাপিয়ে দিতে। আমীনকে ডাকিয়ে বলে দিলেন। গয়ামেম নিজের চোখে গিয়ে জমি দেখে নেবে।

—কোন্ জমি থেকে দেওয়া হবে ?

—বেলেডাঙার আঠারো নম্বর থাক নক্সা দেখুন। ধানী জমি কতটা আছে আগে ঠিক করুন।

– সেখানে মাত্র পাঁচ বিঘে ধানের জমি আছে দেওয়ানজি। আমি বলি ছুতোরঘাটার কোল থেকে নতিডাঙার কাঠের পুল পজ্জন্ত যে টুকরো আছে, শশী মুচির বাজেয়াপ্তী জমির দরুন—তাতে জলি ধান খুব ভালো হয়। সেটাও যদি নেয়—

হরকালী সুর চোখ টিপে বললেন—আঃ, চুপ করুন !

—কেন বাবু ?

—খাসির মাথার মত জমি · সায়েব এর পরে খাবে কি ? নীলকুঠি তো উঠে গেল। ও জমিতি ষোল মণ আঠারো মণ উড়ি ধানের ফলন। সায়েব খাসখামারে চাষ করবে এর পরে। গয়া:কে দেবার দায় পড়েছে আমাদের। না হয়, এর পর আপনি আর আমি ও জমি রাখবো।

হায় মূর্খ বৈষয়িক হরকালী সুর, প্রণয়ের গতি কি ক'রে বুঝবে তুমি ?

তার পরদিনই নিমগাছের তলায় দুপুরবেলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রসন্ন চক্কত্তি গয়ামেমের সাক্ষাৎ পেলে। গয়া কোনো দিন সাহেবের বাংলায় ভাত খায় না--খাওয়ার সময় নিজেদের বাড়িতে মায়ের কাছে গিয়ে খায়। আর একটা কথা, রাত্রে সে কখনো সাহেবের বাংলায় কাটায় নি, বরদা নিজে আলো ধরে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যায়।

গয়া বললে—কি খুড়োমশাই, খবর কি ?

—দেখাই তো আর পাই নে। ডুমুরের ফুল হয়ে গিয়েচ।

গয়ামেম হেসে প্রসন্ন আমীনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে · কেন, এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন এখেনে দুপুরের রদ্দ রি ?

—তোমার জন্যি।

—যান, আবার সব বাজে কথা খুড়োমশায়ের।

—পাঁচ দিন দেখি নি আজ।

—এ পোড়ারমুখ আর নেই বা দেখলেন।

—তার মানে ?

—আপনাদের কোন্ কাজে আর লাগবো বলুন।

—আচ্ছা গয়া—

—কি ?

বলেই গয়া মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে চলে যেতে উদ্যত হোলো।

প্রসন্ন ব্যস্ত হয়ে বললে—শোনো শোনো, চললে যে ? কথা আছে।

গয়া যেতে যেতে থেমে গেল, পেছন ফিরে প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে চেয়ে বললে—আপনার কথা খুড়োমশাই শুধু হেনো আর তেনো। শুধু তোমাকে দেখতি ভালো লাগে আর তোমার জন্যি দাঁড়িয়ে আছি আর তোমার কথা ভাবছি—এই সব বাজে কথা। যত বলি, খুড়োমশাই বলে ডাকি, আমারে অমন বলতি আছে আপনার ? অমন বলবেন না। ততই মুখির বাঁধন দিন দিন আলগা হচ্চে যেন !

প্রসন্ন চক্কত্তি হেসে বললে—কোথায় দেখলে আলগা ? কি বলিচি আমি ?

—শুধু তোমারে দেখতি ভালো লাগে, তোমাকে কতকাল দেখি নি, তোমারে না দেখলি থাকতি পারি নে—

—মিথ্যে কথা একটাও না।

—যান বাসায় যান দিনি। এ দুপুরবেলা রদ্দ রি দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

ভারি দুক্‌খু হবে আমার—

—সত্যি গয়া, সত্যি তোমার দুক্‌খু হবে? ঠিক বলচো গয়া?

—হবে, হবে, হবে। বাসায় যান, পাগলামি করবেন না পথে দাঁড়িয়ে—

—একটা কথা—

আবার একটা কথা আর একটা কথা, আর ও গয়া শোনো আর একটু, ও গয়া এখানটায় বসে একটু গল্প করা যাক—

—না। ও কথা না—

—কি তবে? হাতী না ঘোড়া?

—ও সব কথাই না। মাইরি বলচি গয়া। শোনো খুব দরকারি কথা তোমার পক্ষে। কিন্তু খুব লুকিয়ে রাখবে, কেউ যেন না শোনে—

এই দেখাশোনার কয়েক দিনের মধ্যে প্রসন্ন চক্কত্তি শশী মুচির বাজেয়াপ্তী জমির মধ্যে উৎকৃষ্ট জলি ধানের পনেরো বিঘে জমি গয়ামেমকে মেপে শ্রীরাম মুচিকে দিয়ে খোঁটা পুতিয়ে সীমানায় বাবলা গাছের চাঁরা পুঁতে একেবারে পাকা ক'রে গয়াকে দিয়ে দিলে। গয়া মাঠে উপস্থিত ছিল। একটা ডুমুর গাছ দেখে গয়া বললে—খুড়োমশাই, ওই ডুমুর গাছটা আমার জমিতি ক'রে দ্যান না? ডুমুর খাবো—

—যদি দিই, আমার কথা মনে থাকবে গয়া—

—হি হি—হি হি—ওই আবার শুরু হোলো।

—সোজা কথাডা বললি কি এমন দোষ হয়ে যায়? কথাডার উত্তর দিতি কি হচ্ছে? ও গয়া—

—হি হি হি—

—যাক্ গে। মরুক গে। আমি কিছুটি আর বলচি নে। দিলাম চেন ঘুরিয়ে, ডুমুর গাছ তোমার রইল।

—পায়ের ধুলো নেবো, না নেবো না? বেরাহ্মণ দেবতা, তার ওপর খুড়োমশাই। কত পাপ যে আমার হবে।

গয়া এগিয়ে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে দূর থেকে। কি প্রসন্ন হাসি

ওর মুখের! কি হাসি! কচি ডুমুর গাছটা এখনো কতকাল বাঁচবে। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীনের আজকার সুখের সাথী রইল ওই গাছটা। প্রসন্ন আমীন মরে যাবে কিন্তু আজ দুপুরের ওই কচি-পাতা-ওঠা গাছটার ছায়ায় যাদের অপরূপ সুখের বার্তা লেখা হয়ে গেল, চাঁদের আলোয় যাদের চোখের জল চিকচিক করে, ফাল্গুন-দুপুরে গরম বাতাসে যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়— তাদের মনের সুখ-দুঃখের কথা পঞ্চাশ বছর পরে কেউ আর মনে রাখবে কি?

মাস কয়েক পরের কথা।

ভবানী ছেলেকে নিয়ে ইছামতীর ধারে বনসিমতলার ঘাটের বাঁকে বসে আছেন। বেলা তিন প্রহর এখনো হয় নি, ঘন বনজঙ্গলের ছায়ায় নিবিড় তীরভূমি পানকৌড়ি আর বালিহাঁসের ডাকে মাঝে মাঝে মুখর হয়ে উঠচে। জেলেরা ডুব দিয়ে যে সব ঝিনুক আর জোংড়া তুলেছিল গত শীতকালে, তাদের স্তূপ এখনো পড়ে আছে ডাঙায় এখানে ওখানে। বন্যলতা দুলচে জলের ওপর বাবলাগাছ ও বন্য যজ্ঞিডুমুর গাছ থেকে। কাকজঙ্ঘার থোলো থোলো রাঙা ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

ভবানী বললেন—খোকা, আমি যদি মারা যাই, মাদের তুই দেখবি?

—না বাবা, আমি তাহলে কাঁদবো।

—কাঁদবি কেন, আমার বয়েস হয়েচে, আমি কতকাল বাঁচবো।

—অনেকদিন।

— তোর কথায় রে? পাগলা একটা—

খোকা হি হি ক'রে হেসে উঠলো। তারপরেই বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরলে ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে। বললে—আমার বাবা—

—আমার কথা শোন। আমি মরে গেলে তুই দেখবি তোর মাদের?

—না। আমি কাঁদবো তাহোলে—

—বল দিকি ভগবান কে?

—জানি নে।

—কোথায় থাকেন তিনি ?

—উই ওখেনে—

খোকা আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে।

—কোথায় রে বাবা, গাছের মাথায় ?

—হুঁ।

—তাঁকে ভালোবাসিস ?

—না।

—সে কি রে! কেন ?

—তোমাকে ভালোবাসি।

—আর কাকে ?

—মাকে ভালোবাসি।

—ভগবানকে ভালোবাসিস্ নে কেন ?

—চিনি নে।

— খোকা, তুই মিথ্যে কথা বলিস নি। ঠিক বলেচিস। না চিনে না বুঝে কাউকে ভালেবাসা যায় না। চিনে বুঝে ভালোবাসলে সে ভালোবাসা পাকা হয়ে গেল। সেই জন্যেই সাধারণ লোকে ভগবানকে ভালোবাসতে পারে না। তারা ভয় করে, ভালোবাসে না। চিনবার বুঝবার চেষ্টা তো করেই না কোনদিন। আচ্ছা, আমি তোকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। কেমন ?

খোকা কিছু বুঝলে না, কেবল বাবার শেষের প্রশ্নটির উত্তরে বললে—হুঁ-উ-উ।

—খোকন, ওই পাখী দেখতে কেমন রে ?

—ভালো।

—পাখী কে তৈরি করেচে জানিস ? ভগবান। বুঝলি ?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ-উ।

—তুই কিছু বুঝিস নি। এই যা কিছু দেখছিস, সব তৈরি করেচেন ভগবান।

—বুঝেচি বাবা। মা বলেচে, ভগবান নক্ষত্র করেচে।

—আর কি ?

—আর চাঁদ।

—আর ?

—আর সূর্যি।

—হুঁ, তুই এত কথা কার কাছে শিখলি ? মা'র কাছে ? বেশ ! চাঁদ ভালো লাগে ?

—হুঁ-উ।

—তবে ছাখ তো, এমন জিনিস যে তৈরি করেচেন, তাঁকে ভালোবাসা যায় না ?

—আমি ভালোবাসবো।

—নিশ্চয়। কিছু কিছু ভালোবেসো।

—তুমি ভালোবাসবে ?

—হু।

—মা ভালোবাসবে ?

—হু।

—আমি ভালোবাসবো।

—বেশ।

—ছোট মা ভালোবাসবে ?

—হুঁ।

—তাহলে আমি ভালোবাসবো।

—নিশ্চয়। আজ আকাশের চাঁদ তোকে ভালো করে দেখাবো।

—চাঁদের মধ্যে কে বসে আছে ?

—চাঁদের মধ্যে কিছু নেই রে। ওটা চাঁদের কলঙ্ক।

—কনঙ্ক কি বাবা ? কনঙ্ক ?

—ওই হোলো গিয়ে পেতলে যেমন কলঙ্ক পড়ে তেমনি।

ছেলে অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়। কি সুন্দর, নিষ্পাপ অকলঙ্ক মুখ ওর। চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু খোকার মুখে কলঙ্কের ভাঁজও নেই।

ভবানী বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকান।

কোথায় ছিল এ শিশু এতদিন ?

বহুদূরের ও কোন্ অতীতের মোহ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে। যে পৃথিবী অতি পরিচিত, প্রতিদিন দৃষ্ট —যেখানে বসে ফণি চক্কত্তি সুদ করেন, চন্দ্র চাটুয্যের ছেলে জীবন চাটুয্যে সমাজপতিত্ব পাবার জন্যে দলাদলি করে—অজস্র পাপ, ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত—এ যেন সে পৃথিবী নয়। অত্যন্ত পরিচিত মনে হোলেও এ অত্যন্ত অপরিচিত, গভীর রহস্যময়। বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয় সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান।

পিছনকার বাতাস আকন্দ ফুলের গন্ধে ভরপুর। স্তব্ধ নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানে মগ্ন।

আজকার এই যে সঙ্গীত, জীবজগতের এই পবিত্র অনাহত ধ্বনি আজ যে সব কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্চে পাঁচশত কি হাজার বছর পরে সে সব কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যাবে ! ইছামতীর জলের স্রোতে নতুন ইতিহাস লেখা হবে কালের বুকে।

আজ এই যে ক্ষুদ্র বালক ও পিতা অপরাহ্নে নদীর ধারে বসে আছে, কত স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ওদের মধ্যে—সে কথা কেউ জানবে না।

কেবল থাকবেন তিনি। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, সমস্ত গতির মধ্যে স্থিতিশীল তিনি। ঈশ্বর ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ এ মানুষের মন-গড়া কথা। সেই জিনিস যা এমন সুন্দর অপরাহ্নে, ফুলে-ফলে, বসন্তে, লক্ষ-লক্ষ জন্ম-মৃত্যুতে, আশায়, স্নেহে, দয়ায়, প্রেমে আবছায়া আবছায়া ধরা পড়ে, জগতের কোনো ধর্মশাস্ত্রে সেই জিনিসের স্বরূপ কি তা বলতে পারে নি ; কোনো ঋষি, মুনি, সাধু যদি বা অনুভব করতে পেরেও থাকেন, মুখে প্রকাশ করতে পারেন নি···কি সে জিনিস তা কে বলবে ?

তবু মনে হয় তিনি যত বড় হোন, আমাদের সগোত্র। আমার মনের সঙ্গে, এই শিশুর মনের সঙ্গে সেই বিরাট মনের কোথায় যেন যোগ আছে। ভগবান যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তা নয়—আমি তাঁর আত্মীয়—খুব আপন ও নিকটতম সম্পর্কের আত্মীয়। কোটি কোটি তারার দ্যুতিতে দ্যুতিমান সে

মুখের দিকে আমি নিঃসঙ্কোচে ও প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার অধিকার রাখি, কারণ তিনি যে আমার বাবা। হাতে গড়া পুতুলই নয় শুধু তাঁর-- তাঁর সন্তান। এই খোকা তাঁরই এক রূপ। এর অর্থহীন হাসি, উল্লাস তাঁরই নিজের লীলা-উজ্জ্বল আনন্দের বাণীমূর্তি।

এই ছেলে বড় হয়ে যখন সংসার করবে, বৌ আনবে, ছেলেপুলে হবে ওদের তখন ভবানী থাকবেন না। দশ বছর আগে বিস্মৃত কোনো ঘটনার মত তিনি নিজেও পুরনো হয়ে যাবেন এ সংসারে। ঐ বেতসকুঞ্জ, ঐ প্রাচীন পুষ্পিত সপ্তপর্ণটা হয়তো তখনও থাকবে—কিন্তু তিনি থাকবেন না।

জগতের রহস্যে মন ভরে ওঠে ভবানীর, ঐ সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা···নিস্তারিণীর বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল কৌতুকদৃষ্টি,···তিলুর সপ্রেম চাহনি, এই কচি ছেলের নীল শিশুনয়ন—সবই সেই রহস্যের অংশ। কার রহস্য? সেই মহারহস্যময়ের গহন গভীর শিল্পরহস্য।

তিলু পিছন থেকে এসে কি বলতেই ভবানীর চমক ভাঙলো। তিলুর কাঁধে গামছা, কাঁকে ঘড়া—নদীতে সে গা ধুতে এসেচে।

হেসে বললে—আমি ঠিক জানি, খোকাকে নিয়ে উনি এখানে রয়েচেন—

ভবানী ফিরে হেসে বললেন—নাইতে এলে?

—আপনাদের দেখতিও বটে।

—নিলু কোথায়?

—রান্না চড়াবে এবার।

—বসো।

—কেউ আসবে না তো?

—কে আসবে সন্দেবেলা?

তিলু ভবানীর গা ঘেঁষে বসলো। ঘড়া অদূরে নামিয়ে রেখে এসে স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরলে।

ভবানী বললেন—খোকা যেন অবাক হয়ে গিয়েচে, অমন কোরো না, ও না বড় হোলো?

তিলু বললে—খোকা, ভগবানের কথা কি শুনলি?

খোকা মায়ের কাছে সরে এসে মা'র মুখের দিকে চেয়ে বললে—মা, ওমা, আমি চান করবো, আমি চান করবো—

—আমার কথার উত্তর দে—

—আমি চান করবো।

তিলু এদিক ওদিক চেয়ে হেসে বললে—খোকাকে গা ধুইয়ে নেবো, আমরাও নামি জলে। আসুন সাঁতার দেবো।

ভবানী বললেন—বসো তিলু। আমার কেমন মনে হচ্ছিল আজ। খোকাকে ভগবানের কথা শেখাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল এই আকাশ, বাতাস নদীজলের পেছনে তিনি আছেন। এই খোকার মধ্যেও। ওকে আনন্দ দিয়ে আমি ভাবি তাঁকেই খুশী করছি।

তিলু স্বামীর কথা মন দিয়ে শুনলে, বেশ গভীর ভাবে। ও স্বামীর কোনো কথাই তুচ্ছ ভাবে না। ঘাড় হেলিয়ে বললে—আপনার ব্রহ্মের অনুভূতি হয়েছিল?

—তুমি হাসালে।

—তবে ও অনুভূতিটা কি বলুন।

—তাঁর ছায়া এক-একবার মনে এসে পড়ে। তাঁকে খুব কাছে মনে হয়। আজ যেমন মনে হচ্ছিল—আমি তাঁর আপন, পর নই। তিনি যত বড়ই হোন, বিরাটই হোন, আমাদের পর নয়, আমাদের বাবা তিনি। 'দিব্যো-হ্যমূর্ত পুরুষঃ'—মনে আছে তো?

—ওই তো ব্রহ্মানুভূতি। আপনার ঠিক হয়েচে আমি জানি। যাতে ভগবানকে অত কাছে বলে ভাবতি পারলে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি বলতি হবে বই কি?

—রোজ নদীর ধারে বসে খোকাকে ভগবানের কথা শেখাবো। এই বয়েস থেকে ওর মনে এসব আনা উচিত। নইলে অমানুষ হবে।

—আপনি যা ভালো বোঝেন। চলুন, এখন নেয়ে একটু সাঁতার দিয়ে

ফিরি। খোকা ডাঙায় বোসো—

খোকা খুব বাধ্য সন্তান। ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

—জলে নেমো না।

—না।

স্বামী স্ত্রী দুজনে মনের আনন্দে সাঁতার দিয়ে স্নান ক'রে খোকাকে গা ধুইয়ে নিয়ে চাঁদ-ওঠা জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যার সময় মাঠের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

চৈত্র মাস যায়-যায়। মাঠ বন ফুলে ফুলে ভরে গিয়েচে। নির্জন মাঠের উঁচু ডাঙায় ফুলে-ভরা ঘেঁটুবন ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাসে মাথা দোলাচ্চে। স্তব্ধ, নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানমগ্ন—ভবানী বাঁড়ুয্যের মনে হোলো দিকহারা দিকচক্রবালের পেছনে যে অজানা দেশ, যে অজ্ঞাত জীবন, তারই বার্তা যেন এই সুন্দর, নির্জন সন্ধ্যাটিতে ভেসে আসচে। তিনি গুরুর আশ্রয় পেয়েও ছেড়েচেন ঠিক, সন্ন্যাসী না হয়ে গৃহস্থ হয়েচেন, তিনটি স্ত্রী একত্রে বিবাহ ক'রে জড়িয়ে পড়েছিলেন একথাও ঠিক—কিন্তু তাতেই বা কি? মাঠ, নদী, বনঝোপ, ঋতুচক্র, পাখী, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রির প্রহরগুলির আনন্দবার্তা তাঁর মনে এক নতুন উপনিষদ রচনা করেচে।… এখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা। এই খোকার মধ্যে তাঁকে তিনি দেখতে পান।

নদীর ঘাট থেকে মেয়েরা এইমাত্র জল নিয়ে ফিরে গেল, মাটির পথের ওপর ওদের জলসিক্ত চরণচিহ্ন এই খানিক আগে মিলিয়ে গিয়েচে, নদীর ধারের বনে বনে গাঙশালিকের আর দোয়েলের দল এই খানিক আগে তাদের গান গাওয়া শেষ করেচে। ঘাটের ওপরকার নাগকেশর গাছের ফুলে ভরা ডালটি নুইয়ে কোন রূপসী গ্রামবধূ সন্ধ্যার আগে বোধ হয় ফুল পেড়ে থাকবে, গাছতলায় সোনালি রংয়ের গর্ভকেশরের বিচ্ছিন্ন দল ছড়ানো, মরকত মণির মত ঘন সবুজ রং-এর পাতা তলা বিছিয়ে পড়ে আছে—

হঠাৎ বিলুর কথা মনে পড়ে মনটা উদাস হয়ে যায় ভবানীর। হয়তো তিনি খানিকটা অবহেলা করে থাকবেন, তবে অজ্ঞাতসারে নয়। মেয়েদের মনের কথা সব সময়ে কি বুঝতে পারা যায়? দুঃখকে বাদ দিয়ে জগতে সুখ নেই—প্রকৃত

সুখের অবস্থা গভীর দুঃখের পরে…দুঃখের পূর্বের সুখ অগভীর, তরল, খেলো হয়ে পড়ে। দুঃখের পরে যে সুখ—তার নির্মল ধারায় আত্মার স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন হয়, জীবনের প্রকৃত আস্বাদ বিলিয়ে দেয়। জীবনকে যারা দুঃখময় বলেছে, তারা জীবনের কিছুই জানে না, জগৎটাকে দুঃখর মনে করা নাস্তিকতা। জগৎ হোলো সেই আনন্দময়ের বিলাস বিভূতি। তবে দেখার মত মন ও চোখ দরকার। আজকাল তিনি কিছু কিছু বুঝতে পারেন।

খোকা হাত উঁচু ক'রে বললে—বাবা, ভয় করচে!

—কেন রে?

—শিয়াল! আমাকে কোলে নাও—

—না। হেঁটে চলো—

—তাহলে আমি কাঁদবো—

তিলু বললে—বাবা, ভিজে কাপড় আমাদের দুজনেরই। সর্বশরীর ভেজা। কেন এই সন্দেবেলা। হেঁটে চলো।

নিলু সন্দে দেখিয়ে বসে আছে। ভবানীর আহ্নিকের জায়গা ঠিক ক'রে রেখেছে। নিকোনো গুছোনো ওদের ঝকঝকে তকতকে মাটির দাওয়া। আহ্নিক শেষ করতেই নিলু এসে বললে—জলপান দিই এবার? তারপর সে একটা কাঁসার বাটিতে দুটি মুড়কি আর দু'টুকরো নারকোল নিয়ে এসে দিলে, বললে—আমার সঙ্গে এবার একটু গল্প করতি হবে কিন্তু—

—বোসো নিলু। কি রাঁধচ?

—না, আমার সঙ্গে ও রকম গল্প না। চালাকি? দিদির সঙ্গে যেমন গল্প করেন—ওই রকম।

—তোমার বড্ড হিংসে দিদির ওপর দেখচি। কি রকম গল্প শুনি—

—সমস্কৃতো-টমস্কৃতো। ঠাকুরদেবতার কথা। ব্রহ্ম না কি—

ভবানী হো হো ক'রে হেসে উঠে সস্নেহে ওর দিকে চাইলেন। বললেন—শুনতে চাও নি কোনোদিন তাই বলি নি। বেশ তাই হবে। তুমি জানো, কার মত করলে? প্রাচীন দিনে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর দুই স্ত্রী—গার্গী আর মৈত্রেয়ী

—তুমি করলে গার্গীর মত, সতীন-কাঁটা যখন ভূমা ছাইবে, তখন বুঝি আর না বুঝি, আমাকে সেই ভূমাই নিতে হবে—এই ছিল গার্গীর মনে আসল কথা—তোমারও হোলো সেই রকম।

এমন সময়ে খোকা এসে বললে —বাবা কি খাচ্ছ? আমি খাবো—

—আয় খোকা—

ভবানী ছুটি মুড়কি ওর মুখে তুলে দিলেন। খোকা বাটির দিকে তাকিয়ে বললে—নারকোল!

—না। পেট কামড়াবে।

—পেট কামড়াবে?

—হ্যাঁ, বাবা।

—ও বাবা—বাবা—পেট কামড়াবে?

—হ্যাঁ রে বাবা।

—বাবা—

—কি?

—পেট কামড়াবে?

নিলু ধমক দিয়ে বললে—থাম রে বাবা। যা একবার ধরলেন তো তাই ধরলেন—

খোকা একবার চায় নিলুর দিকে, একবার চায় বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে। বাবার দিকে চেয়ে বললে—কাকে বলচে বাবা?

নিলু বললে—ওই ও পাড়ার নীলে বাগ্‌দিকে। কাকে বলা হচ্চে এখন বুঝিয়ে দাও—বলেই ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিলে। খোকা কিন্তু সেটা পছন্দ করলে না, সে বার বার বলতে লাগল—আমায় ছেড়ে দাও—আমি বাবার কাছে যাবো—

—যায় না।

—না, আমায় ছেড়ে দাও—আমি বাবার কাছে যাবো—

ভবানী বললেন—দাও, নামিয়ে দাও—এই নে, একখানা নারকোল—

খোকা বাবার বেজায় হাওটো। বাবাকে পেলে আর কাউকে চায় না। সে এসে বাবার হাত থেকে নারকোল নিয়ে বাবার কোলে মাথা রেখে বলতে লাগলো বাবার মুখের দিকে চেয়ে—ও বাবা, বাবা!

—কি রে খোকা?

খোকা বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—ও বাবা, বাবা!

—এই তো বাবা।

এমন সময়ে প্রবীণ শ্যামচাঁদ গাঙ্গুলী এসে ডেকে বললেন—বাবাজি বাড়ি আছ?

ভবানী শশব্যস্তে বললেন—আসুন মামা, আসুন—

—আসবো না আর, আলো আমার আছে। চলো একবার চন্দর-দাদার চণ্ডীমণ্ডপে। ভানী গয়লানীর সেই বিধবা মেয়েটার বিচার হবে। শক্ত বিচার আজগে।

—আমি আর সেখানে যাবো না মামা—

—সে কি কথা? যেতেই হবে। তোমার জন্যি সবাই বসে। সমাজের বিচার, তুমি হোলে সমাজের একজন মাথা। তোমরা আজকাল কর্তব্য ভুলে যাচ্চ বাবাজি, কিছু মনে করো না।

নিলু খোকাকে নিয়ে এর আগেই রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। শ্যামচাঁদ গাঙ্গুলীকে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না, দুর্বাসা প্রকৃতির লোক। এখনই কি বলতে কি বলে বসবেন।

রান্নাঘরে ঢুকে তিলু-নিলুকে কথাটা বলতে গেলেন ভবানী, জটিল গ্রাম্য হাঙ্গামা, ফিরতে রাত হবে। খোকা এসে মহাখুশীর সঙ্গে বাবার হাত ধরে বললে—বাবা এসো, খাই—

—কি খাবো রে?

—এসো বাবা, বসো—মজা হবে।

—না রে, আমি যাই, দরকার আছে। তুমি খাও—

—আমি তাহলে কাঁদবো। তুমি যেও না, যেও না—বোসো এখানে। মজা হবে।

খোকার মুখে সে কি উল্লাসের হাসি। বাবাকে সে মহা আগ্রহে হাত ধরে এনে একটা পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে। যেটাতে বসিয়ে দিলে সেটা রুটি বেলবার চাকি, ঠিক পিঁড়ি নয়।

—বোসো এখেনে। তুমি খাবে?

—হু।

—আমি খাবো।

—বেশ।

—তুমি খাবে?

কিন্তু দুর্বাসা শ্যাম গাঙ্গুলী বাইরে থেকে হেঁকে বললেন ঠিক সেই সময়—বলি, দেরি হবে নাকি বাবাজির?

আর থাকা যায় না। দুর্বাসা ঋষিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা চলে না। ভবানীকে উঠতে হোলো। খোকা এসে বাবার কাপড় চেপে ধরে বললে—যাস নে, এ বাবা। বোসো, ও বাবা। আমি তাহোলে কাঁদবো—

খোকার আগ্রহশীল ছোট্ট দুর্বল হাতের মুঠো থেকে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ভবানীকে চলে যেতে হোলো। সমস্ত রাস্তা শ্যাম গাঙ্গুলী সমাজপতি বক বক বকতে লাগলেন, ৺চন্দ্র চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে কাদের একটি যুবতী মেয়ের গুপ্ত প্রণয়ঘটিত কি বিচার হোতে লাগলো—এসব ভবানী বাঁড়ুয্যের মনের এক কোণেও স্থান পায় নি—তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল খোকার চোখের সেই আগ্রহভরা আকুল সপ্রেম দৃষ্টি, তার দুটি ছোট্টমুঠির বন্ধন অগ্রাহ্য ক'রে তিনি চলেএসেচেন। মনে পড়লো খোকনের আরো ছেলেবেলার কথা। ··কোথায় যেন সেদিন তিনি গিয়েছিলেন, সেদিন অনেকক্ষণ খোকাকে দেখেন নি ভবানী বাঁড়ুয্যে। মনে হয়েছিল সন্দেবেলায় হয়তো বাড়ি ফিরে দেখবেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ সারারাতে আর সে জাগবে না। তাঁর সঙ্গে কথাও বলবে না।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখলেন সে ঘুমোয় নি। বাবার জন্যে জেগে বসে আছে। ভবানী বাঁড়ুয্যে ঘরে ঢুকতেই সে আনন্দের সুরে বলে উঠল—ও বাবা, আঙ্গ না—ছুবি—

—তুমি শোও। আমি আসচি ওঘর থেকে—

—ও বাবা, আয়, তাহলে আমি কাঁদবো—

ভবানীর ভালো লাগে বড় এই শিশুকে। এখনো দু'বছর পোরেনি, কেমন সব কথা বলে এবং কি মিষ্টি সুরে, অপূর্ব ভঙ্গিতেই না বলে!

শিশুর প্রতি গাড় মমতারসে ভবানীর প্রাণ সিক্ত হোলো। তিনি ওর পাশে শুয়ে পড়লেন। শিশু ভবানীর গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

—সে কি রে?

—আমার বড়দা—

—আমি বুঝি তোর বড়দা? বেশ বেশ।

শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বাস করার দরুণএ গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের এবং অধিকাংশ লোকেরই তিনি ভগ্নিপতি সম্পর্কের লোক। তাঁরা অনেকেই তাঁকে 'বড়দা' কেউবা 'মেজদা' বলে ডাকে। শিশু সেটা শুনে শুনে যদি ঠাউরে নেয়, যে লোকটাকে বাবা বলা হয়, তার অন্য নাম কিন্তু 'বড়দা', তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।

ভবানী ওকে আদর করে বললেন—খোকন, আমার খোকন—

—আমার বড়দা—

ভবানীর তখুনি মনে হোলো এ এক অপূর্ব প্রেমের রূপ দেখতে পাচ্চেন এই ক্ষুদ্র মানবকের হৃদয়রাজ্যে। এত আপন তাঁকে এত অল্পদিনে কেউ করে নিতে পারে নি, এত নির্বিচারে, এত নিঃসঙ্কোচে। আপন আর পরে তফাতই এই।

তিনি বললেন—তোকে একটা গল্প করি খোকন, একটা জুজুবুড়ি আছে ওই তালগাছে—কুলোর মত তার কান, মূলোর মত—

এই পর্যন্ত বলতেই খোকা তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার ভয় করবে—আমার ভয় করবে—তাহলে আমি কাঁদবো—

—তুমি কাঁদবে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা থাক থাক।

খানিকটা পরে খোকা বড় মজা করেচে। ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে, দুই হাত ছড়িয়ে ক্ষুদ্র মুঠি পাকিয়ে সে ভয় দেখানোর সুরে বললে—একতা জুজুবুড়ি আছে—মট্ট বড় কান—

—বলিস কি খোকন?

—ই-ই-ই! একতা জুজুবুড়ি আছে।

—ভয় পেয়েচে খোকা। বলিস নে, বলিস নে! বড্ড ভয় করচে—

—হি হি—

—বড্ড ভয় করচে—

—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—না না, আর বলিস নে, বলিস নে—

খোকার সে কি অবোধ আনন্দের হাসি। ভবানীর ভারি মজা লাগলো—ভয়ের ভান করে বালিসে মুখ লুকুলেন। বাবার ভয় দেখে খোকা বাবার গলা জড়িয়ে মমতার সুরে বললে—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

—হ্যাঁ, আমায় আদর কর, আমার বড্ড ভয় করচে—

—আমার বড়দা—

—শোও খোকন, আমার কাছে শোও—

—জস্তি গাছটা বলো—

ভবানী ছড়া বলতে লাগলেন—

ও পারের জস্তি গাছটি জস্তি বড় ফলে
গো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে
প্রাণ করে আইঢাই গলা করে কাঠ
কতক্ষণে যাব রে এই হরগৌরীর মাঠ।

হঠাৎ খোকা হাত দুটো ছড়িয়ে চোখ বড় বড় করে বললে—একতা জুজু-বুড়ি আছে—

—ও বাবা—

—মট্ট বড় কান—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—আর বলিস নে—খোকন, আর বলিস নে—

—হি হি—

—বড্ড ভয় করচে—খোকন আমায় ভয় দেখিও না—

—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

আজ সন্ধ্যাবেলায় শ্যাম গাঙ্গুলীর মান রাখতে গিয়ে খোকাকে বড় অবহেলা করেচেন তিনি।

গ্রামে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। নালু পাল বেশী অর্থবান হয়ে উঠলো। সামান্য মুদীখানার দোকান থেকে ইদানীং অবিশ্যি সে বড় গোলদারী দোকান খুলেছিল এবং ধান, সর্ষে, মুগকলাইয়ের আড়ত ফেঁদে মোকাম ও গঞ্জ থেকে মাল কেনাবেচা করত।

একদিন ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে সংবাদটা নিয়ে এলেন দীনু ভট্‌চাজ। ৺শিবসত্য চক্রবর্তীর আমলে তৈরী সেই প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপ দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকারপ্রায় হয়ে গিয়েচে। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের দল সবাই নিষ্কর্মা, জীবনে মহকুমার বাইরে কেউ কখনো পা দেয় নি—কারণ দরকারও হয় না, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রায় সব ব্রাহ্মণেরই আছে, ধানের গোলা প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই, ত্ন'পাঁচটা গরুও আছে, আম কাঁটাল বাঁশঝাড় আছে। সুতরাং সকাল-সন্দে ফণি চক্কত্তি, ৺চন্দর চাটুযো কিংবা শ্যাম গাঙ্গুলীর চণ্ডীমণ্ডপে এই সব অলস, নিষ্কর্মা গ্রাম্য ব্রাহ্মণদের সময় কাটাবার জন্যে তামাকু সেবন, পাশা, দাবা, আজগুবী গল্প, তুর্বলের বিরুদ্ধে সামাজিক ঘোঁট ইত্যাদি পুরোমাত্রায় চলে। মাঝে মাঝে এর ওর ঘাড় ভেঙে খাওয়া চলে কোনো সমাজবিরুদ্ধ কাজের জরিমানা স্বরূপ।

সুতরাং দীনু ভট্‌চাজ যখন চোখ বড় বড় ক'রে এসে বললে—শুনেচ হে আমাদের নালু পালের কাণ্ড?

সকলে আগ্রহের সুরে এগিয়ে এসে বললে—কি, কি হে শুনি?

—সতীশ কলু আর নালু পাল তামাক কিনে মোটা টাকা লাভ করেচে, তু'দশ নয়, অনেক বেশি। দশ বিশ হাজার!

সকলে বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলো—সে কি ? সে কি ?

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—অনেকদিন থেকে ওরা তলায় তলায় কেনাবেচা করচে মোকামের মাল। এবার ধারে ভাজনঘাট মোকাম থেকে এক কিস্তি মাল রপ্তানি দেয় কলকাতায়। সতীশ কলুর শালা বড় আড়তদারি করে ওই ভাজনঘাটেই। তারই পরামর্শে এটা ঘটেচে। নয়তো এরা কি জানে, কি বোঝে ? ব্যস, তাতেই লাল।

ফণি চক্কত্তি বললেন, হ্যাঁ, আমিও শুনিচি। ও সব কথা নয়। সতীশ কলুর শালা-টালা কিছু না। নালু পালের শ্বশুরের অবস্থা বাইরে একরকম ভেতরে একরকম। সে-ই টাকাটা ধার দিয়েচে।

হরি নাপিত সকলকে কামাতে এসেছিল, সে গ্রাম্য নাপিত, সকালে এখানে এলে সবাইকে একত্র পাওয়া যায় বলে বারের কামানোর দিন সে এখানেই আসে। এসেই কামায় না, তামাক খায়। সে কল্কে খেতে খেতে নামিয়ে বললে—না, খুড়োমশাই। বিনোদ প্রামাণিকের অবস্থা ভালো না, আমি জানি। আড়তদারি করে ছোটখাটো, অত পয়সা ক'নে পাবে ?

—তলায় তলায় তার টাকা আছে। জামাইকে ভালোবাসে, তার ওই এক মেয়ে। টাকাটা যে কোরেই হোক, যোগাড় ক'রে দিয়েচে জামাইকে। টাকা না হলি ব্যবসা চলে ?

জিনিসটার কোনো মীমাংসা হোক আর না হোক নালু পাল যে অর্থবান হয়ে উঠেচে, ছ'মাস এক বছরের মধ্যে সেটা জানা গেল ভালোভাবে যখন সে মস্ত বড় ধানচালের সায়ের বসালে পটপটিতলার ঘাটে। জমিদারের কাছে ঘাট ইজারা নিয়ে ধান ও সর্ষের মরসুমে দশ-বিশখানা মহাজনী কিস্তি রোজ তার সায়েরে এসে মাল নামিয়ে উঠিয়ে কেনাবেচা করে। দুজন কয়াল জিনিস মাপতে হিমশিম খেয়ে যায়। অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা সে মুনাফা করলে এই এক মরসুমে পটপটিতলার সায়ের থেকে। লোকজন, মুহুরী, গোমস্তা রাখলে, মুদীখানা দোকান বড় গোলদারী দোকানে পরিণত করলে, পাশে একখানা কাপড়ের দোকানও খুললে।

আগের নালু পাল ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ, এখন সে হোলো ধনী মহাজন।

কিন্তু নালু পালকে দেখে তুমি চিনতে পারবে না। খাটো ন' হাত ধুতি পরনে, খালি গা, খালি পা। ব্রাহ্মণ দেখলে ঘাড় নুইয়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নেবে। গলায় তুলসীর মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি—নাঃ, নালু পাল যা একজীবনে করলে, অনেকের পক্ষেই তা স্বপ্ন।

যদি তুমি জিজ্ঞেস করলে—পালমশায়, ভালো সব ?

বিনীত ভাবে হাত জোড় ক'রে নালু পাল বলবে—প্রাতোপেন্নাম হই। আসুন, বসুন। না ঠাকুরমশাই, ব্যবসার অবস্থা বড্ড মন্দা। এসব ঠাটবাট তুলে দিতি হবে। প্রায় অচল হয়ে এসেচে। চলবে না আর। মুখের দীনভাব দেখলে অনভিজ্ঞ লোকে হয়তো নালু পালের অবস্থার বর্তমান অবনতির জন্যে দুঃখ বোধ করবে। কিন্তু ওটা শুধু বৈষ্ণব-সুলভ দীনতা মাত্র নালু পালের, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। সায়েরেই বছরে চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকা কেনাবেচা হয়। ত্রিশ হাজার টাকা কাপড়ের কারবারের মূলধন।

নালু পালের একজন অংশীদার আছে, সে হচ্ছে সেই সতীশ কলু। দুজনে একদিন মাথায় মোট নিয়ে হাটে হাটে জিনিস বিক্রী করতো, নালু পাল সুপুরি, সতীশ কলু তেল। তারপর হাতে টাকা জমিয়ে ছোট এক মুদির দোকান করলে নালু পাল। সতীশের পরামর্শে নালু তেঘরা-শেখহাটি আর বাঁধমুড়া মোকাম থেকে সর্ষে, আলু আর তামাক কিনে এনে দেশে বেচতে শুরু করে। সতীশ এতে শূন্য বখরাদার ছিল, মোকাম সন্ধান করতো। কাঁটায় মাল খরিদ করতে ওস্তাদ ঘুঘু সতীশ কলু। কৃতিত্ব এই, একবার তাকালে বিক্রেতা মহাজন বুঝতে পারবে, হাঁ, খদ্দের বটে। সতীশ কলুর কৃতিত্ব এই উন্নতির মূলে—নালু পাল গোড়া থেকেই সততার জন্যে নাম কিনেছিল। দুজনের সম্মিলিত অবদানে আজ এই দৃঢ় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেচে।

স্বামী বাড়ি ফিরলে তুলসী বললে—হ্যাঁগা, এবার কালীপুজোতে অমন ঝিম হয়ে বসে আছ কেন ?

—বড্ড কাজের চাপ পড়েচে বড়বৌ। মোকামে পাঁচশো মণ মাল কেনা

পড়ে আছে, আনবার কোনো বন্দোবস্ত ক'রে উঠতি পাচ্চিনে--

—ও সব আমি শুনচিনে। আমার ইচ্ছে, গাঁয়ের সব বেরাহ্মণদের এবার লুচি চিনির ফলার খাওয়াবো। তুমি বন্দোবস্ত করে দাও। আর আমার সোনার যশম চাই।

—বাবা, এবার যে মোটা খরচের ফর্দ!

—তা হোক। খোকাদের কল্যেণে এ তোমাকে কত্তি হবে। আর ছোট খোকার বোর, পাটা, নিমফল তোমাকে ওই সঙ্গে দিতি হবে।

—দাঁড়াও বড়বৌ, একসঙ্গে অমন গড়গড় ক'রে বলো না। রয়ে বসে—

—না, রতি বসতি হবে না। ময়না ঠাকুরঝিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনাতি হবে—আমি আজই সয়ের মাকে পাঠিয়ে দিই।

—আরে, তারে তো কালীপূজোর সময় আনতিই হবে—সে তুমি পাঠিয়ে দাও না যখন ইচ্ছে। আবার দাঁড়াও, ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা কোথায় ফলার খাবেন তার ঠিক করি। চন্দর চাটুয্যে তো মারা গিয়েচেন—

—আমি বলি শোনো, ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ি যদি করতি পারো! আমার দুটো সাধের মধ্যি এ হোলো একটা।

—আর একটা কি শুনতি পাই?

—খুব শুনতি পারো। রামকানাই কবিরাজকে তন্ত্রধার করে পূজো করাতি হবে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

—বোঝলাম—কিন্তু সে বড্ড শক্ত বড়বৌ। পয়সা দিয়ে তেনারে আনা যাবে না, সে চীজ না। ও ভবানী ঠাকুরেরও সেই গতিক। তবে তিলু দিদিমণি আছেন সেখানে সেই ভরসা। তুমি গিয়ে তেনারে ধরে রাজী করাও। ওঁদের বাড়ি হলি সব বেরাহ্মণ খেতি যাবেন।

স্বামী-স্ত্রীর এই পরামর্শের ফলে কালীপূজার রাত্রে এ গ্রামের সব ব্রাহ্মণ ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হোলো। তিলুর খোকা যাকে গ্যাখে তাকেই বলে—কেমন আছেন?

কাউকে বলে—আসুন, আসুন। তুমি ভালো আছেন?

তিলু ও নিলু সকলের পাতে নুন পরিবেশন করচে দেখে খোকা বায়না ধরলে, সেও নুন পরিবেশন করবে। সকলের পাতে নুন দিয়ে বেড়ালে। দেবার আগে প্রত্যেকের মুখের দিকে বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখে চায়। বলে—তুমি নেবে? তুমি নেবে?

দেখতে বড় সুন্দর মুখখানি, সকলেই ওকে ভালোবাসে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তা হবে না, মাও সুন্দরী, বাপও সুপুরুষ। লোকে ঘাঁটিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আর সুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে অকারণে বলে ওঠে—খোকন, এই যে ইদিকি লবণ দিয়ে যাও বাবা—

খোকা ব্যস্ত সুরে বলে—যাই-ই—

কাছে গিয়ে বলে—তুমি ভালো আছেন? নুন নেবে?

রামকানাই কবিরাজ কালীপূজার তন্ত্রধারক ছিলেন। তিনিও এক পাশে খেতে বসেচেন। তিলু তাঁর পাতে গরম গরম লুচি দিচ্ছিল বার বার এসে। রামকানাই বললেন—নাঃ দিদি, কেন এত দিচ্চ? আমি খেতে পারিনে যে অত।

রামকানাই কবিরাজ বুড়ো হয়ে পড়েচেন আগেকার চেয়ে। কবিরাজ ভালো হোলে কি হবে, বৈষয়িক লোক তো নন, কাজেই পয়সা জমাতে পারেন নি। যে দরিদ্র সেই দরিদ্র। বড় সাহেব শিপ্‌টন্ একবার তাঁকে ডাকিয়ে পূর্ব অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ম্লেচ্ছের দান নেবেন না বলে রামকানাই সে অর্থ প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছিলেন।

ভোজনরত ব্রাহ্মণদের দিকে চেয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিল লালমোহন পাল। আজ তার সৌভাগ্যের দিন, এতগুলি কুলীন ব্রাহ্মণের পাতে সে লুচি-চিনি দিতে পেরেচে। আধমণ ময়দা, দশ সের গব্যঘৃত ও দশ সের চিনি বরাদ্দ। দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার। দেখেও সুখ।

—ও তুলসী, দাঁড়িয়ে দ্যাখোসে—চক্ষু সার্থক করো—

তুলসী এসে লজ্জায় কাঁটালতলায় দাঁড়িয়েছিল—স্ত্রীকে সে ডাক দিলে। তুলসী একগলা ঘোমটা দিয়ে স্বামীর অদূরে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে স্বামী-স্ত্রী চেয়ে রইল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের দিকে। নালু পালের মনে কেমন এক ধরনের আনন্দ,

তা বলে বোঝাতে পারে না। কিশোর বয়সে ও প্রথম যৌবনে কম কষ্টটা করেছে মামার বাড়িতে? মামীমা একটু বেশী তেল দিত না মাথতে। শখ করে বাব্‌রি চুল রেখেছিল মাথায়, কাঁচা বয়সের শখ। তেল অভাবে চুল রুক্ষ থাকতো। দুটি বেশি ভাত খেলে বলতো, হাতীর খোরাক আর বসে বসে কত যোগাবো? অথচ সে কি বসে বসে ভাত খেয়েচে মামারবাড়ির? দু' ক্রোশ দূরবর্তী ভাতছালার হাট থেকে সমানে চাল মাথায় করে এনেচে। মামীমা ধানসেদ্ধ শুকনো করবার ভার দিয়েছিল ওকে। রোজ আধমণ বাইশ সের ধান সেদ্ধ করতে হোতো। হাট থেকে আসবার সময় একদিন চাদরের খুঁট থেকে একটা রূপোর দুয়ানি পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। মামীমা তিনদিন ধরে রোজ ভাতের থালা সামনে দিয়ে বলতো—আর ধান নেই, এবার ফুরলো। মামার জমানো গোলার ধান আর ক'দিন খাবা? পথ ত্থাখো এবার। সেদিন ওর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

সেই নালু পাল আজ এতগুলি ব্রাহ্মণের লুচি-চিনির পাকা ফলার দিতে পেরেচে!

ইচ্ছে হয় সে চেঁচিয়ে বলে—তিনু দিদি, খুব ত্থাও, যিনি যা চান ত্থাও—একদিন বড্ড কষ্ট পেয়েচি দুটো খাওয়ার জন্যি।

ব্রাহ্মণের দল খেয়েদেয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তুলসী আবার গিয়ে ঘোমটা দিয়ে দূরে কাঁটালতলায় দাঁড়ালো। লালমোহন হাত জোড় ক'রে প্রত্যেকের কাছে বললে—ঠাকুরমশাই, পেট ভরলো?

গ্রামের সকলে নালু পালকে ভালোবাসে। সকলেই তাকে ভালো ভালো কথা বলে গেল। শম্ভু রায় (রাজারাম রায়ের দূরসম্পর্কের ভাইপো, সে কলকাতায় আমুট কোম্পানীর হৌসে নকলনবিশ) বললে—চলো নালু আমার সঙ্গে সোমবারে কলকাতা, উৎসব হচ্চে সামনের হপ্তাতে—খুব আনন্দ হবে দেখে আসবা—এ গাঁয়ের কেউ তো কিছু দেখলে না—সব কুয়োর ব্যাং—রেলগাড়ি খুলেচে হাওড়া থেকে পেঁড়ো বর্ধমান পজ্জন্ত, দেখে আসবা—

—রেলগাড়ি জানি। আমার মাল সেদিন এসেচে রেলগাড়িতে ওদিকের

কোন্ জায়গা থেকে। আমার মুহুরী বলছিল।

—দেখেচ?

—কলকাতায় গেলাম কবে যে দেখবো?

—চলো এবার দেখে আসবা।

—ভয় করে। শুনিচি নাকি বেজায় চোর-জুয়োচোরের দেশ।

—আমার সঙ্গে যাবা। তোমরা টাকার লোক, তোমাদের ভাবনা কি, ভাল বাঙালী সরাইখানায় ঘরভাড়া করে দেবো। জীবনে অমন কখনো দেখবা না আর। কাবুল-যুদ্ধে জিতে সরকার থেকে উৎসব হচ্চে।

এইভাবে নালু পাল ও তার স্ত্রী তুলসী উৎসব দেখতে কলকাতা রওনা হোলো। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আপত্তি উঠেছিল নালু পালের পরিবারে। সাহেবরা খৃষ্টান করে দেয় সেখানে নিয়ে গেলে গোমাংস খাইয়ে। আরও কত কি। শম্ভু রায় এ গ্রামের একমাত্র ব্যক্তি যে কলকাতার হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সে সকলকে বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

কলকাতায় এসে কালীঘাটে ছোট্ট খোলার ঘর ভাড়া করলে ওরা, ভাড়াটা কিছু বেশি, দিন এক আনা। আদিগঙ্গায় স্নান করে জোড়া পাঁঠা দিয়ে সোনার বেলপাতা দিয়ে পূজো দিলে তুলসী।

সাত দিন কলকাতায় ছিল, রোজ গঙ্গাস্নান করতো, মন্দিরে পূজো দিত।

তারপর কলকাতার বাড়িঘর, গাড়িঘোড়া—তার কি বর্ণনা দেবে নালু আর তুলসী? চারঘোড়ার গাড়ি ক'রে বড় বড় লোক গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে আসে, তাদের বড় বড় বাগানবাড়ি কলকাতার উপকণ্ঠে, শনি রবিবারে নাকি বাইনাচ হয় প্রত্যেক বাগানবাড়িতে। এক-একখানা খাবারের দোকান কি! অত সব খাবার চক্ষেও দেখে নি ওরা। লোকের ভিড় কি বড় রাস্তায়, যেদিন গড়ের মাঠে আতসবাজি পোড়ানো হোলো! সায়েবেরা বেত হাতে ক'রে সামনের লোকদের মারতে মারতে নিজেরা বীরদর্পে চলে যাচ্ছে। ভয়ে লোকজন পথ ছেড়ে দিচ্চে, তুলসীর গায়েও এক

ঘা বেত লেগেছিল. পেছনে চেয়ে দেখে দুজন সাহেব আর একজন মেম, দুই সায়েব বেত হাতে নিয়ে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মারতে মারতে চলেচে। তুলসী 'ও মাগো' বলে সভয়ে পাশ দিয়ে দাঁড়ালো। শম্ভু রায় ওদের হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে এল। নালু পাল বাজার করতে গিয়ে লক্ষ্য করলে, এখানে তরিতরকারী বেশ আক্রা দেশের চেয়ে। তরিতরকারী সের দরে বিক্রয় হয় সে এই প্রথমে দেখলে। বেগুনের সের দু পয়সা। এখানকার লোক কি খেয়ে বাঁচে! দুধের সের এক আনা ছ পয়সা। তাও খাঁটি দুধ নয়, জল মেশানো। তবে শম্ভু রায় বললে, এই উৎসবের জন্যে বহু লোক কলকাতায় আসার দরুণ জিনিসপত্রের যে চড়া দর আজ দেখা যাচ্ছে এটাই কলকাতায় সাধারণ বাজার-দর নয়। গোল আলু যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সস্তা। এই জিনিসটা গ্রামে নেই, অথচ খেতে খুব ভালো। মাঝে মাঝে মুদিখানার দোকানীরা শহর থেকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বটে, দাম বড্ড বেশি। নালু পাল তুলসীকে বললে—কিছু গোল আলু কিনে নিয়ে যেতি হবে দেশে। পড়তায় পোষায় কিনা দেখে আমার দোকানে আমদানি করতি হবে।

তুলসী বললে—ও সব সায়েবদের খাবার হাঁড়িতে দেওয়া যায় না সব সময়।

—কে তোমাকে বলেচে সায়েবদের খাবার? আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে যথেষ্ট। আমি মোকামের খবর রাখি। কালনা কাটোয়া মোকামের আলু সস্তা, অনেক চাষ হয়। আমাদের গাঁ ঘরে আনলি তেমন বিক্রি হয় না, নইলে আমি কালনা থেকে আলু আনতে পারিনে, না খবর রাখিনে! শহরে চলে, গাঁয়ে কিনবে কেডা?

তুলসী বললে—ঢেঁকি কিনা! স্বগ্‌গে গেলেও ধান ভানে। ব্যবসা আর কেনা-বেচা। এখানে এসেও তাই।

এই তাজ্জব ভ্রমণের গল্প নালু পালকে কতদিন ধরে করতে হয়েছিল গ্রামের লোকেদের কাছে। কিন্তু এর চেয়েও একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। শীতকালের মাঝামাঝি একদিন দেওয়ান হরকালী সুর আর নরহরি

পেশ্‌কার এসে হাজির হোলো ওর আড়তে। নালু পাল ও সতীশ কলু তটস্থ হয়ে শশব্যস্ত হয়ে ওদের অভ্যর্থনা করলে। তখনি পান-তামাকের ব্যবস্থা হোলো। নীলকুঠির দেওয়ান, মানী লোক, হঠাৎ কারো কাছে যান না। একটু জলযোগের ব্যবস্থা করবার জন্যে সতীশ কলু নবু ময়রার দোকানে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজী তাঁর আসার কারণ প্রকাশ করলেন, বড় সাহেব কিছু টাকা ধার চান। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সারন্‌ মোল্লাহাটির কুঠি ছেড়ে দিচ্ছে, নীলের ব্যবসা মন্দা পড়েছে বলে তারা এ কুঠি রাখতে চায় না। শিপ্‌টন্‌ সাহেব নিজ সম্পত্তি হিসেবে এ কুঠি রাখতে চান, এর বদলে পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সারনকে। এই কুঠিবাড়ি বন্ধক দিয়ে বড় সাহেব নালু পালের কাছে টাকা চায়।

নরহরি পেশ্‌কার বললে—কুঠিটা বজায় রাখার এই একমাত্র ভরসা। নইলে চৈত্র মাস থেকে নীলকুঠি উঠে গেল। আমাদের চাকুরি তো চলে গেলই, সায়েবও চলে যাবে।

দেওয়ান হরকালী বললেন—বড় সায়েবের খুব ইচ্ছে নিজে কুঠি চালিয়ে একবার দেখবেন। এতকাল এদেশে কাটিয়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। দেশে কেউ নেইও তো, মেমসায়েব তো মারা গিয়েছেন। একটা মেয়ে আছে, সে এদেশে কখনো আসে নি।

নালু পাল হাত জোড় ক'রে বললে—এখন কিছু বলতি পারবো না দেওয়ানবাবু। ভেবে দেখতি হবে—তা ছাড়া আমার একার ব্যবসা না, অংশীদারের মত চাই। তিন-চারদিন পরে আপনাকে জানাবো।

দেওয়ান হরকালী সুর বিদায় নিয়ে যাবার সময় বললেন—তিন দিন কেন, পনেরো দিন সময় আপনি নিন পালমশাই। মার্চ মাসে টাকার দরকার হবে.. এখনো দেরি আছে—

তুলসী শুনে বললে—বল কি!

—আমিও ভাবচি। কিসে থেকে কি হোলো!

—টাকা দেবে?

—আমার খুব অনিচ্ছে নেই। অত বড় কুঠিবাড়ি, দেড়শো বিঘে খাস জমি, বড় বড় কলমের আমের বাগান, ঘোড়া, গাড়ি, মেজ কেদারা, ঝাড়লণ্ঠন সব বন্দক থাকবে। কুঠির নেই-নেই এখনো অনেক আছে। কিন্তু সতে কলুর স্থাখলাম ইচ্ছে নেই। ও বলে—আমরা আড়তদার লোক, হ্যাংগামাতে যাওয়ার দরকার কি? এরপর হয়তো ওই নিয়ে মামলা করতি হবে।

সমস্ত রাত নালু পালের ঘুম হোলো না। বড় সাহেব শিপ টন,...টম্‌টম্ করে যাচ্ছে...কুঠির পাইক লাঠিয়াল...দব্‌দবা রব্‌রবা...মাবো শ্যামচাঁদ...লাও ঘর জ্বালিয়ে...সে মোল্লাহাটির হাটে পানসুপুরির মোট নিয়ে বিক্রি করতি যাচ্চে।

টাকা দিতে বড্ড ইচ্ছে হয়।

এই বছরে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। আফগান যুদ্ধ-জয়ের উৎসব ছাড়াও।

মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে বড় সাহেব হঠাৎ মারা গেল মার্চ মাসের শেষে।

সাহেব যে অমন হঠাৎ মারা যাবে তা কেউ কল্পনা করতে পারে নি।

অসুখের সময় গয়ামেম যেমন সেবা করেচে অমন দেখা যায় না। রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই সে রোগীর কাছে সর্বদা হাজির থাকে। জ্বরের ঝোঁকে শিপ্‌টন্ বকে, কি সব গান গায়। গয়া বোঝে না সাহেবের কি সব কিচির মিচির বুলি।

ওকে বললে—গয়া শুনো—

—কি গা?

—ব্র্যাণ্ডি ডাও। ডিটে হইবে টোমায়।

গয়া ক'দিন রাত জেগেচে। চোখ রাঙা, অসম্বৃত কেশপাশ, অসম্বৃত বসন। সাহেবের লোকলস্কর দেওয়ান আরদালি আমীন সবাই সর্বদা দেখাশুনা করচে তটস্থ হয়ে, কুঠির সেদিন যদিও এখন আর নেই, তবুও এখনো

ওরা বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর বেতনভোগী ভৃত্য। কিন্তু গয়া ছাড়া মেয়েমানুষ আর কেউ নেই। সে-ই সর্বদা দেখাশুনো করে, রাত জাগে। গয়া মদ খেতে দিলে না। ধমকের সুরে বললে—না, ডাক্তারে বারণ করেচে—পাবে না।

শিপ্‌টন্‌ ওর দিকে চেয়ে বললে—Dearie, I adore you, বুঝলে? I adore you.

—বকবে না।

—ব্র্যাণ্ডি ডাও, just a little, won't you? একটুখানা—

—না। মিছরির জল দেবানি।

—Oh, to the hell with your candy water! When I am getting my peg? ব্র্যাণ্ডি ডাও—

—চুপ করো। কাশি বেড়ে যাবে। মাথা ধরবে।

শিপ্‌টন্‌ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দু'দিন পরে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। দেওয়ান হরকালী সুর সাহেবকে কলকাতায় পাঠাবার খুব চেষ্টা করলেন। সাহেবের সেটা দেখা গেল একেবারেই ইচ্ছে নয়। মহকুমার শহর থেকে প্রবীণ অক্ষয় ডাক্তারকে আনানো হোলো, তিনিও রোগীকে নাড়ানাড়ি করতে বারণ করলেন।

একদিন রামকানাই কবিরাজকে আনালে গয়া মেম।

রামকানাই কবিরাজ জড়িবুটির পুঁটলি নিয়ে রোগীর বিছানার পাশে একখানা কেদারার ওপর বসেছিলেন, সাহেব ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—Ah! The old medicine man! When did I meet you last, my old medicine man? টোমাকে জবাব দিতে হইতেছে—আমি জবাব চাই—

তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—You will not be looking at the moon, will you? Your name and profession?

গয়া বললে—বুঝলে বাবা, এই রকম করচে কাল থেকে। শুধু মাথামুণ্ডু বকুনি।

রামকানাই একমনে রোগীর নাড়ী দেখছিল। রোগীর হাত দেখে সে

বললে—ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা—একটু মৌরীর জল খাওয়াবে মাঝে মাঝে। আমি যে ওষুধ দেবো, তার সহপান যোগাড় করতি হবে মা, অনুপানের চেয়ে সহপান বেশি দরকারী—আমি দেবো কিছু কিছু জুটিয়ে—আমার জানা আছে—একটা লোক আমার সঙ্গে দিতি হবে।

শিপ্‌টন্ সাহেব খাট থেকে উঠবার চেষ্টা ক'রে বললে You see, old medicine man, I have too many things to do this summer to have any time for your rigmarole—you just—

শ্রীরাম মুচি ও গয়া সাহেবকে আবার জোর ক'রে খাটে শুইয়ে দিলে।

গয়া আদরের সুরে বললে—আঃ, বকে না, ছিঃ—

সাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়েই ছিল। খানিকটা পরে বলে উঠলো—Shall I get you a glass ot vermouth, my good man—এক গ্লাস মড্ খাইবে? ভাল মড্—oh, that reminds me, when I am going to have my dinner? আমার খানা কখন ডেওয়া হইবে? খানা আনো—

পরের দু'রাত অত্যন্ত, ছট্‌ফট করার পরে, গয়াকে বকুনি ও চীৎকারের দ্বারা উত্ত্যক্ত ও অতিষ্ঠ করার পরে, তৃতীয় দিন দুপুর থেকে নিঃঝুম মেরে গেল। কেবল একবার গভীর রাত্রে চেয়ে চেয়ে সামনে গয়াকে দেখে বললে—Where am I?

গয়া মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে—কি বলচো সায়েব? আমায় চিনতি পারো?

সাহেব খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললে—What wages do you get here?

সেই সাহেবের শেষ কথা। তারপর ওর খুব কষ্টকর নাভিশ্বাস উঠলো এবং অনেকক্ষণ ধরে চললো। দেখে গয়া বড় কান্নাকাটি করতে লাগলো। সাহেবের বিছানা ঘিরে শ্রীরাম মুচি, দেওয়ান হরকালী, প্রসন্ন আমীন, নরহরি পেশ্‌কার, নফর মুচি সবাই দাঁড়িয়ে। দেওয়ান হরকালী বললে এ কষ্ট আর দেখা যায় না—কি যে করা যায়!

কিন্তু শিপ্‌টন্ সাহেবের কষ্ট হয় নি। কেউ জানতো না সে তখন বহুদূরে স্বদেশের ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের অ্যান্ডরি গ্রামের ওপরকার পার্বত্যপথ রাইনোজ প্লাস্ দিয়ে ওক্ আর এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় ছায়ায় তার দশ বছর বয়সের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলেছিল খরগোশ শিকার করতে, কখনো বা পার্বত্য হ্রদ এল্‌টার-ওয়াটারের বিশাল বুকে নৌকোয় চড়ে বেড়াচ্ছিল, সঙ্গে ছিল তাদের গ্রেট ডেন কুকুরটা কিংবা কখনো মস্ত বড় পাইপ আর কার্প মাছ বঁড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তুলতে ব্যস্ত ছিল···আর সব সময়েই ওর কানে ভেসে আসছিল তাদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘণ্টাধ্বনি, বহুদূর থেকে তুষার-শীতল হাওয়ায় পাতা ঝরা বীচ্ গাছের আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে দিয়ে···

তিলু ডুমুরের ডালনার সবটা স্বামীর পাতে দিয়ে বললে—খান আপনি।

ভিজে গামছা গায়ে ভবানী খেতে খেতে বললেন · উঁহু উঁহু, কর কি ?

—খান না, আপনি ভালোবাসেন।

—খোকা খেয়েচে ?

—খেয়ে কোথায় বেরিয়েচে খেলতে। ও নিলু, মাছ নিয়ে আয়। খয়রা ভাজা খাবেন আগে, না চিংড়ি মাছ ?

—খয়রা কে দিলে ?

—দেবে আবার কে ? রাজারা সোনা কোথায় পায় ? নিমাই জেলে আর ভীম দিয়ে গেল। তু'পয়সার মাছ। আজকাল আবার কড়ি চলচে না হাটে। বলে, তামার পয়সা গ্যাও।

—কালে কালে কত কি হচ্চে! আরও কত কি হবে! একটা কথা শুনেচো ?

—কি ?

এই সময় নিলু খয়রা মাছ ভাজা পাতে দিয়ে দাঁড়ালো কাছে। ভবানী তাকে বসিয়ে গল্পটা শোনালেন। তাদের দেশে রেল লাইন বসেচে, চুয়োডাঙা পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে গিয়েচে। কলের গাড়ি এই বছর যাবে কিংবা সামনের

বছর। তিলু অবাক হয়ে বাউটি-শোভিত হাত দুটি মুখে তুলে একমনে গল্প শুনছিল, এমন সময় রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বাসনপত্র যেন স্থানচ্যুত হবার শব্দ হোলো। নিলু খয়রা মাছের পাত্রটা নামিয়ে রেখে হাত মুঠো ক'রে চিবুকে দিয়ে গল্প শুনছিল, অমনি পাত্র তুলে নিয়ে দৌড় দিলে রান্নাঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাকে বলতে শোনা গেল—যাঃ যাঃ, বেরো আপদ—

তিলু ঘাড় উঁচু ক'রে বললে—হ্যাঁরে নিয়েচে?

—বড় বেলে মাছটা ভেজি রেখেছি ওবেলা খোকাকে দেবো বলে, নিয়ে গিয়েচে।

—ধাড়িটা না মেদিটা?

—ধাড়িটা।

—ওবেলা ঢুকতি দিবিনে ঘরে, ঝাঁটা মেরে তাড়াবি।

ভবানী বললেন—সেও কেষ্টর জীব। তোমার আমার না খেলে খাবে কার? খেয়েচে বেশ করেচে। ও নিলু, চলে এসো, গল্প শোনো। আর দু'দিন পরে বেঁচে থাকলে কলের গাড়ি শুধু দেখা নয়, চ'ড়ে শান্তিপুরে রাস দেখে আসতে পারবে।

নিলু ততক্ষণ আবার এসে বসেছে খালি হাতে। ভবানী গল্প করেন। অনেক কুলি এসেচে, গাঁইতি এসেচে, জঙ্গল কেটে লাইন পাতচে। রেলের পাটি তিনি দেখে এসেচেন। লোহার ইঁটের মত, খুব লম্বা। তাই জুড়ে জুড়ে পাতে।

তিলু বললে—আমরা দেখতে যাবো বলো।

—যেও, লাইন পাতা দেখে কি হবে? সামনের বছর থেকে রেল চলবে এদিকে। কোথায় যাবে বলো।

নিলু বললে—জষ্টি যুগল। দিদিও যাবে।

যুগল দেখিলে জষ্টি মাসে
পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে—

—উঃ, বড্ড স্বামীভক্তি যে দেখচি!

—আবার হাসি কিসের? খাড়ু পৈঁছে আর নোয়া বজায় থাকুক, তাই

বলুন। মেজদি ভাগ্যিমানি ছিল—একমাথা সিঁদুর আর কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে চলে গিয়েচে, দেখতি দেখতি কতদিন হয়ে গেল!

তিলু বললে—ওঁর খাবার সময় তুই বুঝি আর কথা খুঁজে পেলি নে? যত বয়েস হচ্চে, তত ধাড়ি ধিঙ্গি হচ্চেন দিন দিন।

বিলুর মৃত্যু যদিও আজ চার-পাঁচ বছর হোলো হয়েচে, তিলু জানে স্বামী এখনো তার কথায় বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান। দরকার কি খাবার সময় সে কথা তুলবার!

নিস্তারিণী ঘোমটা দিয়ে এসে এই সময় উঠোন থেকে ব্যস্তস্বরে বললে—ও দিদি, বট্‌ঠাকুরের খাওয়া হয়ে গিয়েচে?

—কেন রে, কি ওতে?

—আমড়ার টক আর কচুশাকের ঘণ্ট। উনি ভালোবাসেন বলেছিলেন, তাই বলি রান্না হোলো নিয়ে যাই। খাওয়া হয়ে গিয়েচে—

—ভয় নেই। খেতে বসেচেন, দিয়ে যা—

সলজ্জ স্বরে নিস্তারিণী বললে—তুমি দাও দিদি। আমার লজ্জা—

—ইস! ওর মেয়ের বয়স, উনি আবার লজ্জা—যা দিয়ে আয়—

—না দিদি।

—হ্যাঁ—

নিস্তারিণী জড়িতচরণে তরকারির বাটি নামিয়ে রাখলে এসে ভবানী বাঁড়ুয্যের থালার পাশে। নিজে কোনো কথা বললে না। কিন্তু ওর চোখমুখ আগ্রহে ও উৎসাহে এবং কৌতূহলে উজ্জ্বল। ভবানী বাটি থেকে তরকারি তুলে চেখে দেখে বললেন—চমৎকার কচুর শাক। কার হাতের রান্না বৌমা?

নিস্তারিণী এ গ্রামের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের বৌ। সে একা সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যায়, অনেকের সঙ্গে কথা কয়, অনেক দুঃসাহসের কাজ করে—যেমন আজ এই দুপুরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে তরকারি আনা ওপাড়া থেকে। এ ধরনের বৌ এ গ্রামে কেউ নেই। লোকে অনেক কানাকানি করে, আঙুল দিয়ে দেখায়, কিন্তু নিস্তারিণী খুব অল্প বয়সের বৌ নয়, আর বেশ শক্ত,

শ্বশুর শাশুড়ী বা আর কাউকেও তেমন মানে না। সুন্দরী এক সময়ে বেশ ভালোই ছিল, এখন যৌবন সামান্য একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

ভবানীর বড় মমতা হয়। প্রাণের শক্তিতে শক্তিময়ী মেয়ে, কত কুৎসা,কত রটনাই ওর নামে। বাংলাদেশের এই পল্লী অঞ্চল যেন ক্লীবের জগৎ—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শক্তিমতী মেয়ে যে সৃষ্টির কি অপূর্ব বস্তু, মূর্খের ক্লীবের দল তার কি জানে? সমাজ সমাজ করেই গেল এ মহা-মূর্খের দল।

দেখেছিলেন এদেশে এই নিস্তারিণীকে আর গয়ামেমকে। ওই আর একটি শক্ত মেয়ে। জীবন-সাধনার বড় অভিজ্ঞান ওর চরিত্র।

রামকানাই কবিরাজের কাছে গয়ার কথা শুনেছিলেন ভবানী। নীলকুঠির বড় সাহেবের মৃত্যুর পরে রোজ সে রামকানাই কবিরাজের বাড়ি এসে চৈতন্য-চরিতামৃত শুনতো। পরের দুঃখ দেখলে সিকিটা, কাপড়খানা, কখনো এক খুঁচি চাল দিয়ে সাহায্য করতো। কত লোক প্রলোভন দেখিয়েছিল,তাতে সে ভোলে নি। সব প্রলোভনকে তুচ্ছ করেছিল নিজের মনের জোরে। বড় নাকি দুরবস্থাতে পড়েছিল, গ্রামে ওর জাতের লোক ওকে একঘরে করেছিল ওর মুরুব্বী বড় সাহেব মারা যাওয়ার পর—অথচ তারাই এককালে কত খোশামোদ করেছিল ওকে, যখন ওর এক কথায় নতুন দাগ-মারা জমির নীলের মার্কা উঠে যেতে পারতো কিংবা কুঠিতে ঘাস কাটার চাকরি পাওয়া যেতো। কাপুরুষের দল!

সন্ধ্যার সময় খেপীর আশ্রমে গিয়ে বসলেন ভবানী। খেপী ওকে দেখে খুব খাতির করলে। কিছুক্ষণ পরে ভবানী বললেন—কেমন চলচে?

এই আর একটি মেয়ে, এই খেপী। সন্ন্যাসিনী বেশ, বছর চল্লিশ বয়েস, কোনো কালেই সুন্দরী ছিল না, শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা থাকে; বাঘ আছে, দুষ্ট লোক আছে—কিছু মানে না। ত্রিশূলের এক খোঁচায় শক্ত হাতে দেবে উড়িয়ে—যে-ই দুষ্ট লোক আসুক, এ মনের জোর রাখে।

খেপী কাছে এসে বললে—আজ একটু সৎকথা শুনবো—

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন হেসে—অসৎ কথা কখনো বলেচি?

—মা-রা ভালো ?

—হু ।

—খোকা ভালো ?

—ভালো। পাঠশালায় গিয়েছে। সে এখানে আসতে চায়।

—এবার নিয়ে আসবেন।

—নিশ্চয় আনবো।

—আচ্ছা, আপনার কেমন লাগে, রূপ না অরূপ ?

—ও সব বড় বড় কথা বাদ দাও, খেপী। আমি সামান্য সংসারী লোক। যদি বলতে হয় তবে আমার গুরুভাই চৈতন্য ভারতীর কাছে শুনো।

—একটু বলতি হবে পশ্চিমির কথা। সেই বিষ্টির দিন বলেছিলেন, বড্ড ভালো লেগেছিলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এখানে মাঝে মাঝে প্রায়ই আসেন। দ্বারিক কর্মকার এখানকার এক ভক্ত, সম্প্রতি সে একখানা চালাঘর তৈরি করে দিয়েছে, সমাগত ভক্তবৃন্দের গাঁজা সেবনের সুবিধার জন্যে। এখানকার আর একজন ভক্ত হারেজ মণ্ডল নিজে খেটেখুটে ঘরখানা উঠিয়েছে, খড় বাঁশ দড়ির খরচ দিয়েছে দ্বারিক কর্মকার। ওরা সন্দের সময় রোজ এসে জড়ো হয়, গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় অশথ্‌তলা। ভবানী বাঁড়ুয্যে এলে সমীহ করে সবাই, গাঁজা সামনে কেউ খায় না।

ভবানী বললেন—শালবনের মধ্যে নদী বয়ে যাচ্চে, ওপরে পাহাড়, পাহাড়ে আমলকীর গাছ, বেলগাছ। দুটো একটা নয়, অনেক। আমার গুরুদেব শুধু আমলকী বেল আর আতা খেয়ে থাকতেন। অনেকদিনের কথা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তোমাদের দেশেই এসেছি আজ প্রায় বারো-চোদ্দ বছর হয়ে গেল। বয়েস হোলো ষাট-বাষট্টি। খোকার মা তখন ছিল ত্রিশ, এখন চুয়াল্লিশ। দিন চলে যাচ্চে জলের মত। কত কি ঘটে গেল আমি আসবার পরে। কিন্তু এখনো মনে হয় গুরুদেব বেঁচে আছেন এবং এখনো সকাল সন্দে ধ্যানস্থ থাকেন সেই আমলকীতলায়।

খেপী সন্ন্যাসিনী একমনে শুনতে শুনতে বললে—তিনি বেঁচে নেই ?

—চৈতন্য ভারতী বলে আমার এক গুরুভাই এসেছিলেন আজ কয়েক বছর আগে। তখন বেঁচে ছিলেন। তারপর আর খবর জানিনে।

—মন্ত্রদাতা গুরু ?

—এক রকম। তিনি মন্ত্র দিতেন না কাউকে। উপদেষ্টা গুরু।

—আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল দেখতি যাই। তা বয়স বেশি হোলো, অত দূরদেশে হাঁটা কি এখন পোষায় ?

—আমাদের দেশে রেলের গাড়ি হচ্চে শুনেচ ?

—শোনলাম। রেলগাড়ি হলি আমাদের চড়তি দেবে, না সায়েব সুবো চড়বে ?

—আমার বোধ হচ্চে সবাই চড়বে। পয়সা দিতে হবে।

—আমার দেবতা এই অশ্বথ্‌তলাতেই দেখা স্থান ঠাকুরমশাই। আমরা গরীব লোক, পয়সা খরচ করে যদি না-ই যেতে পারি গয়া কাশী বিন্দাবন, তবে কি গরীব বলে তিনি আমাদের চরণে ঠাঁই দেবেন না ? খুব দেবেন। রূপেও তিনি সব জায়গায়, অরূপেও তিনি সব জায়গায়। এই গাছতলার ছায়াতে আমার মত গরীবির কুঁড়েতে তিনি বসে গাঁজা খান আমাদের সঙ্গে—

—অ্যাঁ!

—বললাম, মাপ করবেন ঠাকুরমশাই। বলাডা ভুল হোলো। এ সব গুহ্য কথা। তবে আপনার কাছে বললাম, অন্য লোকের কাছে বলিনে।

ভবানী হেসে চুপ করে রইলেন। যার যা মনের বিশ্বাস তা কখনো ভেঙে দিতে নেই। ভগবান যদি এদের সঙ্গে বসে গাঁজা খান বিশ্বাস হয়ে থাকে, তিনি কে তা ভেঙে দেবার ? এই সব অল্পবুদ্ধি লোক আগে বিরাটকে বুঝতে চেষ্টা করে না, আগে থেকেই সেই অনন্তের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে থাকে। অসীমের ধারণা না হোক, সেই বড় কল্পনাও তো একটা রস। রস উপলব্ধি করতে জানে না—আগেই ব্যগ্র হয় সেই অসীমকে সীমার গণ্ডিতে টেনে এনে তাঁকে ক্ষুদ্র করতে।

খেপী বললে—রাগ করলেন ? আপনারে জানি কিনা, তাই ভয় করে।

—ভয় কি ? যে যা ভাবে ভাববে। তাতে দোষ কি আছে। আমার সঙ্গে মতে না মিললে কি আমি ঝগড়া করবো ? আমি এখন উঠি।

—কিছু ফল খেয়ে যান—

—না, এখন খাবো না। চলি—

এই সময়ে দ্বারিক কর্মকার এল, হাতে একটা লাউ। বললে—লাউয়ের সুক্ত রাঁধতে হবে।

ভবানী বললেন—কি হে দ্বারিক, তুমি খাবে নাকি ?

দ্বারিক বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে তা কখনো খাই ? ওঁর হাতে কেন, আমি নিজের মেয়ের হাতে খাই নে। ভাজনঘাটে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিইচি, তা বেয়ান বললে, মুগির ডাল লাউ দিয়ে রেঁধিচি, খাবা ? আমি বললাম, না বেয়ান, মাপ করবা। নিজির হাতে রেঁধে খালাম তাদের রান্নাঘরের দাওয়ায়।

দ্বারিক কর্মকার এ অঞ্চলের মধ্যে ছিপে মাছ মাবার ওস্তাদ। ভবানী বললেন—তুমি তো একজন বড় বর্শেল, মাছ ধরার গল্প করো না শুনি।

দ্বারিক পুনরায় বিনীতভাবে বললে—জামাইঠাকুর, হবো না কেন ? আজ দু'কুড়ি বছর ধরে এ দিগরের বিলি, বাঁওড়, নদীতি পুকুরি ছিপ বেয়ে আসচি। কেন বর্শেল হবো না বলুন। এত কাল ধরে যদি একটা লোক একটা কাজে মন দিয়ে নেগে থাকে, তাতে সে কেন পোক্ত হয়ে উঠবে না বলুন।

খেপী বললে—এতকাল ধরে ভগবানের পেছনে নেগে থাকলি যে তাঁরে পেতে। মাছ মেরে অমূল্য মানব জন্মো বৃথা কাটিযে দিলে কেন ?

দ্বারিক অত্যন্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে গেল এ কথা শুনে। এসব কথা সে কখনো ভেবে দেখে নি। আজকাল এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নতুন ধরনের কথা যেন সবে শুনচে। লাউটা সে নিরুৎসাহভাবে উঠোনের আকন্দগাছের ঝোপটার কাছে নামিয়ে রেখে দিলে। ভবানীর মমতা হোলো ওর অবস্থা দেখে। বললেন—শোন খেপী, দ্বারিকের কথা কি বলচো! আমি যে অমন গুরু পেয়েও এসে আবার গৃহী হোলাম, কেন ? কেউ বলতে পারে ? যে যা

করচে করতে দাও। তবে সেটি সে যেন ভালোভাবে সৎভাবে করে। কাউকে না ঠকিয়ে, কারো মনে কষ্ট না দিয়ে। সবাই যদি শালগ্রাম হবে, বাটনা বাটবার নুড়ি কোথা থেকে আসবে তবে?

খেপী বললে—আমি মুকখুমি সহ্য করতে পারিনে মোটে। দ্বারিক যেন রাগ কোরো না। কোথায় লাউটা? সুক্তুনি একটু দেবানি, মা কালীর পেরসাদ চাকলি জাত যাবে না তোমার।

ভবানী থাকলে সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করে, কারণ গাঁজাটা চলে না। হাফেজ মণ্ডল এসে আড়চোখে একবার ভবানীকে চেয়ে দেখে নিলে, ভাবটা এই, জামাইঠাকুর আপদটা আবার কোথা থেকে এসে জুটলো ছাই। একটু ধোঁয়া-টোঁয়া যে টানবো, তার দফা গয়া।

খেপী বললে—ঐ দেখুন, আপদগুলো এসে জুটলো, শুধু গাঁজা খাবে—

—তুমি তো পথ দেখাও, নয়তো ওরা সাহস পায়?

—আমি খাই অবিশ্যি, ওতে মনডা একদিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

এই সময় যেন একটু বৃষ্টি এল। ভবানী উঠতে চাইলেও ওরা উঠতে দিলে না। সবাই মিলে বড় চালাঘরে গিয়ে বসা হোলো। ভবানীর মুখে মহাভারতের শঙ্খ-লিখিতের উপাখ্যান শুনে ওরা বড় মুগ্ধ। শঙ্খ ও লিখিত দুই ভাই, দুইজনেই তপস্বী, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রম স্থাপন করে বাস করেন। ছোট ভাই লিখিত একদিন দাদার আশ্রমে বেড়াতে গিয়ে দেখেন দাদা আশ্রমে নেই, কোথাও গিয়েচেন। তিনি বসে দাদার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, এমন সময়ে তাঁর নজরে পড়লো, একটা ফলের বৃক্ষের ঘন ডালপালার মধ্যে একটা সুপক্ক ফল দুলচে। মহর্ষি লিখিত সেটা তখুনি পেড়ে মুখে পুরে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদা আসতেই লিখিত ফল খাওয়ার কথাটা বললেন তাঁকে। শুনে শঙ্খের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কি কথা! তপস্বী হয়ে পরস্বাপহরণ? হোলোই বা দাদার গাছ, তাহোলেও তাঁর নিজের সম্পত্তি তো নয়, একথা ঠিক তো। না বলে পরের দ্রব্য নেওয়া মানেই চুরি করা। সে যত সামান্য জিনিসই হোক না কেন। আর তপস্বীর পক্ষে তো মহাপাপ। এ দুর্মতি কেন হোলো

লিখিতের ?

শঙ্কিত স্বরে লিখিত বললেন—কি হবে দাদা ?

শঙ্খ পরামর্শ দিলেন রাজার নিকট গিয়ে চৌর্যাপরাধের বিচার প্রার্থনা করতে। তাই মাথা পেতে নিলেন লিখিত। রাজসভার সব রকমের অভ্র আহ্বান, আপ্যায়নকে তুচ্ছ করে, সভাসুদ্ধ লোকদের বিস্মিত করে লিখিত রাজার কাছে অপরাধের শাস্তি প্রার্থনা করলেন। মহারাজ অবাক। মহর্ষি লিখিতের চৌর্যাপরাধ ? লিখিত খুলে বললেন ঘটনাটা। মহারাজ শুনে হেসে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। লিখিত কিন্তু অচল, অটল। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি জানেন না, আমার দাদা জ্ঞানী ও দ্রষ্টা। তিনি যখন আদেশ করেচেন আমাকে শাস্তি নিতে হবে, তখন আপনি আমাকে দয়া করে শাস্তি দিন। লিখিতের পীড়াপীড়িতে রাজা তৎকালপ্রচলিত বিধান অনুযায়ী তাঁর দুই হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। সেই অবস্থাতেই লিখিত দাদার আশ্রমে ফিরে গেলেন—ছোট ভাইকে দেখে শঙ্খ তো কেঁদে আকুল। তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ভাই, কি কুক্ষণেই আজ তুই এসেছিলি আমার এখানে! কেনই বা লোভের বশবর্তী হয়ে তুচ্ছ একটা পেয়ারা পেড়ে খেতে গিয়েছিলি !

ঠিক সেই সময়ে সূর্যদেব অস্তচূড়াবলম্বী হোলেন। সায়ং-সন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত। শঙ্খ বললেন—চল ভাই, সন্ধ্যাবন্দনা করি।

লিখিত অসহায়ভাবে বললেন—দাদা, আমার যে হাত নেই।

শঙ্খ বললেন—সত্যাশ্রয়ী তুমি, ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছিলে, তার শাস্তিও নিয়েচ। তোমার হাতে যদি সূর্যদেব আজ অঞ্জলি না পান, তবে সত্য বলে, ধর্ম বলে আর কিছু সংসারে থাকবে ? চলো তুমি।

নর্মদার জলে অঞ্জলি দেবার সময়ে লিখিতের কাটা হাত আবার নতুন হয়ে গেল। দুই ভাই গলা ধরাধরি করে বাড়ি ফিরলেন। পথঘাট তিমিরে আবৃত হয়ে এসেচে। শঙ্খ হেসে সস্নেহে বললেন—লিখিত, কাল সকালে কত পেয়ারা খেতে পারিস দেখা যাবে !

দ্বারিক কর্মকার বললে—বাঃ বাঃ—

হাফেজ মণ্ডল বলে উঠলো—আহা-হা, আহা!

খেপী পেছন থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেই উঠলো।

প্রাচীন ভারতবর্ষের হোমধুমাচ্ছন্ন আশ্রমপদ যেন মূর্তিমান হয়ে ওঠে এই পল্লীপ্রান্তে। মহাতপস্বী সে ভারতবর্ষ, সত্যের জন্যে তার যে অটুট কাঠিন্য, ধর্মের জন্যে তার যথাসর্বস্ব বিসর্জন।—সকলেই যেন জিনিসটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে। রক্তাপ্লুতদেহ, ঊর্ধ্ববাহু লিখিত ঋষি চলেচেন 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকতে ডাকতে বনের মধ্যে দিয়ে রাজসভা থেকে দাদার আশ্রমে।

সেদিনই একখানা কাস্তে বাঁধানোর জন্যে একটা খদ্দেরকে এক আনা ঠকিয়েছে—দ্বারিক কর্মকারের মনে পড়ে গেল।

হাফেজ মণ্ডলের মনে পড়লো গত বুধবারের সন্ধ্যেবেলা সে কুড়নরাম নিকিরির ঝাড় থেকে দু'খানা তলদা বাঁশ না বলে কেটে নিয়েছিল ছিপ করবার জন্যে। সে প্রায়ই এমন নেয়। আর নেওয়া হবে না ওরকম। আহা-হা কি সব লোকই ছিল সেকালে! জামাইঠাকুরের মুখে শুনতে কি ভালোই লাগে!

খেপী দুটো কলা আর একটা শসার টুকরো ভবানী বাঁড়ুয্যের সামনে নিয়ে এসে রেখে বললে—একটু সেবা করুন। ভবানী খেতে খেতে বলছিলেন—ভগবানের শাসন হোলো মায়ের শাসন। অন্যের ভুল ত্রুটি সহ্য করা চলে, কিন্তু নিজের সন্তানেরও সব আবদার সহ্য করে না মা। তেমনি ভগবানও। ছেলেকে কেউ নিন্দে করবে, এ তাঁর সহ্য হয় না। ভক্ত আপনার জন তাঁর, তাকে শাসন করেন বেশি। এ শাসন প্রেমের নিদান। তাকে নিখুঁত করে গড়তেই হবে তাঁকে। যে বুঝতে পারে, তার চোখের সামনে ভগবানের রুদ্র রূপের মধ্যে তাঁর স্নেহমাখা প্রেমভরা প্রসন্ন দক্ষিণ মুখখানি সর্বদা উপস্থিত থাকে।

ভবানী বাঁড়ুযো ফেরবার পথে দেখলেন নিস্তারিণী একা পথ দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে ফিরচে। ওঁকে দেখে সে রাস্তার ধারের একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। রাত হয়ে গিয়েচে। এত রাত্রে কোথা থেকে ফিরচে নিস্তারিণী?

হয়তো তিলুর কাছে গিয়েছিল। অন্য কোথাও বড় একটা সে যায় না।

এ সব ভবিষ্যতের মেয়ে, অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের আগমনী এদের অলক্তরাগরক্ত চরণধ্বনিতে বেজে উঠেচে, কেউ কেউ শুনতে পায়। আজ গ্রাম্য সমাজের পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে এইসব সাহসিকা তরুণীর দল অপাংক্তেয় —প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্য বৃদ্ধদের মধ্যে ওদের বিরুদ্ধে ঘোঁট চলচে, জটলা চলচে, কিন্তু ওরাই আবাহন করে আনচে সেই অনাগত দিনটিকে।

দূর পশ্চিমাঞ্চলের কথাও মনে পড়লো। এ রকম সাহসী মেয়ে কত দেখেচেন সেখানে, ব্রজধামে, বিঠুরে, বাল্মীকি-তপোবনে। সেখানে কেলিকদম্বের চিরহরিৎপল্লবদলের সঙ্গে মিশে আছে যেন পীতাভ নিম্বপত্রের বর্ণমাধুরী, গাঢ় নীল কণ্টকক্রমযুক্ত লাল রংয়ের ফুলে ফুলে ঢাকা নিবিড় অতিমুক্তলতাঝোপের তলে ময়ূরেরা দল বেঁধে নৃত্য করচে, কালিন্দীর জলরাশিতে গাছের ছায়ায় ঘাগরাপরা সুঠামদেহা তরুণী ব্রজরমণীর দল জলকেলি-নিরতা। মেয়েরা উঠবে কবে বাংলা দেশের? নিস্তারিণীর মত শক্তিমতী কন্যা, বধূ কবে জন্মাবে বাংলার ঘরে ঘরে?

তিলু বললে রাত্রে —হ্যাগো, নিস্তারিণী আবার যে গোলমাল বাধালে?

—কি?

—ও আবার কার সঙ্গে যেন কি রকম বাধাচ্চে—

—গোবিন্দ?

—উঁহু। সে সব নয়, ওর সঙ্গে দেখা করতি আসে মাঝে মাঝে, ওর বাপের বাড়ির লোক।

—কিছু হবে না, ভয় নেই। বললে কে এসব কথা?

—ও-ই বলছিল। সন্দের অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত বসে নিলু আর আমার সঙ্গে সেই সব গল্প করছিল। খোলামেলা সবই বলে, ঢাক-ঢাক নেই। আমার ভালো লাগে। তবে আগে ছিল ছিল, এখন বয়েস হচ্চে। আমি বকিচি আজ।

—না, বেশি বোকো না। যে যা বোঝে করুক।

—আবার কি জানেন, বড্ড ভালোবাসে আপনাকে—

—আমাকে ?

—অবাক হয়ে গেলেন যে ! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। কখন কোন্ দিকে চলেন আপনারা। শুনুন, আপনার ওপর সত্যিই ওর খুব ছেদ্দা। ও বলে, দিদি, আপনার মত স্বামী পাওয়া কত ভাগ্যির কথা। যদি বলি বুড়ো, তবে যা চটে যায়। বলে, কোথায় বুড়ো ? উনি বুড়ো বই কি ! ঠাকুরজামাইয়ের মত লোক যুবোদের মধ্যি ক'টা বেরোয় ছাখাও না ?…এই সব বলে—হি হি—ওর আপনার ওপর সোহাগ হোলো নাকি ? আপনাকে দেখ্‌তিই আসে এ বাড়ি।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই, আমার মেয়ের বয়সী না ?

—সে তো আমরাও আপনার মেয়ের বয়সী ; তাতে কি ? ওর কিন্তু ঠিক —আপনার ওপর—

—যাক সে। শোনো, খোকা কোথায় ?

—এই খানিকটা আগে খেলে এল। শুয়ে পড়েচে। কি বই পড়ছিল। আমাকে কেবল বলছিল, মা, আমি বাবার সঙ্গে খেতি বসবো। আমি বললাম, আপনার ফিরতি অনেক রাত হবে। জায়গা করি ?

—করো—কিন্তু সন্দে-আহ্নিকটা একবার করে নেবো। নিলুকে ডাকো—

নীলমণি সমাদ্দার পড়ে গিয়েচেন বিপদে। সংসার অচল হয়ে পড়েচে। তিন আনা দর উঠে গিয়েচে এক কাঠা চালের। তাঁর একজন বড় মুরুব্বী ছিলেন দেওয়ান রাজারাম। রাজারামের খুন হয়ে যাওয়ার পরে নীলমণি বড় বেকায়দায় পড়ে গিয়েচেন। রাজারামদাদা লোক বড় ভালো ছিল না, কূটবুদ্ধি, সাহেবের তাঁবেদার। তাই করতে গিয়েই মারাও পড়লো। আজকাল একথা সবাই জানে এ অঞ্চলে, শ্যাম বাগ্‌দীর মেয়ে কুসুমকে তিনি বড় সাহেবের হাতে সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন রাতে চুপিচুপি ওকে ভুলিয়ে-টুলিয়ে ধাপ্পা-ধুপ্পি দিয়ে। কুসুমকে তার বাবা ওঁর বাড়ি রেখে যায় তার চরিত্র শোধরাবার জন্যে। বড় সাহেব কিন্তু কুসুমকে ফেরত দিয়েছিল, ঘরে ঢুকতেও ছায় নি। রাজারামকে বলেছিল—এখন সময় অন্যরকম, প্রজাদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়েচে, এখন কোনো

কিছু ছুতো পেলে তারা চটে যাবে, গবর্নমেণ্ট চটে যাবে, নতুন ম্যাজিস্ট্রেট নীলকর সাহেবদের ভালো চোখে দেখে না, একে নিয়ে চলে যাও। কে আনতে বলেছিল একে?

রাজারাম চলে আসেন। কুসুম কিন্তু সে কথা তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রকাশ করে দেয় — সেজন্যে বাগ্‌দী ও ডুলে প্রজারা ভয়ানক চটে যায় দেওয়ান রাজারামের ওপর। রাজারাম যে বাগ্‌দিদের দলের হাতেই প্রাণ দিলেন, এও তার একটা প্রধান কারণ।

গ্রামে কোনো কথা চাপা থাকে না। এসব কথা এখন সকলেই জানে বা শুনেছে। নীলমণি সমাদ্দার শুনেচেন কানসোনার বাগ্‌দিরা এ অঞ্চলের ওদের সমাজের প্রধান। তারাই একজোট হয়ে সেই রাত্রে রাজারামকে খুন করে। বড় সাহেব যে কুসুমকে গ্রহণ না করে ফেরত দিয়েছিল, একথাও সবাই জেনেছিল সে সময়। সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণও করেছিল সেজন্যে বড় সাহেব। যাক সে সব কথা। এখন কথা হচ্চে, নীলমণি সমাদ্দার করেন কি? স্ত্রী আন্নাকালী ডুবেলা খোঁচাচ্ছেন,— চাল নেই ঘরে। কাল ভাত হবে না, যা হয় করো, আমি কথা বলে খালাস।

ডুপুরের পর নীলমণি সমাদ্দার সেই কানসোনা গ্রামেই গেলেন। সেই অনেকদিন আগে কুঠির দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্‌দির বাড়ি। রামু বাগদির ছেলে হারু পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল কাঁটালতলায় বসে। আজকাল হারুর অবস্থা ভালো, বাড়িতে ডুটো ধানের গোলা, একগাদা বিচুলি।

হারু উঠে এসে নীলমণি সমাদ্দারকে অভ্যর্থনা করলে। নীলমণি যেন অকূলে কূল পেলেন হারুকে পেয়ে। বললেন—বাবা হারু, একটু তামাক খাওয়া দিকি।

হারু তামাক সেজে নিয়ে এসে কলার পাতায় কল্কে বসিয়ে খেতে দিলে। বললে ইদিকি কনে এয়েলেন!

ততক্ষণে নীলমণি সমাদ্দার মনে মনে একটা মতলব ঠাউরে ফেলেচেন। বললেন — তোমার কাছেই।

— কি দরকার ?

—কাল রাত্তিরি একটা খারাপ স্বপ্ন দ্যাখলাম তোর ছেলেডার বিষয়ে, নারায়ণ বাড়ি আছে ? তাকে ডাক দে।

একটু পরে নারাণ সর্দার এল থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে। এই নারাণ সর্দারই রাজারাম রায়কে খুন করবার প্রধান পাণ্ডা ছিল সেবার।

দেখতে দুর্ধর্ষ চেহারা, যেমনি জোয়ান, তেমনি লম্বা। এ গ্রামের মোড়ল।

নীলমণি বললেন —এসো নারায়ণ। একটি খারাপ স্বপ্ন দেখে তোমাদের কাছে এ্যালাম। তোমাদের আপন বলে ভা'বি, পর বলে তো কখনো ভাবি নি। স্বপ্নটা হারুর ছেলে বাদলের সম্বন্ধে। যেন দ্যাখলাম—

এই পর্যন্ত বলেই যেন হঠাৎ থেমে গেলেন।

হারু ও নারাণ সমস্বরে উদ্বেগের সুরে বললেন—কি দ্যাখলেন !

—সে আর শুনে দরকার নেই। আজ আবার অমাবস্যে শুকুরবার। ওরে বাবা! বলেচে, তদর্ধং কৃষি কর্মণি। সব্বনাশ। সে চলবে না।

নারাণই গ্রামের সর্দার, গ্রামের বুদ্ধিমান বলে গণ্য। সে এগিয়ে এসে বললে —তাহলি এর বিহিত কি খুড়োমশাই ?

নীলমণি মাথা নেড়ে বললেন—আরে সেইজন্যি তো আসা। তোমরা তো পর নও। নিতান্ত আপন বলে ভেবে এল্যাম চেরডা কাল। আজ কি তার ব্যত্যয় হবে ? না বাবা। তেমনি বাপে আমার জম্মো দ্যায় নি—

এই পর্যন্ত বলেই নীলমণি সমাদ্দার আবার চুপ করলেন। নারাণ সর্দার ন্যায় পক্ষেই বলতে পারতো যে, এর মধ্যেই বাপের জন্ম দেওয়ার কথা কেন এসে পড়লো অবান্তরভাবে, কিন্তু সে সব কিছু না বুঝে সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে— তাহলি এখন এর বিহিত কত্তি হবে আপনারে। মোদের কথা বাদ দ্যান. মোরা চকিও দেখিনে. কানেও শুনিনে। যা হয় কর আপনি।

নীলমণি বললেন—কিন্তু বড্ড গুরুতর ব্যাপার। ষড়ঙ্গ মাতৃসাধন করতি হবে কিনা। আজ কি বার ? রও। শুকুর. শনি, রবিবারে হোলো দ্বিতীয়ে : শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ে। ঠিক হয়ে গিয়েচে—দাঁড়াও ভেবে দেখি—

নীলমণির মুখখানা যেন এক জটিল সমস্যার সমাধানে চিন্তাকুল হয়ে পড়লো। তাঁকে নিরুপদ্রব চিন্তার অবকাশ দেওয়ার জন্যে দুজনে চুপ করে রইল, মামা ও ভাগ্নে।

অল্পক্ষণ পরে নীলমণির মুখ উজ্জ্বল দেখালো। বললেন—হয়েচে। খোকা কোথায় ?

—কি খুড়োমশাই ?

—কিছু বলবো না। খোকার কপালে ঠেকিয়ে দুটো মাসকলাই আমারে দাও দিকি ?

হারু দৌড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে দুটি মাসকলাইয়ের দানা নিয়ে এসে নীলমণির হাতে দিল। সে-দুটি হাতে নিয়ে নীলমণি প্রস্থানোদ্যত হলেন। হারু ও নারাণ ডেকে বললে—সে কি! চললেন যে ?

—এখন যাই। বুধবার অষ্টোত্তরী দশা। ষড়ঙ্গ হোম করতি হবে এই মাসকলাই দিয়ে। নিঃশ্বেস ফ্যালবার সময় নেই।

—খুড়োমশাই, দাঁড়ান। দু'কাঠা সোনামুগ নিয়ে যাবেন না বাড়ির জন্যি ?

—সময় নেই বাবা। এখন হবে না। কাল সকালে আগে মাদুলি নিয়ে আসি, তারপর অন্য কথা।

পথে নেমে নীলমণি সমাদ্দার হনহন ক'রে পথ চলতে লাগলেন। মাছ গেঁথে ফেলেচেন; এই করেই তিনি সংসার চালিয়ে এসেচেন। আজ এ-গাঁয়ে, কাল ও-গাঁয়ে। তবে সব জলে ডাল সমান গলে না। গাঁয়ের ধারের রাস্তায় দেখলেন তাঁদের গ্রামের ক্ষেত্র ঘোষ এক ঝুড়ি বেগুন মাথায় নিয়ে বেগুনের ক্ষেত থেকে ফিরচে। রাস্তাতে তাঁকে পেয়ে ক্ষেত্র বেগুনের বোঝা নামিয়ে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে—বড্ড খরগোশের উপদ্রব হয়েচে—বেগুনে জালি যদি পড়েচে তবে ছাখো আর নেই। দু'বিঘে জমিতে মোট এই দশ গণ্ডা বেগুন। এ রকম হলি কি করে চলে! একটা কিছু করে ছান দিনি—আপনাদের কাছে যাবো ভেবেলাম।

নীলমণি বললেন—তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটা হত্তুকি নিয়ে আমার

বাড়ি যাবা আজ রাত্তির দু'দণ্ডর সময়। আজ অমাবস্যে, ভালোই হোলো।

—বেশ যাবানি। হ্যাদে, দুটো বেগুন নিয়ে যাবা?

—তুমি যখন যাবা, তখন নিয়ে যেও। বেগুন আর আমি বইতি পারবো না।

বাড়ির ভেতরে ঢুকবার আগে কাদের গলার শব্দ পেলেন বাড়ির মধ্যে। কে কথা বলে? উঁহু, বাড়ির মধ্যে কেউ তো যাবে না।

বাড়ি ঢুকতেই ওঁর পুত্রবধূ ছুটে এল দোরের কাছে। বললে—বাবা—

—কি? বাড়িতি কারা কথা বলচে বৌমা?

—চুপ, চুপ। সরোজিনী পিসি এসেচে ভাঁড়ারকোলা থেকে তার জামাই আর মেয়ে নিয়ে। সঙ্গে দুটো ছোট নাতনী। মা বলে দিলেন চাল বাড়ন্ত যা হয় করুন।

—আচ্ছা, বলগে সব ঠিক হয়ে যাচ্চে। ওদের একটু জলপান দেওয়া হয়েচে?

—কি দিয়ে জলপান দেওয়া হবে? কি আছে ঘরে?

তাই তো! আচ্ছা, দেখি আমি।

নীলমণি সমাদ্দার বাড়ির বাইরের আমতলায় এসে অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কি করা যায় এখন? সরোজিনীরও (তাঁর মাসতুতো বোন) কি আর আসবার সময় ছিল না। আর আমার দরকারই বা কি বাপু? দুটো হাত পেতেছে। যত সব আপদ। কখনো একবার উদ্দেশ নেয় না একটা লোক পাঠিয়ে—আজ মায়া একেবারে উথলে উঠলো

একটু পরেই ক্ষেত্র ঘোষ এসে হাজির হলো। তার হাতে গণ্ডা পাঁচেক বেগুন দড়িতে ঝোলানো, একছড়া পাকা কলা আর একঘটি খেজুরের গুড়। তাঁর হাতে সেগুলো দিয়ে ক্ষেত্র বললে—মোর নিজির গাছের গুড়। বড় ছেলে জ্বাল দিয়ে তৈরি করেচে। সেবা করবেন। আর সেই দুটো চক্কি। বলেলেন আনতি। তাও এনিচি।

—তা তো হোলো, আপাতোক ক্ষেত্তোর কাঠাদুই চাল বড্ড দরকার যে। বাড়িতি কুটুম্ব এসে পড়েচেন অথচ আমার ছেলে বাড়ি নেই, কাল

আসবার সময় চাল কিনে আনবে দু মণ কথা আছে। এখন কি করি?

—তার আর কি? মুই এখনি এনে দিচ্চি।

চালের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্ষেত্র ঘোষ চাষী গৃহস্থ, তার সংসারে কোনো জিনিসের অভাব নেই। তখুনি সে দু'কাঠা চাল নিয়ে এসে পৌঁছে দিলে ও নীলমণি সমাদ্দারের হাতে হর্তুকি দুটোও দিলে। নীলমণি হর্তুকি নিয়ে ও চাল নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। বাইরে আসতে আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে সেই হর্তুকি দুটো ক্ষেত্র ঘোষের হাতে দিয়ে বললেন—যাও, এই হর্তুকি দুটো বেগুন ক্ষেতের পূবদিকের বেড়ার গায়ে কালো সূতো দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দেবা। ব্যস্! মন্তর দিয়ে শোধন করে দেলাম। খরগোশের বাবা আসবে না।

পরদিন সকালে কানসোনা গেলেন। একটি পুরোনো মাদুলী পত্রবধ্ খুঁজেপেতে কোথা থেকে দিয়েচে, উনি সেটা জিউলি গাছের আঠা আর ধুলো দিয়ে ভর্তি ক'রে নিয়েচেন। একটু সিঁদুর চেয়ে নিয়েচেন বাড়ি থেকে। পথে একটা বেলগাচ থেকে বেলপাতা পেড়ে সিঁদুর মাখালেন বেশ ক'রে।

হারু ও নারাণ উদ্বিগ্নভাবে তাঁরই অপেক্ষায় আছে। হারুর তো রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি বললে।

নারাণ সর্দার বললে—তবু তো বাড়ির মধ্যি বলতি বারণ করেলাম। মেয়েমানুষ সব, কেঁদেকেটে অনত্থ বাধাবে।

নীলমণি সমাদ্দার সিঁদুরমাখানো বেলপাতা আর মাদুলী ওর হাতে দিয়ে বললেন—তুমি গিয়ে তোলে খোকার দাদু। তুমি গিয়ে তার গলায় মাদুলী পরিয়ে দেবা আর এই বেলপাতা ছেঁচে রস খাইয়ে দেবা। কাল সারারাত জেগে ষড়ঙ্গ হোম করি নি? বলি, না, ঘুম অনেক ঘুমোবো। হারু আমার ছেলের মত। তার উপকারডা আগে করি বড্ড শক্ত কাজ বাবা। এখন নিয়ে যাও, ধরে ছোঁবে না। আমার নিজেরও একটা দুভাবনা গেল। বাবাঃ—

এরপর কি হোলো তা অনুমান করা শক্ত নয়। হারুর কৃষাণ গুপে বাগদি এক ধামা আউশ চাল আর দু'কাঠা সোনা মুগ মাথায় করে বয়ে দিয়ে এল

নীলমণি সমাদ্দারের বাড়ি।

নীলমণির সংসার এই রকমেই চলে।

গয়ামেম সকালে সামনের উঠোনে ঘুঁটে দিচ্ছিল, এমন সময়ে দূরে প্রসন্ন আমীনকে আসতে দেখে গোবরের ঝুড়ি ফেলে কাপড় ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রসন্ন চক্কত্তি কাছে এসে বললে, কি হচ্চে? বলে দিইচি না, এসব কোরো না গয়া। আমার দেখলি কষ্ট হয়। রাজরাণী কিনা আজ ঘুঁটেকুড়ুনি!

গয়া হেসে বললে—যা চিরডা কাল করতি হবে, তা যত সত্বর আরম্ভ হয় ততই ভালো।

—আহা! আজ তোমার মাও যদি থাকতো বেঁচে। হঠাৎ মারা গেল কিনা। মরবার বয়েস আজও তা'বলে হই নি ওর।

—সবই অদেষ্ট খুড়োমশাই। তা নলি—

গয়ামেম বিষন্ন মুখে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

প্রসন্ন চক্কত্তি ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। দুখানা খড়ের ঘর, একখানাতে সাবেক আমলে রান্না হতো—হুঁশিয়ার বরদা বাগ্‌দিনী মেয়ের কুঠিতে খুব পসার-প্রতিপত্তির অবসরে রান্নাঘরখানাকে বড় করে দাঁড় করায়—কাঁঠাল-কাঠের দরজা, চৌকাঠ, জানালা বসিয়ে। এইখানাতেই এখন গয়ামেম বাস করে মনে হোলো, কারণ জানালা দিয়ে তক্তপোশের ওপর বিছানা দেখা যাচ্চে। কিন্তু অন্য ঘরখানার অবস্থা খুব খারাপ, চালের খড় উড়ে গিয়েচে, ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেচে দাওয়ায়, গোবর দিয়ে নিকোনো হয় নি। দেওয়ালে কাটল ধরেচে।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—ঘরখানার এ অবস্থা কি করে হোলো?

—কি অবস্থা?

—পড়ে যায়-যায় হয়েচে!

—গেল, গেল। একা নোক আমি, ক'খানা ঘরে থাকবো?

প্রসন্ন চক্কত্তি কতকটা যেন আপন মনেই বললে—সায়েব-টায়েব কি জানো, ওরা হাজার হোক ভিন্‌দেশের—আমার সুখদুক্‌খু ওরা কি বা বোঝবে? তোমারও ভুল, কেন কিছু চাইলে না সেই সময়ডা? তুমি তো সব সময় শিওরে বসে থাকতে—কিছু হাত ক'রে নিতি হয়।

গয়ামেম চুপ করে রইল, বোধ হোল ওর চোখের জল চিক চিক করচে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললে—নাঃ, তোমার মত নির্বোধ মেয়ে গয়া আজকালকারের দিনি—ঝাঁট্টা মারো:।—একথা বলবার, এবং এত ঝাঁজের সঙ্গে বলবার হেতুও হচ্চে গয়ামেমের ওপর প্রসন্ন চক্কত্তির আন্তরিক দম। গয়ার চেয়ে সেটুকু কেউ বেশি বোঝে না, চুপ করে থাকা ছাড়া তার আর কি করবার ছিল?

এমন সময় ভগীরথ বাগ্‌দীর মা কোথা থেকে উঠোনে পা দিয়ে বললে—আমীনবাবু না? এসো বোসো। আপনার কথা আমি সব শুনলাম দাঁড়িয়ে। ঠিক কথা বলেচ। গয়ারে দু'বেলা বলি, বড় সায়েব তো তোরে মেম বানিয়ে দিয়ে গেল, সবাই বললে গয়ামেম—মেমের মতো সম্পত্তি কি দিয়ে গেল তোরে? মাডা মরে গেল, ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই—হাতে একটা কানাকড়ি নেই, কুঠির সেই জমিটুকু ভরসা। আর বছর দুটো ধান হয়েচে, তবে এখন খেয়ে বাঁচছ, নয়তো উপোস করতি হোতো না আজ? ইদিকি বাগ্‌দিদের সমাজে তুই অচল। তোরে নিয়ে কেউ খাবে না। তুই এখুন যাবি কোথায়? ছেলেবেলায় কোলেপিঠে করিচি তোদের, কষ্ট হয়। মা নেই আর তোরে বলবে কে? সে মাগী সুদ্দু মনের দুঃখি মরে গেল। আমারে বলতো, দিদি, মেয়েডার যদি একটু জ্ঞানগম্যি থাকতো, তবে মোদের ঘরে আজ ও তো রাজরাণী। তা না শুধু হাতে ফিরে আলেন নীলকুঠি থেকে—

গয়া যুগপৎ খোঁচা খেয়ে একটু মরীয়া হয়েও উঠলো। বললে, আমি খাই না খাই তাতে তোমাদের কি? বেশ করিচি আমি, যা ভালো বুঝিচি করিচি—

ভগীরথের মা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হোলো, যাবার সময়ে বললে—মনডা পোড়ে, তাই বলি। তুই হলি চেরকালের একগুঁয়ে আপদ, তোরে

আর আমি জানি নে ? যখন সায়েবের ঘরে জাত খোয়ালি সেই সঙ্গে একটা ব্যবস্থাও করে নে। ওর মা কি সোজা কান্না কেঁদেচে এই একটা বছর। তোর হাতের জল পজ্জন্ত কেউ খাবে না পাড়ায়. তুই অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে এক ঘটি জল তোরে কেডা দেবে এগিয়ে ? আপনি বিবেচনা করে দ্যাখো আমীনবাবু—নীলকুঠি তো হয়ে গেল অপর লোকের, সায়েব তো পটল তুললো, এখন তোর উপায় !

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—জমিটুকু যাই করে দিইছিলাম, তবুও মাথা রক্ষে। নয়তো আজ দাঁড়াবার জায়গা থাকতো না। তাও তো ভাগ দিয়ে পাচ বিঘে জমির ধান মোটে পাবে।

ভগীরথের মা বললে—ভাগের ধান আদায় করাও হ্যাংনামা কম বাবু ? সে ওর কাজ ? ও যে মেমসায়েব কিনা ? ফাঁকি দিয়ে নিলি ছেলেমানুষ তুই কি করবি শুনি ?

ভগীরথের মা চলে গেল। গয়ামেম প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে তাকিয়ে বললে—খুড়োমশাই কি ঝগড়া করতি এ্যালেন ? বসবেন, না যাবেন ?

—না, ঝগড়া করবো কেন ? মনডা বড্ড কেমন করে তোমাকে দেখে, তাই আসি—

গয়ামেম সাবেক দিনের মত হাসতে লাগলো মুখে কাপড় দিয়ে। প্রসন্ন চক্কত্তি দেখলে ওর আগের সে চেহারা আর নেই- সে নিটোল সৌন্দর্য নেই, দুঃখে কষ্টে অন্যরকম হয়ে গিয়েচে যেন। তবুও জমিটা সে দিতে পেরেছিল যে নিজের হাতে মেপে, মস্ত বড একটা কাজ হয়েচে। নইলে না খেয়ে মরতো আজ।

প্রসন্ন চক্কত্তি বসলো গয়ার দেওয়া বেদে চেটায়ে অর্থাৎ খেজুর পাতার তৈরী চেটায়।

—কি খাবেন ?

—সে আবার কি ?

—কেন খুড়োমশাই, ছোট জাত বলে দিতি পারি নি খেতি ? কলা আছে, পেঁপে আছে—কেটেও দেবো না। আপনি কেটে নেবেন। সকালবেলা আমার

বাড়ি এসে শুধুমুখে যাবেন ?

সত্যিই গয়া তুটো বড় বড় পাকা কলা, একটা আস্ত পেঁপে, আধখানা নারকোল নিয়ে এসে রাখলে প্রসন্ন আমীনের সামনে। হেসে বললে—জলডা আর দিতি পারবো না খুড়োমশাই।

তারপরে ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হয়ে বললে—দাঁড়ান, আর একটা জিনিস দেখাই—

—কি ?

—আনচি, বসুন।

খানিক পরে ঘর থেকে একখানা ছোট ছাপানো বই হাতে নিয়ে এসে প্রসন্ন আমীনের সামনে দিয়ে বললে—দেখুন। দাঁড়ান, ও কি ? একখানা দা নিয়ে আসি, বেশ করে ধুয়ে দিচ্চি। ফল খান।

—শোনো শোনো। এ বই কোথায় পেলে ? তোমার ঘরে বই ? কি বই এখানা ?

—দেখুন। আমি কি লেখাপড়া জানি ?

—সেই কবিরাজ বুড়ো দিয়েচে বুঝি ? পড়তে জানো না, বই দিলে কেন ?

—দেলে, নিয়ে এলাম। কৃষ্ণের শতনাম।

প্রসন্ন আমীন বিস্মিত হয়ে গেল দস্তুরমত। গয়ামেমের বাড়ি ছাপানো বই, তাও নাকি কৃষ্ণের শতনাম!···নাঃ!

বসে বসে ফলগুলো সে খেলে দা দিয়ে কেটে। আধখানা পেঁপে গয়ার জন্যে রেখে দিলে। হেসে বললে—এখানডায় আসতি ভালো লাগে। তোমার কাছে এলি সব দুক্‌খু ভুলে যাই, গয়া।

—ওই সব বাজে কথা আবার বকতি শুরু করলেন! আসবেন তো আসবেন। আমি কি আসতি বারণ করিচি ?

—তাই বলো। প্রাণডা ঠাণ্ডা হোক।

—ভালো। হলেই ভালো।

—কৃষ্ণের শতনাম বই কি করবে ?

—মাথার কাছে রেখে শুই। বাড়িতি কেউ নেই। মা থাকলি কথা ছিল না। ভূতপ্রেত অবদেবতার ভয় কেটে যায়। একা থাকি ঘরে।

—তা ঠিক।

—ইদিকি পাড়াসুদ্দ, শত্তুর। কুঠির সায়েব বেঁচে থাকতি সবাই খোশামোদ করতো, এখন রাতবিরাতে ডাকলি কেউ আসবে না, তাই ঐ বইখানা দিয়েচেন বাবা, কাছে রেখে শুলি ভয়ভীত থাকবে না বলি দিয়েছেন। বড্ড ভাল লোক।...আজ ধান ভানতি না গেলি খাওয়া হবে না, চাল নেই। তাও কেউ ঢেঁকি দেয় না এ পাড়ায়। ওপাড়ায় কেনারাম সর্দারের বাড়ি যাব ধান ভানতি। তারা ভালো। জাতে বুনো বটে, কিন্তু তাদের মধ্যি মানুষেতো আছে খুড়োমশাই।

প্রসন্ন চক্কত্তি সেদিন উঠে এল একটু বেশি বেলায়। তার মনে বড় কষ্ট হয়েছে গয়াকে দেখে। একটা মাদার গাছতলায় বসলো খানিকক্ষণ গণেশপুরের মাঠে। গণেশপুর হোলো গয়ামেমদের গ্রামের নাম, শুধুই বাগ্‌দী আর ক'ঘর জেলে ছাড়া এ গ্রামে অন্য জাতের বাসিন্দা কেউ নেই। রোদ বড্ড চড়েচে! তবু বেশ ছায়া গাছটার তলায়।

প্রসন্ন ভাবলে বসে বসে—গয়া বড্ড বেকায়দায় পড়ে গিয়েচে। আজ যদি আমার হাতে পয়সা থাকতো, তবে ওরে অমনধারা থাকতি দেতাম? যেদিকি চোখ যায় বেরোতাম দুজনে। সে সাহস আর করতি পারিনে, বয়েসও হয়েচে, ঘরে ভাত নেই।

গাছটায় মাদার পেকেচে নাকি?...

প্রসন্ন মুখ উঁচু করে তাকিয়ে দেখলে। না, পাকে নি।

বিকেলের দিকে ভবানী ভাগবত পাঠ করে উঠলেন। তিনি জানেন, ভাগবত অতি দুরূহ ও দুরবগাহ গ্রন্থ। যেমন এর চমৎকার কবিত্ব, তেমনি অপূর্ব এর তত্ত্ব। অনেকক্ষণ ভাগবত পাঠ করে পুঁথি বাঁধবার সময় দেখলেন ওপাড়ার নিস্তারিণী এসে উঠানে পা দিলে। নিস্তারিণী আজকাল ভবানীর

সঙ্গে কথা বলে। অবশ্য এই বাড়ির মধ্যেই, বাইরে কোথাও নয়

নিস্তারিণী কাছে এসে বললে—ও ঠাকুরজামাই ?

—এস বৌমা। ভালো ?

—যেমন আশীর্ব্বাদ করেচেন। একটা কথা বলতে এইলাম।

—কি বলো ?

—বুড়ো কবিরাজমশাইয়ের বাড়ি ধম্ম-কথা হয়, গান হয়, আমি যেতি পারি ? আমার বড্ড ইচ্ছে করে।

—না বৌমা। সে হোলো গাঁয়ের বাইরে মাঠে। সেখানে কেউ যায় না।

—আচ্ছা, দিদি গেলি ?

—তোমার দিদি যায় না তো।

—যদি আমি তার ব্যবস্থা করি ?

—সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে ?

—আমার ভালো লাগে। দুটো ভালো কথা কেউ বলে না এ গাঁয়ে, তবুও একটু গান হয়, ভালো বই পড়া হয়, আমার বড্ড ভালো লাগে।

—তোমার শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ী কি তোমার স্বামীর মত নিয়েচ ?

—উনি মত দেবেন। মা মত দেন কি না দেন। বুড়ী বড় ঝান্থ। না দিলে তো বয়েই গেল, আমি যাবো ঠিক।

—ছিঃ, ওই তো তোম. . দোষ বৌমা! অমন করতে নেই।

—আপনার মুখে শাস্তর পাঠ শুনবার বড্ড ইচ্ছে আমার।

পরে একটু অভিমানের সুরে বললে -তা তো আপনি চান না, সে আমি জানি।

—কি জানো ?

—আপনি পছন্দ করেন না যে আমি সেখানে যাই।

—সে কথা আবার কি করে তুমি জানলে ?

—আমি জানি।

—আচ্ছা, তোমার দিদি যদি কখনো যায় তবে যেও।

—যা মন যায় তা করা কি খারাপ ?

প্রশ্নটি বড় অদ্ভুত লাগলো ভবানীর। বললেন—তোমার বয়েস হয়েচে বৌমা, খুব ছেলেমানুষ নও, তুমিই বোঝো, যা ভাবা যায় তা কি করা উচিত? খারাপ কাজও তো করতে পারো।

—পাপ হয়?

—হয়।

—তবে আর করবো না, আপনি যখন বলচেন তখন সেটাই ঠিক।

—তুমি বুদ্ধিমতী, আমি কী তোমাকে বলবো!

—আপনি যা বলবেন, আমার কাছে তাই খুব বড় ঠাকুরজামাই। আমি অন্ধ পথে পা দিতি দিতি চলে এ্যালাম শুধু দিদি আর আপনার পরামর্শে। আপনি যা বলবেন, আমার দুঃখু হলিও তাই করতি হবে, সুখ হলিও তাই করতি হবে, আমার গুরু আপনি।

—আমি কারো গুরু-ফুরু নই বৌমা। ওসব বাজে কথা।

—আপনি দো-ভাজা চিঁড়ে খাবেন নারকেলকোরা দিয়ে? কাল এনে দেবো। নতুন চিঁড়ে কুটিচি।

—এনো বৌমা।

এই সময়ে খোকা খেলা করে বাড়ি ফিরে এল। মাকে বললে—মা নদীতে যাবে না?

ওর মা বললে—তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—কপাটি খেলছিলাম হাবুদের বাড়ি। চলো যাই। আমি ছুটে এলাম সেই জন্যি। এসে ইংরিজি পড়বো। পড়তি শিখে গিইচি।

প্রায়ই সন্ধ্যার আগে ভবানী তুই স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে নদীর ঘাটে যান। সকলেই সাঁতার দেয়, গা হাত পা ধোয়। তারপর ভগবানের উপাসনা করে। খোকা এই নদীতে গিয়ে স্নান ও উপাসনা এত ভালোবাসে, যে প্রতি বিকেলে মাদের ও বাবাকে ও-ই নিয়ে যায় তাগাদা দিয়ে। আজও সে গেল ওঁদের নিয়ে, উপরন্তু গেল নিস্তারিণী। সে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লো, তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

ভবানী নিয়ে যেতে চান না বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে, তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। ভগবানের উপাসনা এক হয় নিভৃতে, নতুবা হয় সমধর্মী মানুষদের সঙ্গে। তিলু বিশেষ করে তাঁকে অনুরোধ করলে নিস্তারিণীর জন্যে।

সকলে স্নান শেষ করলে। শেষ সূর্যের রাঙা আলো পড়েচে ওপারের কাশবনে, সাঁইবাবলা ঝোপের মাথায়, জলচর পক্ষীরা ডানায় রক্ত-সূর্যের শেষ আলোর আবির মাখিয়ে পশ্চিমদিকের কোনো বিল-বাঁওড়ের দিকে চলেচে—সম্ভবতঃ নাকাশিপাড়ার নিচে সামটার বিলের উদ্দেশে।

ভবানী বললেন—বৌমা, এদের দেখাদেখি হাত জোড় কর—তারপর মনে মনে বা মুখে বলো—কিংবা শুধু শুনে যাও।

ওঁ যো দেবা অগ্নৌ যো অপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ।
যঃ ওষধিষু যো বনস্পতিষু, দেবায় তস্মৈ নমোনমঃ।

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে
যিনি শোভনীয় ক্ষিতিতলেতে
যিনি তৃণতরু ফুলফলেতে
তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে যিনি বাহিরে
যিনি যে দিকে যখন চাহিরে
তাঁহারে নমস্কার।

খোকাও তার মা-বাবার সঙ্গে সুললিত কণ্ঠে এই মন্ত্রটি গাইলে।

তারপর ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—খোকা, এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেচে?

খোকা নামতার অঙ্ক মুখস্থ বলবার সুরে বললে—ভগবান।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—সব জায়গায়, বাবা।

—আকাশেও?

—সব জায়গায়।

—কথা বলেন?

—হ্যাঁ বাবা।

—তোমার সঙ্গেও বলবেন ?

—হ্যাঁ বাবা, আমি চাইলে তিনিও চান। আজ্ঞি ছাড়া নন তিনি।

এসব কথা অবিশ্যি ভবানীই শিখিয়েচেন ছেলেকে।

ছেলেকে বিশেষ কোনো বিত্ত তিনি দিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর বয়েস হয়েচে, এই ছেলেকে নাবালক রেখেই তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মহাপ্রস্থানের পথে। কি জিনিস তিনি দিয়ে যাবেন একে—আজকার অবোধ বালক তার উত্তরজীবনের জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে একদিন পিতৃদত্ত যে সম্পদকে মহামূল্য বলে ভাবতে শিখবে, চিনতে শিখবে, বুঝতে শিখবে ?

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ।

এর চেয়ে অন্য কোনো বেশি মূল্যবান সম্পদের কথা তাঁর জানা নেই।

খুব বেশি বুদ্ধির প্যাঁচের দরকার হয় না, সহজ পথে সহজ হয়েই সেই সহজের কাছে পৌঁছানো যায়। দিনের পর দিন এই ইছামতীর তীরে বসে এই সত্যই তিনি উপলব্ধি করেচেন। সন্ধ্যায় ওই কাশবনে, সাঁইবাবলার ডালপালায় রাঙা ঝোপটি ম্লান হয়ে যেতো, প্রথম তারাটি দেখা দিত তাঁর মাথার ওপরকার আকাশে, ঘুঘু ডাকতো দূরের বাঁশবনে, বনসিমফুলের সুগন্ধ ভেসে আসতো বাতাসে—তখনই এই নদীতটে বসে কতদিন তিনি আনন্দ ও অনুভূতির পথ দিয়ে এসে তাঁর মনের গহন গভীরে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন এই সত্যকে—এই চির পুরাতন অথচ চির নবীন সত্যকে। বুঝেচেন এই সত্যটি যে, ভগবানের আসল তত্ত্ব শুধু স্বরূপে সীমাবদ্ধ নয়, স্বরূপ ও লীলাবিলাস দুটো মিলিয়ে ভগবত্তত্ত্ব। কোনোটা ছেড়ে কোনোটা পূর্ণ নয়। এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত জিনিস। সে থেকে পৃথক নয়—সেই মহা-একের অংশ মাত্র।

নিস্তারিণী খুব মুগ্ধ হোলো। তার মধ্যে জিনিস আছে। কিন্তু গৃহস্থঘরের বৌ, শুধু রাঁধা-খাওয়া, ঘরসংসার নিয়েই আছে। কোনো একটু ভালো কথা কখনো শোনে না। এমন ধরনের ব্যাপার সে কখনো দেখে নি। তিলুকে বললে —দিদি, আমি আসতে পারি ?

—কেন, পারবি নে?

—ঠাকুরজামাই আসতে দেবেন?

—না, তোকে মারবে এখন।

—আমার বড্ড ভালো লাগলো আজ। কে এসব কথা এখানে শোনাবে দিদি? আমার জন্যে শুধু ঝ্যাঁটা আর লাথি। শুধু শাশুড়ীর গালাগাল দু'বেলা। তাও কি পেট ভরে দুটো খেতি পাই? হ্যাঁ পাপ করিচি, স্বীকার করচি। তখন বুদ্ধি ছিল না। যা করিচি, তার জন্যি ভগবানের কাছে বলি, আমারে আপনি যা শাস্তি হয় দেবেন।

—থাক ওসব কথা। তুই রোজ আসবি যখন ভালো লাগবে।

—ঠাকুরজামাই দেবতার তুল্য মানুষ। এ দিগরে অমন মানুষ নেই। আমার বড্ড সৌভাগ্যি যে তোমাদের সঙ্গ প্যালাম। ঠাকুরজামাইকে একদিন নেমতন্ন করে খাওয়াতি বড্ড ইচ্ছে করে।

—তা খাওয়াবি, ওর আর কি?

—আমার যে বাড়ি সে রকম না। জানোই তো সব। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু তরকারি নিয়ে আসি—কেউ জানতি পারে না। জানলি কত কথা উঠবে।

—আমাকে কি নিলুকে সেই সঙ্গে নেমতন্ন করিস, কোনো কথা উঠবে না।

ওরা ঘাটের ওপর উঠেচে, এমন সময়ে দেখা গেল সেই পথ বেয়ে রামকানাই কবিরাজ এদিকে আসচেন। রামকানাই ভিন্ গাঁ থেকে রোগী দেখে ফিরচেন, খালি পা, হাঁটু অবধি ধুলো, হাতে একটা জড়িবুটি-ওষুধের পুঁটুলি। তিলু পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে, দেখাদেখি নিস্তারিণীও করলে। রামকানাই সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—ওকি, ওকি দিদি? ও সব কোরো না। আমার বড্ড লজ্জা করে। চলো সবাই আমার কুঁড়েতে। আজ যখন বাঁড়ুয্যে মশাইকে পেইচি তখন সন্দেটা কাটবে ভালো।

রামকানাই চক্রবর্তী থাকেন চরপাড়ায় এই গ্রামের উত্তর দিকের বড় মাঠ পার হলেই চরপাড়ার মাঠ। তিলু নিস্তারিণীকে বললে—তুই ফিরে যা বাড়ি—আমরা যাচ্ছি চরপাড়ার মাঠে—

—আমিও যাবো।

—তোর বাড়িতে কেউ বকবে না?

—বকলে তো বয়েই গেল। আমি যাবো ঠিক।

—চলো। ফিরতি কিন্তু অনেক রাত হবে বলে দিচ্ছি।

—তোমাদের সঙ্গে গেলি কেউ কিছু বলবে না। বললিও আমার তাতে কলা। ওসব মানিনে আমি।

অগত্যা ওকে সঙ্গে নিতেই হোলো। রামকানাইয়ের বাড়ি পৌঁছে সবাই মাদুর পেতে বসলো। রামকানাই রেড়ির তেলের দোতলা পিদিম জ্বালালেন। তারপর হাত-পা ধুয়ে এসে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করলেন। ওদের বললেন—একটু কিছু খেতি হবে—কিছুই নেই, দুটো চালভাজা। মা লক্ষ্মীরা মেখে নেবে না, আমি দেবো?

সামান্য জলযোগ শেষ হোলে রামকানাই নিজে চৈতন্যচরিতামৃত পড়লেন এক অধ্যায়। গীতাপাঠ করলেন ভবানী। একখানা হাতের লেখা পুঁথি জলচৌকির ওপর সযত্নে রক্ষিত দেখে ভবানী বললেন—ওটা কিসের পুঁথি? ভাগবত?

—না, ওখানা মাধবনিদান। আমার গুরুদেবের নিজের হাতে নকল-করা পুঁথি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রডা যে জানতি চায়, তাকে মাধবনিদান আগে পড়তি হবে। বিজয় রক্ষিত কৃত টীকাসমেত পুঁথি ওখানা। বিজয় রক্ষিতের টীকা দুষ্প্রাপ্য। আমার ছাত্র নিমাইকে পড়াই। সে ক'দিন আসচে না, জ্বর হয়েচে।

পুঁথিখানা রামকানাই ভবানীর সামনে মেলে ধরলেন। মুক্তোর মত হাতের লেখা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার তুলট কাগজের পাতায় এখনো যেন জলজল করচে। পুঁথির শেষের দিকে সেকেলে শ্যামাসঙ্গীত। এগুলি বোধ হয় গুরুদেব ৺মহানন্দ কবিরাজ স্বয়ং লিখেছিলেন। ভবানীর অনুরোধে তা থেকে একটা গান গাইলেন রামকানাই খুব খারাপ গলায়—

ন্যাংটা মেয়ের এত আদর জটে ব্যাটা তো বাড়ালে
নইলে কি আর এত করে ডেকে মরি জয় কালী বলে।

তারপর ভবানীও গাইলেন একখানা কবি দাশরথি রায়ের বিখ্যাত গান :—

শ্রীচরণে ভার একবার গা তোলো হে অনন্ত।

রামকানাই কবিরাজের বড় ভালো লাগলো গান শুনে। চোখ বুজে বললেন—আহা কি অনুপ্রাস! উঠে বার ভুবন জীবন, এ পাপ জীবনের জীবনান্ত. আহা-হা!

উৎসাহ পেয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে দিয়ে আর একখানা গান গাওয়ালেন দাশরথি রায় কবির:—

'ধনি আমি কেবল নিদানে'

তিলুর গলা মন্দ নয়। রামকানাই কবিরাজ বললেন—আজ্ঞে চমৎকার লিখচে দাশরথি রায়। কোথায় বাড়ি এঁর? না, এমন অনুপ্রাস, এমন ভাষা কখনো শুনি নি—বা: বা:

ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্মুখ
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।

আমাকে লিখে দেবেন গানটা? ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকলে এমন লেখা যায় না—আহা-হা!

ভবানী বললেন—বাড়ি বর্ধমানের কাছে কোথায়। ও বছর পাঁচালী গাইতে এসেছিলেন উলোতে বাবুদের বাড়ি। এ গান আমি সেখানে শুনি। খোকার মাকে আমি শিখিয়েচি।

আর দু-একখানা গানের পর আসর ভেঙে দিয়ে সকলে জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে পাঁচপোতা গ্রামের দিকে রওনা হোলো। চরপাড়ার বড় মাঠটা জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েচে, খালের জল চকচক করচে চাঁদের নিচে। ভবানী বাঁড়ুয্যে খালটা দেখিয়ে বললেন—ওই হ্যাখো তিলু, তোমার দাদা যখন নীলকুঠির দেওয়ান তখন এই খালের বাঁধাল নিয়ে দাঙ্গা হয়, তাতে মানুষ খুন করে নীলকুঠির লেঠেলরা। সেই নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয় সেবার।

হঠাৎ একটা লোককে মাঠের মধ্যে দিয়ে জোরে হেঁটে আসতে দেখে

নিস্তারিণী বলে উঠলো—ও দিদি, কে আসচে ত্থাখো—

ভবানী বললেন—বড্ড নির্জন জায়গাটা। দাঁড়াও সবাই একটু—

লোকটার হাতে একখানা লাঠি। সে ওদের দিকে তাক করেই আসচে, এটা বেশ বোঝা গেল। সকলেরই ভয় হয়েচে তখন লোকটার গতিক দেখে। খুব কাছে এসে পড়েচে সে তখন, নিস্তারিণী বলে উঠলো—ও দিদি, খোকার হাত ধরো—ঠাকুরজামাই, এগোবেন না—

লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। পরক্ষণেই ওদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেই বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বলে উঠলো—এ কি! দিদিমণি? ঠাকুরমশায় যে! এই যে খোকা…

তিলুও ততক্ষণে লোকটাকে চিনেচে। বলে উঠলো—হলা দাদা? তুমি কোথেকে?

হলা পেকে কি যেন একটা ভাব গোপন করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে। ইতস্তত: করে বললে—ওই যাতিছেলাম চরপাড়ায়—মোর—এই—তো। দাঁড়ান সবাই। পায়ের ধুলো ত্থান একটুখানি।

হলা পেকের কিন্তু সে চেহারা নেই। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েচে কিছু কিছু, আগের তুলনায় বুড়ো হয়ে পড়েচে। তিলু বললে—এতকাল কোথায় ছিলে হলা দাদা? কতকাল দেখি নি!

হলা পেকে বললে—সরকারের জেলে।

—আবার জেলে কেন?

—হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ি ডাকাতি হয়েল, ফাঁড়ির দারোগা মোরে আর অঘোর মুচিকে ধরে নিয়ে গেল, বললে তোমরা করেচ।

—কর নি তুমি সে ডাকাতি? কর নি?

হলা পেকে চুপ করে রইল। তিলু ছাড়বার পাত্রী নয়, বললে—তুমি নির্দ্দোষী?

—না। করেলাম।

—অঘোর দাদা কোথায়?

—জেলে মরে গিয়েচে।

—একটা কথা বলবো ?

—কি ?

—আজ কি মনে করে লাঠি হাতে আমাদের দিকি আসছিলে এই মাঠের মধ্যি ? ঠিক কথা বলো ? যদি আমরা না হোতাম ?

হলা পেকে নিরুত্তর।

তিলু মোলায়েম স্বরে বললে—হলা দাদা—

—কি দিদি ?

—চলো আমাদের বাড়ি। এসো আমাদের সঙ্গে।

হলা পেকে যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—না, এখন আর যাবো না দিদি। তোমার পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই মুই। মরে গেলি মনে রাখবা তো দাদা বলে ?

খোকার কাছে এসে বললে—এই যে, ওমা, এসো আমার খোকা ঠাকুর, আমার চাঁদের ঠাকুর, আমার সোনার ঠাকুর, কত বড়ডা হয়েচে ? আর যে চিনা যায় না। বেঁচে থাকো, আহা, বেঁচে থাকো—নেকাপড়া শেখো বাবার মত—

খোকাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলে হলা পেকে। তারপর আর কোনো কিছু না বলে কারো দিকে না তাকিয়ে মাঠের দিকে হন্‌হন্ ক'রে যেতে যেতে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেল। খোকা বিস্ময়ের স্বরে বললে—ও কে বাবা ? আমি তো দেখি নি কখনো। আমায় আদর করলে কেন ?

নিস্তারিণীর বুক তখনো যেন ঢিপ ঢিপ করছিল। সে বুঝতে পেরেচে ব্যাপারটা। সবাই বুঝতে পেরেচে।

নিস্তারিণী বললে—বাবাঃ, যদি আমরা না হতাম। জনপ্রাণী নেই, মাঠের মধ্যি—

সকলে আবার রওনা হোলো বাড়ির দিকে। কাঠঠোকরা ডাকচে আম-জামের বনে। বনমরচের ঘন ঝোপে জোনাকি জ্বলচে। বড় শিমুল গাছটায় বাদুড়ের দল ডানা ঝটাপট করচে। দু'চারটে নক্ষত্র এখানে ওখানে দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে। ভবানী বাঁড়ুয্যে ভাবছিলেন আর একটা কথা।

এই হলা পেকে খারাপ লোক, খুন রাহাজানি ক'রে বেড়ায়, কিন্তু এর মধ্যেও সেই তিনি। এ কোন্ হলা পেকে? এরা খারাপ? নিস্তারিণী খারাপ? এদের বিচার কে করবে? কার আছে সে বিচারের অধিকার? এক মহারহস্যময় মহাচৈতন্যময় শক্তি সবার অলক্ষ্যে, সবার অজ্ঞাতসারে সকলকে চালনা করে নিয়ে চলেচেন। কিলিয়ে কাঁটাল পাকান না তিনি। যার যেটা সহজ স্বাভাবিক পথ, সেই পথেই তাকে অসীম দয়ায় চালনা ক'রে নিয়ে যাবেন সেই পরম কারুণিক মাতৃপিতৃরূপা মহাশক্তি। এই হলা পেকে, এই নিস্তারিণী, কাউকে তিনি অবহেলা করবেন না। সবাইকে তাঁর দরকার।

জন্মজন্মান্তরের অনন্ত পথহীন পথে অতি নীচ পাপীরও হাত ধরে অসীম ধৈর্যে অসীম মমতায় তিনি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন। তাঁর এই ছেলের প্রতি যে মমতা, তেমনি সেই মহাশক্তির মমতা সমুদয় জীবকুলের প্রতি। কি চমৎকার নির্ভরতার ভাব সেই মুহূর্তে ভবানী বাঁড়ুয্যে মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই মহাশক্তির ওপর। কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। মাভৈঃ। স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে—নেই কি তিনি সর্বত্র? নেই কোথায়?

দেওয়ান হরকালী সুর লালমোহন পালের গদিতে বসে বসে নীলকুঠির চাষ-কাজের হিসেব দিচ্ছিলেন। বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। লালমোহন পাল বললেন খাস খামারের হিসেবটা ওবেলা দেখলে হবে না দেওয়ানমশাই? বড্ড বেলা হোলো। আপনি খাবেন কোথায়?

—কুঠিতে।

—কে রাঁধবে?

—আমাদের নরহরি পেশ্কার। বেশ রাঁধে।

কথায় কথায় লালমোহন পাল বলেন,—ভালো কথা, আমার স্ত্রী আর ভগ্নী একদিন কুঠি দেখতে চাচ্চে, ওরা ওর ভেতর কখনো দেখে নি।

—যাবেন, কালই যাবেন। আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। কিসে যাবেন?

—গরুর গাড়িতি।

—কেন, কুঠির পাল্কী আছে, তাই পাঠাবো এখন।

আজ দু'বছর হোলো বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানী সাড়ে এগারো হাজার টাকায় তাদের কর্মকর্তা ইনিস্ সাহেবের মধ্যস্থতায় মোল্লাহাটির কুঠি লালমোহন পাল ও সতীশ সাধুখাঁর কাছে বিক্রি করে ফেলেচে। শিপ্‌টনের মৃত্যুর পরে ইনিস্ সাহেব এই দু'বছর কুঠি চালিয়েছিল, শেষে ইনিস্ সাহেবই রিপোর্ট করে দিলে এ কুঠি রাখা আর লাভজনক নয়। নীলকুঠির খাস জমি দেড়শো বিঘেতে আজকাল চাষ হয় এবং কুঠির প্রাঙ্গণের প্রায় তেরো বিঘে জমিতে আম, কাঁটাল, পেয়ারা প্রভৃতির চারা লাগানো হয়েচে। অর্থাৎ কৃষিকার্যই হচ্চে আজকাল প্রধান কাজ নীলকুঠির। চাষটা বজায় আছে এই পর্যন্ত। দেওয়ান হরকালী সুর এবং নরহরি পেশ্‌কার এই দুজন মাত্র আছেন পুরনো কর্মচারীদের মধ্যে, সব কাজ-কর্ম দেখাশুনো করেন। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন এবং অন্যান্য কর্মচারীর জবাব হয়ে গিয়েচে। নীলকুঠির বড় বড় বাংলা ঘর ক-খানার সবগুলিই আসবাবপত্র সমেত এখনো বজায় আছে। না রেখে উপায় নেই—ইণ্ডিগো কোম্পানী এগুলি সুদ্ধ বিক্রি করেচে এবং দামও ধরে নিয়েচে। অবিশ্যি জলের দামে বিক্রি হয়েচে সন্দেহ নেই। এ অজ পল্লীগ্রামে অত বড় কুঠিবাড়ি ও শৌখীন আসাবাবপত্রের ক্রেতা কে? গাড়ি করে বয়ে অন্যত্র নিয়ে যাবার খরচও কম নয়, তার হাঙ্গামাও যথেষ্ট। ইণ্ডিগো কোম্পানীর অবস্থা এদিকে টলমল, যা পাওয়া গেল তাই লাভ। ইনিস সাহেব কেবল যাবার সময় দুটো বড় আলমারি কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

দেওয়ান হরকালী সুর বাড়ি এসে বুঝিয়েছিলেন—খাসজমি আছে দেড়শো বিঘে, একশো বিয়াল্লিশ বিঘে ন' কাটা সাত ছটাক, ঐ দেড়শো বিঘেই ধরুন। ওটবন্দি জমা বন্দোবস্ত নেওয়া আছে সত্তর বিঘে। তা ছাড়া নওয়াদার বিল ইজারা নেওয়া হয়েছিল ম্যাকনিল্ সায়েবের আমলে নাটোর রাজাদের কাছ থেকে। মোটা জলকর। চোখ বুজে কুঠি কিনে নিন পাল মশায়, নীলকুঠি হিসেবে নয়, জমিদারি হিসেবে কিনে নিন, জমিদারি আমি দেখাশুনা করবো, আরও দু'একটি পুরনো কর্মচারী আপনাকে বজায় রাখতে হবে, আমরাই সব

চালাবো, আপনি লাভের কড়ি আমাদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন।

লালমোহন পাল বলেছিল—কুঠিবাড়ি আসবাবপত্তর সমেত ?

—বিলকুল।

—যান, নেবো।

এইভাবে কুঠি কেনা হয়। কেনার সময় ইনিস সাহেব একটু গোলমাল বাধিয়েছিল, ঘোড়ার গাড়ি দু'খানা ও দু'জোড়া ঘোড়া দেবে না। এ নিয়ে লালমোহন পালের দিক থেকে আপত্তি ওঠে, অবশেষে আর সামান্য কিছু বেশি দিতে হয়। কুঠি কেনার পরে রায়গঞ্জের গোসাঁইবাবুদের কাছে গাড়ি-ঘোড়াগুলো প্রায় হাজার টাকায় বিক্রি করে ফেলা হয়। খাসজমি ও জলকর ভালোভাবে দেখাশুনো করলে যে মোটা মুনাফা থাকবে, এটা দেওয়ান হরকালী বুঝেছিলেন। সামান্য জমিতে নীলের চাষও হয়।

কুঠি কেনার পরে তুলসী একদিন বলেছিল—দেওয়ানমশাইকে বলো না গো, সায়েবের ঘোড়ার টমটম গাড়ি আমাদের পাঠিয়ে দেবেন, একদিন চড়বো !

লালমোহন বলেছিলেন—না বড়বৌ। বড় সায়েব ঐ টম্‌টমে চড়ে বেড়াতো, তখন আমরা মোট মাথায় ছুটে পালাতাম ধানের ক্ষেতি। সেই টম্‌টমে তুমি চড়লি লোকে বলবে কি জানো ? বলবে ট্যাকা হয়েচে কিনা, তাই বড্ড অংখার হয়েচে। আমারেও একদিন দেওয়ান বলেছিলেন—টম্‌টম্ পাঠিয়ে দেবো, কুঠিতি আসবেন। আমি হাতজোড় ক'রে বলেলাম—মাপ করবেন। ওসব নবাবী করুক গিয়ে বাবুভেয়েরা। আমরা ব্যবসাদার জাত, ওসব করলি ব্যবসা ছিকেয় উঠবে।

অবশেষে একদিন একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে লালমোহনের বড় মেয়ে সরস্বতী, তার মা তুলসী, বোন ময়না ছেলেপিলে নিয়ে কুঠি দেখতে গেল। দেওয়ান হরকালী, প্রসন্ন আমীন ও নরহরি পেশ্‌কার এদের এগিয়ে নিয়ে এসে সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালো। সবাই নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো—

—ও দেওয়ান কাকা, এ ঘরটা কি ?

—এখানে সায়েবরা বসে খেতো, মা।

—এত বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন কেন?

—এখানে ওদের নাচের সময় আলো জ্বলতো।

—এটা কি?

—ওটা কাঁচের মগ, সায়েবরা জল খেতো। এই ছাখো এরে বলে ডিক্যাণ্টার, মদ খেতো ওরা।

তুলসী ছেলেমেয়েদের ডেকে বললে—ছুঁস নে ওসব। ওদিকি যাস্ নে, সন্দে বেলা নাইতি হবে—ইদিকি সরে আয়।

কুঠির অনেক চাকরবাকর জবাব হয়ে গিয়েচে, সামান্ত কিছু পাইক-পেয়াদা আছে এই মাত্র। লাঠিয়ালের দল বহুদিন আগে অন্তর্হিত। ওদিকের বাগান-গুলো লতাজঙ্গলে নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। দিনমানেও সাপের ভয়ে কেউ ঢোকে না। সেদিন একটা গোখুরা সাপ মারা পড়েছিল কুঠির পশ্চিম দিকের হাতার ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে।

পুরানো চাকর-বাকরদের মধ্যে আছে কেবল কুঠির বহু পুরনো রাঁধুনী ঠাকুর বংশীবদন মুখুয্যে—দেওয়ানজি ও অন্যান্য কর্মচারীর ভাত-রাঁধে।

ময়নার মেয়ে শিবি বললে—ও দাদু, ও দেওয়ানদাদু, সায়েবদের নাকি নাইবার ঘর ছিল? আমি দেখবো—

তখন দেওয়ান হরকালী সুর নিজে সঙ্গে ক'রে ওদের সকলকে নিয়ে গেলেন বড় গোসলখানায়। সেখানে একটা বড় টব দেখে তো সকলে অবাক। ময়নার মেয়ের ইচ্ছে ছিল এই টবে সে একবার নেমে দেখবে কি ক'রে সাহেবরা নাইতো—মুখ ফুটে কথাটা সে বলতে পারলে না। অনেকক্ষণ ধরে ওরা আসবাবপত্তর দেখলে, হাতে করে নাড়লে, টিপে টিপে দেখলে।

সাহেবরা এত জিনিস নিয়ে কি করতো?

বেলা পড়লে ওরা যখন চলে এসে গাড়িতে উঠলো, কুঠির কর্মচারীরা সসম্ভ্রমে গাড়ি পর্যন্ত এসে ওদের এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাত্রে খেটেখুটে এসে লালমোহন পাল পশ্চিম দিকের চারচালা বড় ঘরের কাঁঠালকাঠের তক্তাপোশে শুয়েচে, তুলসী ডিবেভর্তি পান এনে শিয়রের বালিশের কাছে রেখে দিয়ে বললে—কুঠি দেখে এ্যালাম আজ।

লালমোহন পাল একটু অন্যমনস্ক, আড়াইশো ছাল্লা গাছতামাকের বায়না করা হয়েছিল ভাজনঘাট মোকামে, মালটা এখনো এসে পৌঁছোয় নি, একটু ভাবনায় পড়েচে সে। তুলসী উত্তর না পেয়ে বলে—কি ভাবচো?

—কিছু না।

—ব্যবসার কথা ঠিক!

—ধরো তাই।

—আজ কুঠি দেখতি গিয়েছিলাম, দেখে এ্যালাম।

—কি দেখলে?

—বাবাঃ, সে কত কি! তুমি দেখেচ গা?

—আমি? আমার বলে মরবার ফুস্‌র্‌ৎ নেই, আমি যাবো কুঠির জিনিস দেখতি! পাগল আছো বড়বৌ, আমরা হচ্ছি ব্যবসাদার লোক, শখ-শৌখিনতা আমাদের জন্যি না। এই ছাখো, ভাজনঘাটের তামাক আসি নি, ভাবচি

—হ্যাঁগা, আমার একটা সাধ রাখবা?

তুলসী ন'বছরের মেয়ের মত অবদারের সুরে কথা শেষ ক'রে হাসি-হাসি মুখে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

লালমোহন পাল বিরক্তির সুরে বললে—কি?

অভিমানের সুরে তুলসী বলে—রাগ করলে গা? তবে বলবো নি।

—বলোই না ছাই!

—না।

—লক্ষ্মি দিদি আমার, বলো বলো—

—ওমা আমার কি হবে! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, ও আবার কি কথা! অমন বলতি আছে? ব্যবসা ক'রে টাকা আনতিই শিখেচো, ভদ্দরলোকের কথাও শেখো নি, ভদ্দরলোকের রীতনীত কিছুই জানো না।

ইস্ত্রিকে আবার দিদি বলে কেডা ?

লালমোহন বড় অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে সত্যিই অন্যমনস্ক ছিল, বললে—কি করতি হবে বলো বড়বৌ—

—জরিমানা দিতি হবে—

—কত ?

—আমার একটা সাধ আছে, মেটাতি হবে। মেটাবে বলো ?

—কি ?

—শীত আসচে সামনে, গাঁয়ের সব গরীবদুঃখী লোকদের একখানা ক'রে রেজাই দেবো আর বামুনঠাকুরদের সবাইকে জোনাজাৎ একখানা ক'রে বনাত দেবো। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন।

—গরীবদের রেজাই দেওয়া হবে, কিন্তু বামুনরা তোমার দান নেবে না। আমাদের গাঁয়ের ঠাকুরদের চেনো না ? বেশ, আমি আগে দেখি একটা ইষ্টিমিট ক'রে। কত খরচ লাগবে। কলকাতা থেকে মাল আনাতি লোক পাঠাতি হবে, তার পরে।

—আর একটা কথা—

—কি ?

—এক বুড়ো বামুনের চাকরি ছাড়িয়ে দিয়েচে দেওয়ানমশাই কুঠি থেকে। তার নাম প্রসন্ন চক্কত্তি। বলেচেন, তোমার আর কোনো দরকার নেই।

—এসে ধরেচে বুঝি তোমায় ? এ তোমার অন্যায় বড়বৌ। কুঠির কাজ আমি কি বুঝি ? কাজ নেই তাই জবাব হয়ে গিয়েচে। কাজ না থাকলি বসে বসে মাইনে গুনতি হবে ?

—হ্যাঁ হবে। এ বয়সে তিনি এখন যাবেন কোথায় জিগ্যেস করি ? কে চাকরি দেবে ?

নালু পাল বিরক্তির সুরে বললে—ছেলেমানুষ তুমি, এসবের মধ্যি থাকো কেন ? তুমি কি বোঝো কাজের বিষয় ? টাকাটা ছেলের হাতের মোয়া পেয়েচ, না ? বললিই হোলো ! কেন তোমার কাছে সে আসে জিগ্যেস করি ? বিটলে

বামুন।

তুলসী ধীর সুরে বললে—ছাখো। একটা কথা বলি। অমন যা-তা কথা মুখে এনো না। আজ দুটো টাকা হয়েচে বলে অতটা বাড়িও না।

লালমোহন পাল বললে—কি আর বাড়ালাম আমি? আমি তোমাকে বললাম, নীলকুঠির কাজ আমি কি বুঝি! দেওয়ান যা করেন, তার ওপর তোমার আমার কথা বলা তো উচিত নয়; তুমি মেয়েমানুষ, কি বোঝো এ সবের? কাজের দস্তুর এই।

—বেশ, কাজ তুমি ছাও আর না ছাও গিয়ে—যা-তা বলতি নেই লোককে। ওতে লোকে ভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, আজ তাই বড্ড অংথার। ছিঃ—

তুলসী রাগ ক'রে অপ্রসন্ন মুখে উঠে চলে গেল।

এ হোলো বছর দুই আগের কথা। তারপর প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন কোথায় চলে গেল এতকালের কাছাড়ী ছেড়ে। উপায়ও ছিল না। হরকালী সুর কর্মচারী ছাঁটাই করেছিলেন জমিদারের ব্যয়সঙ্কোচ করবার জন্যে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো তার ঠিক ছিল না। ভজা মুচি সহিস ও বেয়ারা শ্রীরাম মুচির চাকরি গেলে চাষবাষ করতো। এ বছর শ্রাবণ মাসে মোল্লাহাটির হাট থেকে ফেরবার পথে অন্ধকারে ওকে সাপে কামড়ায়, তাতেই সে মারা যায়।

নীলকুঠির বড় সাহেবের বাংলোর সামনে আজকাল লালমোহন পালের ধানের থামার। খাস জমি দেড়শো বিঘের ধান সেখানে পৌষ মাসে ঝাড়া হয়, বিচালির আঁটি গাদাবন্দি হয়, যে বড় বারান্দাতে সাহেবরা ছোট হাজরি খেতো সেখানে ধান-ঝাড়াই কৃষাণ এবং জনমজুরেরা বসে দা-কাটা তামাক খায় আর বলাবলি করে—সুমুন্দির সায়েবগুলো এই ঠানটায় বসে কত মুরগির গোস্ত খেয়েছে আর ইঞ্জিরি বলেচে! ইদিকি কোনো লোকের ঢোকবার হুকুম ছেলো না—আর আজ সেখানডাতে বসে ওই ছাখো রজবালি দাদ চুলকোচ্ছে।...

বিকেলবেলা খোকাকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে গেলেন রামকানাই কবিরাজের

ঘরে।

খোকা তাঁকে ছাড়তে চায় না, যেখানে তিনি যাবেন, যাবে তাঁর সঙ্গে। বড় বড় বাবলা আর শিমুল গাছের সারি, শ্যামলতার ঝোপ, বাদুড় আর ভাম ছুটপাট করচে জঙ্গলের অন্ধকারে। উইদের ঢিপিতে জোনাকী জ্বলচে, ঠিক যেন একটা মানুষ বসে আছে বাঁশবনের তলায়। খোকা একবার ভয় পেয়ে বললে—ওটা কি বাবা?

চরপাড়া মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে রামকানাই কবিরাজের মাটির ঘর। দোতলা মাটির প্রদীপে আলো জ্বলচে। ওদের দেখে রামকানাই কবিরাজ খুশি হোলেন। খোকার কেমন বড় ভালো লাগে কবিরাজ বুড়োর এই মাটির ঘর! এখানে কি যেন মোহ মাখানো আছে, ওই দোতলা মাটির পিদিমের স্নিগ্ধ আলোয় ঘরখানা বিচিত্র দেখায়। বেশ নিকনো-পুঁছানো মাটির মেঝে। কাছেই বাগ্‌দিপাড়া, বাগ্‌দিদের একটি গরীব মেয়ে বিনি পয়সায় ঘর নিকিয়ে দিয়ে যায়, তাকে শক্ত রোগ থেকে রামকানাই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে কি একটি ঠাকুরের ছবি, ফুল দিয়ে সাজানো। ঘরের মধ্যে তক্তপোশ নেই, মেজেতে মাদুর পাতা, বইকাগজ দু'চারখানা ছড়ানো, তিন-চারটি বেতের পেঁটারি, তাতে রামকানাইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ বা সম্পত্তি নেই, আছে কেবল কবিরাজি ওষুধ ও গাছগাছড়া চূর্ণ।

ভবানীরও বড় ভালো লাগে এই নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাটির ঘরে সন্ধ্যাযাপন। এ পাড়াগাঁয়ে এর জুড়ি নেই। রামকানাই চৈতন্যচরিতামৃত পড়েন, ভবানী একমনে শোনেন। শুনতে শুনতে ভবানী বাঁড়ুয্যের পরিব্রাজক দিনের একটা ছবি মনে পড়ে গেল। নর্মদার তীরে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর তাঁর এক পরিচিত সন্ন্যাসীর আশ্রম। সন্ন্যাসীর নাম স্বামী কৈবল্যানন্দ—তিনি পুরী সম্প্রদায়ের সাধু। শ্রীশ্রী১০৮ মাধবানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। একাই থাকতেন ওপরকার কুটিরে। নিচে আর একটা লম্বা চালাঘরে তাঁর তিনটি শিষ্য বাস করতো ও গুরুসেবা করতো। একটা দুগ্ধবতী গাভী ছিল, ওরাই পুষতো, ঘাস খাওয়াতো, গোবরের ঘুঁটে দিত।

সাধুর কুটিরের বেড়া বাঁধা ছিল শনের পাকাটি দিয়ে। পাহাড়ী ঘাসে ছাওয়া ছিল চাল দুখানা। কি একটা বন্যলতার সুগন্ধী পুষ্প ফুটে থাকতো বেড়ার গায়ে। বনটিয়া ডাকতো তুন্ গাছের সু-উচ্চ শাখা-প্রশাখার নিবিড়তায়। ঝর্ণার কুলুকুলু শব্দ উঠতো নর্মদার অপর পারের মহাদেও শৈলশ্রেণীর সানুদেশের বনস্থলী থেকে। নিচের কুটিরে বসে ভজন গাইতেন কৈবল্যানন্দজীর শিষ্য অনুপ ব্রহ্মচারী। রাত্রে ঘুম ভেঙে ভবানী শুনতেন করুণ তিলককামোদ রাগিণীর সুর ভেসে আসচে নিচের কুটির থেকে, গানের ভাঙা ভাঙা পদ কানে আসতো—

"এক ঘড়ি পলছিন কল না পরত মোহে।"

সকালে উঠে দাওয়ায় বসে দেখতেন আরো অনেক নিচে একটা মস্ত বড় কুসুমগাছ, তার পাশে একটা তেঁতুলগাছ। বড় বড় পাথরের ফাটলে বাংলাদেশের দশবাইচণ্ডী জাতীয় এক রকম বনফুল অসংখ্য ফুটতো। এগুলোর কোন গন্ধ ছিল না, সুগন্ধে বাতাস মদির করে তুলতো সেই বন্যলতার হলুদ রংয়ের পুষ্পস্তবক। কেমন অপূর্ব শান্তি, কি সুস্নিগ্ধ ছায়া, পাখীর কি কলকাকলী ছিল বনে, নদীতীরে। কেউ আসতো না নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে, অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার মধ্যে ভগবানের ধ্যান জমতো কি চমৎকার। নেমে এসে নর্মদায় স্নান ক'রে আবার পাহাড়ে উঠে যেতেন পাথরে পা দিয়ে দিয়ে।

সেই সব শান্তিপূর্ণ দিনের ছবি মনে পড়ে কবিরাজ মশাইয়ের ঘরটাতে এসে বসলে। কিন্তু ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে গেলে শুধু বিষয়-আশয়ের কথা, শুধুই পরচর্চা। ফণি চক্কত্তি একা নয়, যার কাছে যাবে, সেখানেই অতি সামান্য গ্রাম্যকথা। ভালো লাগে না ভবানীর।

আর একটা কথা মনে হয় ভবানীর। ঠাকুরের মন্দির হওয়া উচিত এই রকম ছোট পর্ণকুটিরে, শান্ত বন্য নির্জনতার মধ্যে। বড় বড় মন্দির, পাথর-বাঁধানো চত্বর, মার্বেল বাঁধানো গৃহতলে শুধু ঐশ্বর্য আছে, ভগবান নেই। অনেক ঐ রকম মন্দিরের সাধুদের মধ্যে লোভ ও বৈষয়িকতা দেখেছেন তিনি। শ্বেত পাথর বাঁধানো গৃহতল সেখানে দেবতাশূন্য।

রামকানাই জিগ্যেস করলেন—বাঁড়ুয্যেমশাই, বৃন্দাবন গিয়েচেন?

—যাই নি।

—এত জায়গায় গেলেন, ওখানভাতে গেলেন না কেন?

—বৃন্দাবন লীলা আমার ভালো লাগে না।

—আমার আর কি বুদ্ধি, কি বোঝাবো! সংসারের নানা ঝন্‌ঝাটে ভক্ত আশ মিটিয়ে ভগবানের প্রেমকে উপভোগ করতে পারে না, তাই একটা চিন্ময় ধামের কথা বলা হয়েচে, সেখানে শুধু ভক্ত আর ভগবানের প্রেমের লীলা চলচে। এডাই বৃন্দাবন লীলা।

—খুব ভালো কথা। যে বৃন্দাবনের কথা বললেন, সেটা বাইরে সর্বত্রই রয়েচে। চোখ থাকলে দেখা যাবে ওই ফুলে, পাখীর ডাকে, ছেলেমানুষের হাসিতে তিনিই রয়েচেন।

—ওই চোখডা কি সকলে পায়?

—সেজন্যে হাতড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। প্রাচীন শাস্ত্র বেদ, যে বেদ প্রকৃতির গায়ে লেখা আছে। আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্মগ্রন্থ। এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলাবিভূতি দর্শন হয় বেশি ক'রে। পাথরে গড়া মন্দিরে কি হবে, যার ভেতর তিনি নিজে থাকেন সেটাই তাঁর মন্দির। ওই চড়পাড়ার বিলে আসবার সময় দেখলাম কুমুদ ফুল ফুটে আছে, ওটাই তাঁর মন্দির। বাইরের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতির তালে তালে চলে তাকে ভালোবেসে সেই প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌঁছ'তে হবে।

—একেই বলেচে বৈষ্ণব শাস্ত্রে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'।

—ঠিক কথা, শুধু একটা মন্দিরে বা তীর্থস্থানে তিনি আছেন? পাগল নাকি! 'বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা কূলে সমুদ্রস্য সরিৎতটে বা' সব জায়গায় তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, অথচ চোখ খুলে না যদি আমি দেখি, তবে তিনি নাচার। তিনি শিশুবেশে এসে আমার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আমি 'মায়ার বন্ধন' বলে আঁৎকে উঠে ছুটে পালালুম, এ বুদ্ধি নিয়ে এ চোখ দিয়ে কি ভগবান দর্শন হয়? তাঁর হাতের বন্ধনই তো মুক্তি। মুক্তি-মুক্তি

বলে চীৎকার করলে কি হবে? কি চমৎকার মুক্তি!

—আচ্ছা ভগবান কি আমাদের প্রেম চান বাঁড়ুয্যেমশাই? আপনার কি মনে হয়?

—আজকাল যেন বুঝতে পারি কিছু কিছু। ভগবান প্রেম চান, এটাও মনে হয়। আগে বুঝতাম না। জ্ঞানের ওপরে খুব জোর দিতাম। এখন মনে হয় তিনি আমার বাবা। তাঁর বংশে আমাদের জন্ম। সেই রক্ত গায়ে আছে আমাদের। কখনো কোনো কারণে তিনি আমাদের অকল্যাণের পথে ঠেলে দেবেন না, দিতে পারেন না। তিনি বিজ্ঞ বাবার মতো আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন। তিনি যে আমাদের বহু বিজ্ঞ, বহু প্রাচীন, বহু অভিজ্ঞ, বহু জ্ঞানী, বহু শক্তিময় বাবা। আমরা তাঁর নিতান্ত অবোধ, কুসংস্কারগ্রস্ত, ভীরু, অসহায় ছেলে। জেনেশুনে কি আমাদের অমঙ্গলের পথে ঠেলে দিতে পারেন? তা কখনও হয়?

রামকানাই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—বাঃ, বাঃ—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন পরের কথাটা বলতে ইতস্ততঃ করছেন। তারপরে বলেই ফেললেন কথাটা। বললেন—এ আমার নিজের অনুভূতির কথা কবিরাজ মশাই। আগে এসব বুঝতাম না, বলেচি আপনাকে। আসল কথা কি জানেন, অপরের মুখে হাজারো কথার চেয়ে নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া এককণা সত্যের দাম অনেক বেশি। নিজে বাবা হয়ে, খোকা জন্মবার পরে তবে ভগবানের পিতৃরূপ নিজের মনে বুঝলাম ভালো ক'রে। এতদিন পিতার মন কি জিনিস কি ক'রে জানবো বলুন!

রামকানাই কবিরাজ হেসে বললেন—তাহলি দাঁড়াচ্চে এই, খোকা আপনার এক গুরু?

—যা বলেন। কে গুরু নয় বলতে পারেন? যার কাছে যা শেখা যায়, সেখানে সে আমার গুরু। তিনি তো সকলের মধ্যেই। একটা গানের মধ্যে আছে না—

জনকরূপেতে জন্মাই সন্তান
জননী হইয়া করি স্তনদান

শিশুরূপে পুনঃ করি স্তনপান
এ সব নিমিত্ত কারণ আমার—

—কার গান? বাঃ—

—এও এক নতুন কবির। নামটা বলতে পারলুম না। গোড়াটা হচ্ছে—

আমাতে যে আমি সকলে সে আমি
আমি সে সকল সকলই আমার।

রামকানাই কবিরাজ অতি চমৎকার শ্রোতা। খোকাও তাই। খোকা কেমন এক প্রকার বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে চুপটি ক'রে। রামকানাই উৎসাহের সুরে বললেন—বেশ গান। তবে বড্ড উঁচু। অদ্বৈত বেদান্ত। ও সব সাধারণের জন্যে নয়।

—আপনি যা বলেন। তবে সত্যের উঁচু নিচু নেই। এ সব গুরুতত্ত্ব। আমার গুরু বলতেন—অদ্বৈতবাদী হওয়া অত সহজ নয়। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী জীবের আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে ভাববে। জীবের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে ভাববে। জীবের সেবায় ভোর হয়ে যাবে। সকলের দেহই তার দেহ, সকলের আত্মাই তার আত্মা। আপন পর কিছু থাকে না সে অবস্থায়। নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে জীবের পায়ে এতটুকু কাঁটা তুলতে। তার কাছে জাগ্রত দশায় 'অতো মম জগৎ সর্বং' জগতের সবই আমার, সবই আমি—আবার সমাধি অবস্থায় 'অথবা ন চ কিঞ্চন' কিছুই আমার নয়। কিছুই নেই, এক আমিই আছি। জগৎ তখন নেই। বুঝলেন কবিরাজ মশাই?

—বড্ড উঁচু কথা। কিন্তু বড্ড ভালো কথা। হজম করা শক্ত আমার পক্ষি। বড়ি বেটে রোগ সারাই, আমি ও বেদান্ত-টেদান্ত কি করবো বলুন? সে মস্তিষ্ক কি আছে? তবে বড়ো ভালো লাগে। আপনি আসেন এ গরীবের কুঁড়েতে, কত যে আনন্দ হ্যান এসে সে মুখি আর কি বলবো আপনারে? দাঁড়ান, খোকারে কি এট্টু খেতি দিই! খুব চমৎকার হোলো আজ।

—এই বেশ কথা হচ্ছে, আবার খাওয়া কেন? উঠলেন কেন?

—একটুখানি খেতি দিই ওরে। ছানা দিয়ে গিয়েছিল একটা রুগী। তাই

একটু দি—এই নাও খোকা—

খোকা বললে—বাবা না খেলি আমি খাবো না। বাবা আগে খাবে।

রামকানাই হাততালি দিয়ে বললে—বাঃ, ও-ও বাপের বেটা! কেডা গাং বাইরি?

ঠিক সেই সময়ে গয়ামেম এসে ঘরে ঢুকলো, তার হাতে একছড়া কলা, ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁদের প্রণাম করে কলাছড়া এগিয়ে দিয়ে বললে—বাবা খাবেন।

ভবানী ওকে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন—এখানে আস নাকি?

গয়া বিনীত স্বরে বললে—মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসি। তবে আপনার দেখা পাবো এখানে তা ভাবি নি।

—অতদূর থেকে আস কি ক'রে?

—না বাবা, এখানে যেদিন আসি, চরপাড়াতে আমার এক দূর-সম্পক্কো বুনের বাড়ি রাতি শুয়ে থাকি।

হঠাৎ তার চোখ গেল কোলে উপবিষ্ট খোকার তন্ময় মূর্তির দিকে। ওর কাছে গিয়ে বললে—এ খোকা কাদের? আপনার? সোনার চাঁদ ছেলেটুকুনি। বেশ বড়সড় হয়ে উঠেচে। আহা বেঁচে থাক—দেওয়ানজির বংশের চূড়ো হয়ে বেঁচে থাকো বাবা—

ভবানী বললেন—কি কর আজকাল?

—কি আর করব বাবা! দুঃখু-ধান্দা করি। মা মারা যাওয়ার পর বড় কষ্ট। এখানে তাই ছুটে ছুটে আসি বাবার কাছে, একটু চৈতন্যচরিতামৃত শুনতি।

—বল কি! তোমার মুখে যা শুনলাম, অনেক ব্রাহ্মণের মেয়ের মুখে তা শুনি নি!

—সে বাবা আপনাদের দয়া। মা মরে যেতি সংসারডা বড্ড ফাঁকা মনে হোলো—তারপর খুব সঙ্কুচিত ভাবে নিতান্ত অপরাধিনীর মতো বললে আস্তে আস্তে—বাবা, কাঁচা বয়েসে যা করি ফেলিচি তার চারা নেই। এখন বয়েস হয়েচে, কিছু কিছু বুঝতি পারি। আপনাদের মত লোকের দয়া একটু

পেলি—

—আমরা কে ? দয়া করবারই বা কি আছে ? তিনি কাউকে ফেলবেন না, তা তুমি তো তুমি ! তুমি কি তাঁর পর ?

রামকানাই কবিরাজের দিকে চেয়ে বললেন—ওহে কবিরাজমশাই, আপনি যে দেখচি ভবরোগের কবিরাজ সেজে বসলেন শেষে। দেখে সুখী হলাম।

রামকানাই বললে—ভবরোগটা কি ?

—সে তো ধরুন, গানেই আছে—

ভবরোগের বৈদ্য আমি
অনাদরে আসিনে ঘরে।

—বোঝলাম। জিনিসটা কি ?

—আমার মনে হয়, ভবরোগ মানে অজ্ঞানতা। অর্থের পেছনে অত্যন্ত ছোটাছুটি। কেন, ঘরে দুটো ধান, উঠোনে দুটো ডাঁটাশাক—মিটে গেল অভাব, আপনার মতো। এখন হয়ে দাঁড়াচ্চে মায়ের পেটের এক ভাই গরীব, এক ভাই ধনী।

—আমার কথা বাদ দ্যান। আমার টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই তাই। থাকলি আমিও করতাম।

—করতেন না। আপনার মনের গড়ন আলাদা। বৈষয়িক কূটবুদ্ধি লোক আপনি দেখেন নি তাই একথা বলচেন। কি জানেন, ভক্তকে একটু বেশি সামনে রাখেন তিনি। তাকে আপনার জন ভাবেন ! এ বড় গূঢ় তত্ত্ব।

—ও কথা ছেড়ে দ্যান জামাইবাবু। যার যা তার সেটা সাজে। আমার ভালো লাগে এই মাটির কুঁড়ে তাই থাকি। যার না লাগে, সে অন্য চেষ্টা করে।

—তারা কি আপনার চেয়ে আনন্দ পায় বেশী ? সুখ পায় বেশি ? কখনো না। আনন্দ আত্মার ধর্ম, মন যত আত্মার কাছে যাবে, তত সে বেশি আনন্দ পাবে—আত্মার থেকে দূরে যত যাবে, বিষয়ের দিকে যাবে, তত দুঃখ পাবে। বাইরে কোথাও আনন্দ নেই, আনন্দ শান্তির উৎস রয়েচে মানুষের নিজের মধ্যে। মানুষ চেনে না, বাইরে ছোটে। নাভিগন্ধে মত্ত মৃগ ছুটে ফেরে গন্ধ

অন্বেষণে। তারা সুখ পায় না।

—সে তারা জানে। আমি কি বলবো? আমি এতেই সুখ পাই, আনন্দ পাই এইটুকু বলতি পারি। আনন্দ ভেতরেই, এটুকু বুঝিচি। নিজের মধ্যিই খুব!

খোকা পুনরায় একমনে বসে এই সব জটিল কথাবার্তা শুনছিল। ওর বড় বড় দুই চোখে বুদ্ধি ও কৌতূহলের চাহনি।

গয়ামেমের কি ভালোই লাগলো ওকে! কাছে এসে ডেকে চুপি চুপি বললে—ও খোকা, তোমার নাম কি?

—টুলু।

—মোর সঙ্গে যাবা?

—কোথায়?

—মোর বাড়ি। পেঁপে খেতি দেবানি।

—বাবা বললি যাবো।

—আমি বললি যেতি দেবেন না কেন?

—হুঁ, নিয়ে যেও। অনেকদূর তোমার বাড়ি?

—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। যাবা ও বাবা? যাবা ঠিক?

খোকা ভেবে ভেবে বললে—পেঁপে আছে?

—নেই আবার! এই এত বড় পেঁপে—

গয়া দুই হাত প্রসারিত ক'রে ফলের আকৃতি যা দেখালে, তাতে লাউ কুমড়োর বেলায় বিশ্বাস হোতো, কিন্তু পেঁপের ক্ষেত্রে যেন একটু অতিরঞ্জিত বলে সন্দেহ নয়।

খোকা বললে—বাবা, ও বাবা, মাসীমার বাড়ি যাব? পেঁপে দেবে—বাবার বিনা অনুমতিতে সে কোন কাজ করে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে চেয়ে রইল।

গয়ামেম রাত্রে এসে রইল চরপাড়ার ওর দূর-সম্পর্কের এক ভগ্নীর বাড়ি। সকালে উঠে সে চলে যাবে মোল্লাহাটি। ঠিক মোল্লাহাটি নয়, ওর গ্রাম

গণেশপুরে। ওর দূর-সম্পর্কের বোনের নাম নীরদা, নীরি বাগ্‌দিনী বলে গ্রামে পরিচিতা। তার অবস্থা ভালো না, আজ সন্ধ্যাবেলা গয়া এসে পড়াতে এবং রাত্রে থাকবে বলাতে নীরি একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কি খাওয়ায়? এক সময়ে এই অঞ্চলের নামকরা লোক ছিল গয়ামেম। খেয়েচেও অনেক। তাকে যা-তা দিয়ে ভাত দেওয়া যায়? কুচো চিংড়ি দিয়ে ঝিঙের ঝোল আর রাঙা আউশ চালের ভাত তাই দিতে হোলো। তারপর একটা মাদুর পেতে একখানা কাঁথা দিলে ওকে শোওয়ার জন্যে।

গয়ার শুয়ে শুয়ে ঘুম এল না।

ওই খোকার মুখখানা কেবলই মনে পড়ে। অমন যদি একটা খোকা থাকতো তার?

আজ যেন সব ফাঁকা, সব ফুরিয়ে গিয়েচে, এ ভাবটা তার মনে আসতো না যদি একটা অবলম্বন থাকতো জীবনের। কি আঁকড়ে সে থাকে?

আজ ক'বছর বড় সাহেব মারা গিয়েচে, নীলকুঠি উঠে গিয়ে নালু পালের জমিদারী কাছারী হয়েচে। এই ক'বছরেই গয়ামেম নিঃস্ব হয়ে গিয়েচে। বড় সাহেব অনেক গহনা দিয়েছিল, মায়ের অসুখের সময় কিছু গিয়েচে, বাকি যা ছিল, এতদিন বেচে বন্ধক দিয়ে চলচে। সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পুরনো দিনগুলোর কথা যেন স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে। অথচ খুব বেশি দিনের কথাও তো নয়। এই তো সে দিনের। ক'বছর আর হোলো কুঠি উঠে গিয়েচে! ক'বছরই বা সাহেব মারা গিয়েচে!

এ কঠিন সংসারে কেউ যে বড় একটা কাউকে দেখে না, তা এতদিনে ভালোই বুঝতে পেরেচে সে। আপনার লোক ছিল যে ক'জন সব চলে গিয়েচে।

নীরি এসে কাছে বসলো। দোক্তাপান খেয়ে এসেচে, কড়া দোক্তাপাতার গন্ধ মুখে। ওসব সহ্য করতে পারে না গয়া। ওর গা যেন কেমন করে উঠলো।

—ও গয়া দিদি—

—কি রে?

—ঘুমুলি ভাই?

—না, গরমে ঘুম আসচে না।

নীরি খেজুরের চাটাই পেতে ওর পাশেই শুলো। বললে—কি বা খাওয়ালাম তোরে! কখনো আগে আসতিস নে—

এটাও বোধহয় ঠেস দিয়ে কথা নীরির। সময় পেলে লোকে ছাড়বে কেন, ব্যাঙের লাথিও খেতে হয়। নীরি তো সম্পর্কে বোন।

গয়া বললে—একটা কথা নীরি। আমার হাত অচল হয়েচে, কিছু নেই। কি করে চালাই বল দিকি?

নীরি সহানুভূতির সুরে বললে—তাই তো দিদি। কি বলি। ধান ভানতি পারবি কি আর? তা হলি পেটের ভাতের চালডা হয়ে যায় গতর থেকে।

—আমার নিজের ধান তো ভানি। তবে পরের ধান ভানি নি। কি রকম পাওয়া যায়?

—পাঁচাদরে।

—সেটা কি? বোঝলাম না।

—ভারি আমার মেমসায়েব আলেন রে!

সত্যি, গয়ামেম এ কখনো শোনে নি। সে চোদ্দ বছর বয়স থেকে বড় গাছের আওতায় মানুষ। সে এসব দুঃখু-ধান্ধার জিনিসের কোনো খবর রাখে না। বললে—সেডা কি, বুঝলাম না নীরি। বল না?

নীরি হি-হি ক'রে উচ্চরবে যে হাসিটা হেসে উঠলো, তার মধ্যেকার শ্লেষের সুর ওর কানে বড় বেশি ক'রে যেন বাজলো। কাল সকালে উঠেই সে চলে যাবে এখান থেকে।

দুঃখিত হয়ে বললে—অত হাসিডা কেন? সত্যি জানি নে। আমি মিথ্যে বলবো এ নিয়ে নীরি?

নীরি তাকে বোঝাতে বসলো জিনিসটা কাকে বলে। বড় পরিশ্রমের কাজ, সকালে উঠে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হবে দুপুর পর্যন্ত। ধান সেদ্ধ করতে হবে, তার জন্যে কাঠকুটো কুড়িয়ে জড়ো করতে হবে। চৈত্র মাসে শুকনো বাঁশপাতা

কুমোরদের বাজরা পুরে কুড়িয়ে আনতে হবে বাঁশবাগান থেকে। সারা বছর উনুন ধরাতে হবে তাই দিয়ে। চিঁড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে দু'হাত ব্যথায় টনটন করবে। কথা শেষ করে নিরি বললে—সে তুই পারবি নে, পারবি নে। পিসিমা তোরে মানুষ করে গিয়েল অন্য ভাবে। তোর আখের নষ্ট ক'রে রেখে গিয়েচে। না হলি মেমসায়েব, না হলি বাগ্‌দিঘরের ভাঁড়ারি মেয়ে! কি ক'রে তুই চালাবি? দুকূল হারালি।

গয়া আর কোনো কথা বললে না।

তার নিজের কপালের দোষ। কারো দোষ নয়। এরা দিন পেয়েচে, এখন বলবেই। আর কারো কাছে দুঃখু জানাবে না সে। এরা আপনজন নয়। এরা শুধু ঠেস্ দিয়ে কথা বলে মজা দেখবে।

নীরি বললে—দোক্তা খাবি?

—না ভাই।

—ঘুম আসচে?

—এবার একটু ঘুমুই।

—তোমার সুখের শরীল। রাত জাগা অভ্যেস থাকতো আমাদের মত তো ঠ্যালাটি বুঝতে! পুজোর সময় পরবের সময় সারারাত জেগে চিঁড়ে কুটিচি, ছাতু কুটিচি, ধান ভেনেচি। নইলে খদ্দের থাকে? রাত একটু জাগতি পারো না, তুমি আবার পাঁচাদরে ধান ভানবা, তবেই হয়েচে!

গয়া খুব বেশি ঝগড়া করতে পারে না। সে অভ্যাস তার গড়ে ওঠে নি পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত। নতুবা এখুনি তুমুল কাণ্ড বেধে যেতো নীরির সঙ্গে। একবার ইচ্ছে হলো নীরির কুটুনির সে উত্তর দেবে ভালো করেই। কিন্তু পরক্ষণেই তার বহুদিনের অভ্যস্ত ভদ্রতাবোধ তাকে বললে, কেন বাজে চেঁচামেচি করা? ঘুমিয়ে পড়ো, ও যা বলে বলুক গে। ওর কথায় গায়ে ঘা হয়ে যাবে না। নীরি কি জানবে মনের কথা?

প্রসন্ন খুড়োমশায়ের সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নি। কোথায় চলে গিয়েচেন নীলকুঠির কাছারীতে বরখাস্ত হয়ে। তবুও একজন লোক ছিল, অসময়ে

খোঁজখবর নিত। আকাট নিষ্ঠুর সংসারে এই আর একজন যে তার মুখের দিকে চাইতো। অবহেলা হেনস্থ করেচে তাকে একদিন গয়া। আজ নীরির মুখের দোক্তাতামাকের কড়া গন্ধ শুকতে শুঁকতে কেবলই মনটা হু-হু করচে সেই কথা মনে হয়ে। আজ তিনিও নেই।

কবিরাজ ঠাকুরের এখানে এসে তবু যেন খানিকটা শান্তি পাওয়া যাচ্চে অনেকদিন পরে। কারা যেন কথা বলে এখানে। সে কথা কখনো শোনে নি। মনে নতুন ভরসা জাগে।

তুলসী সকালে উঠে ছেলেমেয়েদের দুটো মুড়ি আর নারিকেলনাড়ু খেতে দিলে। ঝি এসে বললে—মা, বড় গোয়াল এখন ঝাঁটপস্কার করবো, না থাকবে?

—এখন থাক গো। দুধ দোওয়া না হলি, গরু বের না হলি গোয়াল পুঁছে লাভ নেই। আবার যা তাই হবে।

ময়না এখানে এসেছে আজ দু'মাস। তার ছোট ছেলেটার বড় অসুখ। রামকানাই কবিরাজকে দেখাবার জন্যেই ময়না এখানে এসে আছে ছেলেপুলে নিয়ে। ময়নার বিয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে দিতে পারে নি লালমোহন, তখন তার অবস্থা ভালো ছিল না। সেজন্যে ময়নাকে প্রায়ই এখানে নিয়ে আসে। দাদার বাড়িতে দু'দিন ভালো খাবে পরবে। তুলসী ভালো মেয়ে বলেই আরও এসব সম্ভব হয়েচে বেশি করে। ময়না বেশি দিন না এলে তুলসী স্বামীকে তাগাদা দেয়—হ্যাঁগা, হিম হয়ে বসে আছ (এ কথাটা সে খুব বেশি ব্যবহার করে) যে! ময়না ঠাকুরঝি সেই কবে গিয়েচে, মা-বাপই না হয় মারা গিয়েচে, তুমি দাদা তো আছ—মাও তো বেশি দিন মারা যান নি, ওকে নিয়ে এসো গিয়ে।

ময়নার মা মারা গিয়েছিলেন—তখন নালুর গোলাবাড়ি, দোকান ও আড়ত হয়েচে, তবে এমন বড় মহাজন হয়ে ওঠে নি। নালু পালের একটা দুঃখ আছে মনে, মা এসব কিছু দেখে গেলেন না। তুলসী এখানে এনে ময়নাকে আরো বেশি ক'রে যত্ন করে, শাশুড়ীর ভাগটাও যেন ওকে দিয়ে দেয়। বরং ময়না খুব

ভালো নয়, বেশ একটু ঝগড়াটে, বাল্যকাল থেকেই একটু আদুরে। পান থেকে চুন খসলে তখুনি সতেরো কথা শুনিয়ে দেবে বৌদিকে।

কিন্তু তুলসী কখনো ব্যাজার হয় না। অসাধারণ সহ্যগুণ তার। যেমন আজই হোলো। হঠাৎ মুড়ি খেতে খেতে তুলসীর মেয়ে হাবি ময়নার ছোট ছেলের গালে এক চড় মারলে। ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া, তাতে ময়নার যাবার দরকার ছিল না। সে গিয়ে বললে—কি রে, কেষ্টকে মারলে কেডা?

সবাই বলে দিলে, হাবি মেরেচে, মুড়ি নিয়ে কি ঝগড়া বেধেছিল দুজনে।

ময়না হাবিকে প্রথমে দুড়দাড় ক'রে মারলে, তারপর বকতে শুরু করলে —তোর বড্ড বাড় হয়েচে, আমার রোগা ছেলেটার গায়ে হাত তুলিস, ওর শরীলি আছে কি? ও মরে গেলে তোমাদের হাড় জুড়োয়। এতে মায়েরও আস্কারা আছে কিনা, নইলে এমন হতি পারে?

তুলসী শুনে বাইরে এসে বললে—হ্যাঁ ঠাকুরঝি, আমার এতে কি আস্কারা আছে? বলি, আমি বলবো তোমার ছেলেকে মারতি, কেন সে কি আমার পর?

ময়না ইতরের মত ঝগড়া শুরু করে দিলে। শেষকালে রোগা ছেলেটাকে ঠাস ঠাস ক'রে গোটাকতক চড় বসিয়ে বললে—মর না তুই আপদ। তোর জন্যিই তো দাদার পয়সা খরচ হচ্চে বলে ওদের এত রাগ। মরে যা না—

তুলসী অবাক হয়ে গেল ময়নার কাণ্ড দেখে। সে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—খেপলে না পাগল হ'লে? কেন মেরে মরচিস রোগা ছেলেটাকে অমন ক'রে? আহা, বাছার পিঠটা লাল হয়ে গিয়েচে!

ময়নাও স্বর চড়িয়ে বলতে লাগলো—গিয়েচে যাক। আর অত দরদ দেখাতি হবে না, বলে মা'র চেয়ে যার দরদ তারে বলে ডান!...ছাও তুমি ওকে নামিয়ে—

তুলসী বললে—না, দেবো না। আমার চকির সামনে রোগা ছেলেডারে তুমি কক্ষনো গায়ে হাত দিতি পারবা না—ছেলেটাকে কোলে ক'রে তুলসী নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল।

বেশি বেলায় লালমোহন পাল আড়ত থেকে বাড়ি ফিরে দেখলে তুলসী

রান্না করচে, ছেলেপুলেদের ভাত দেওয়া হয়েচে। দাদাকে দেখে ময়না পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির সাধ তার খুব পুরেচে। যেদিন মা মরে গিয়েচে, সেই দিনই বাপের বাড়ির দরজায় খিল পড়ে গিয়েচে তার। ইত্যাদি।

লালমোহন বললে—হ্যাগা, আবার আজ কি বাধালে তোমরা? খেটেখুটে আসবো সারাডা দিন ভূতির মতো, বাড়িতি এসে একটু শান্তি নেই?

তুলসী কোনো কথা বললে না, কারো কোনো কথার জবাব দিলে না। স্বামীর তেল গামছা এনে দিলে। ঝিকে দিয়ে জলচৌকি পাতিয়ে দু'ঘড়া নাইবার জল দিয়ে বললে—স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নাও দিকি।

—না, আগে বলো, তবে খাবো।

—তুমিও কি অবুঝ হলে গা? আমি তবে কার মুকির দিকি তাকাবো! খেয়ে নাও বলচি।

সব শুনে লালমোহন রেগে বললে—এত অশান্তি সহ্য হয় না। আজই দুটোরে দু'জায়গায় করি। যখন বনে না তোমাদের, তখন—

তুলসী সত্যি ধৈর্যশীলা মেয়ে। বোবার শত্রু নেই, সে চুপ ক'রে রইল। ময়না কিছুতেই খাবে না, অনেক খোশামোদ ক'রে হাত জোড় ক'রে তাকে খেতে বসালে। তাকে খাইয়ে তবে তৃতীয় প্রহরের সময় নিজে খেতে বসলো।

সন্ধ্যার আগে ওপাড়ার যতীনের বোন নন্দরাণী এসে বললে—ও বৌদিদি, একটা কথা বলতি এসেছিলাম, যদি শোনো তো বলি—

তুলসী পিঁড়ি পেতে তাকে বসালে। পান সেজে খেতে দিলে নিজে। নন্দরাণী বললে—একটা টাকা ধার দিতি হবে, হাতে কিছু নেই। কাল সকালে কি যে খাওয়াবো ছেলেটাকে—জানো সব তো বৌদি! বাবার খ্যামতা ছিল না, যাকে তাকে ধরে বিয়ে দিয়ে গ্যালেন। তিনি তো চক্ষু বুজলেন, এখন তুই মর—

তুলসী যাচককে বিমুখ করে না কথনো। সেও গরীব ঘরের মেয়ে। তার বাবা ৺অম্বিক প্রামাণিক সামান্য দোকান ও ব্যবসা ক'রে তাদের কষ্টে মানুষ

ক'রে গিয়েছিলেন। তুলসী সেকথা ভোলে নি। নন্দরাণীকে বললে—যখন যা দরকার হবে, আমায় এসে বলবেন ভাই। এতো লজ্জা করবেন না। পর না ভেবে এসেচেন যে, মনডা খুশি হোলো বড্ড। আর একটা পান খান—দোক্তা চলবে? না? স্বর্ণদিদি ভালো আছেন?…

নন্দরাণী টাকা নিয়ে খুশিমনে বাড়ি চলে গেল সেদিন সন্দের আগেই। ঝিকে তুলসী বললে—ষষ্ঠীতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয় দিদিকে—

তিলু ও নিলু তেঁতুল কুটছিল বসে বসে। চৈত্র মাসের অপরাহ্ণ। একটা খেজুরপাতার চেটাই বিছিয়ে তার ওপর বসে নিলু তেঁতুল কুটছিল, তিলু সেগুলো বেছে বেছে একপাশে জড়ো করছিল।

—কোন্ গাছের তেঁতুল রে?

—তা জানিনে দিদি। গোপাল মুচির ছেলে ব্যাংটা পেড়ে দিয়ে গেল।

—গাঙের ধারের?

—সে তো খুব মিষ্টি। খেয়ে ছাখ্ না!

তিলু একখানা তেঁতুল মুখে ফেলে দিয়ে বললে—বাঃ, কি মিষ্টি! গাঙের ধারের ওই বড় গাছটার!

—তাড়াতাড়ি নে দিদি। খোকা পাঠশালা থেকে এল বলে। এলেই মুখি পুরবে।

—হ্যাঁরে, বিলুর কথা মনে পড়ে? তিনজনে বসে তেঁতুল কুটতাম এরকম, মনে পড়ে?

—খুব।

ছুই বোনই চুপ ক'রে রইল। অনেক কথাই মনে পড়ে। এই তো কয়েক বছর হোল বিলু মারা গিয়েচে। মনে হচ্চে কত দিন, কত যুগ। এই সব চৈত্র মাসের ছুপুরে বাঁশবনের পত্র-মর্মরে, পাপিয়ার উদাস ডাকে যেন পুরাতন স্মৃতি ভিড় ক'রে আসে মনের মধ্যে। বাপের মত দাদা—মা-বাবা মারা যাওয়ার পরে যে দাদা, যে বৌদিদি বাবা-মায়ের মতই তাদের মানুষ করেছিলেন,

তাঁদের কথাও মনে পড়ে।

পাশের বাড়ির শরৎ বাঁড়ুয্যের বৌ হেমলতা পান চিবুতে চিবুতে এসে বললে—কি হচ্চে বৌদিদি? তেঁতুল কুটচো?

তিলু বললে—এ আর কখানা তেঁতুল! এখনো দু'ঝুড়ি ঘরে রয়েচে। তালপাতার চ্যাটাইখানা টেনে বোসো।

—বসবো না, জানতি এয়েলাম আজ কি তিরোদশী? বেগুন খেতি আছে?

—খুব আছে। দোয়াদশী পুরো। রাত দু'পহরে ছাড়বে। তোমার দাদা বলছিলেন।

—দাদা বাড়ি?

—না, কোথায় বেরিয়েচেন। দাদা কেমন আছেন?

—ভালো আছেন। বুড়োমানুষের আর ভালো-মন্দ! কাশি আর জ্বরটা সেরেচে। টুলু কোথায়?

—এখনো পাঠশালা থেকে ফেরে নি বৌদি।

—অনেক তেঁতুল কুটচিস্ তোরা। আমাদের এ বছর দুটো গাছের তেঁতুল পেড়ে ন দেবা ন ধম্মা। মুড়ি মুড়ি পোকা তেঁতুলির মধ্যি। দুটো কোটা তেঁতুল দিস্ সেই শ্রাবণ মাসে অম্বলতা খাবার জন্যি। খয়রা মাছ দিয়ে অম্বল খেতি তোমার দাদা বড্ড ভালোবাসেন।

বেলা পড়ে এসেচে। কোকিল ডাকচে বাঁশঝাড়ের মগডালে। কোথা থেকে শুকনো কুলের আচারের গন্ধ আসচে। কামরাঙা গাছের তলায় নলে নাপিতদের দুটো ছেলে গরু চরে বেড়াচ্চে। ওপাড়ার সতে চৌধুরীর পুত্রবধূ বিরাজমোহিনী গামছা নিয়ে নদীতে গা ধুতে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে।

নিলু ডেকে বললে—ও বিরাজ, বিরাজ—

বিরাজমোহিনী নথ বাঁ হাতে ধরে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি?

—দাঁড়া ভাই।

—যাবে ছোড়দি?

—যাবো।

বিরাজের বাপের বাড়ি নদে শান্তিপুরের কাছে বাঘআঁচড়া গ্রামে। সুতরাং তার বুলি যশোর জেলার মত নয়, সেটা সে খুব ভালো ক'রে জাহির করতে চায় এ অজ বাঙলাদেশের ঝি-বৌদির কাছে। ওর সঙ্গে তিলু নিলু দুই বোনই গেল ঘরে শেকল তুলে দিয়ে।

এ পাড়ায় ইছামতীতে মাত্র দুটি নাইবার ঘাট, একটার নাম রায়পাড়ার ঘাট, আর একটার নাম সায়েবের ঘাট। কিছুদূরে বাঁকের মুখে বনসিমতলার ঘাট। পাড়া থেকে দূরে বলে বনসিমতলার ঘাটে মেয়েরা আদৌ আসে না, যদিও সবগুলো ঘাটের চেয়ে তীরতরুশ্রেণী এখানে বেশি নিবিড়,ধরার অরুণোদয় এখানে অবাচ্য সৌন্দর্য ও মহিমায় ভরা, বনবিহঙ্গকাকলী এখানে সুস্বরা,কত ধরনের যে বনফুল ফোটে ঋতুতে ঋতুতে এর তীরের বনে বনে, ঝোপে ঝোপে! চাঁড়াগাছের তলায় কী ছায়াভরা কুঞ্জবিতান, পঞ্চাশ-ষাট বছরের মোটা চাঁড়াগাছ এখানে খুঁজলে দু'চারটে মিলে যায়।

তিলু বললে—চল না, বনসিমতলার ঘাটে নাইতে যাই—

বিরাজ বললে—এই অবেলায়?

—কদ্দুর আর!

—যেতুম ভাই, কিন্তু শাশুড়ী বাড়ি নেই, দুটি ডাল ভেঙে উঠোনে রোদে দিয়ে গ্যাছেন, তুলে আসতে ভুলে গেলুম আসবার সময়। গোরু-বাছুরে খেয়ে ফেললে আমাকে বুঝি আস্ত রাখবেন ভেবেচ!

নিলু বললে—ও সব কিচ্ছু শুনচি নে। যেতেই হবে বনসিমতলার ঘাটে। চলো।

বিরাজ হেসে সুন্দর চোখ দুটি তেরচা ক'রে কটাক্ষ হেনে বললে—কেন, কোনো নাগর সেখানে ওৎ পেতে আছে বুঝি?

তিলু বললে—আমাদের বুড়োবয়সে আর নাগর কি থাকবে ভাই, ওসব তোদের কাঁচা বয়সের কাণ্ড। একটা ছেড়ে ঘাটে ঘাটে তোদের নাগর থাকতি প্যারে।

—ইস্! এখনো ওই বয়সের রূপ দেখলে অনেক ছুবোর মুণ্ডু ঘুরে যাবে

একথা বলতে পারি দিদি। চলো, দেখি কোন্ ঘাটে নিয়ে যাবে। নাগরের চক্ষু ছানাবড়া ক'রে দিয়ে আসি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায়পাড়ার ঘাটেই ওদের যেতে হোলো, পথে নামবার পরে অনেক ঝি-বৌ ওদের ধরে নিয়ে গেল। ঘাটে অনেক বৌ, হাসির ঢেউ উঠচে, গরম দিনের শেষে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজ লেগেচে সকলের গায়ে, জলকেলি শেষ ক'রে সুন্দরী বধূ-কন্যার দল কেউ ডাঙায় উঠতে চায় না।

সীতানাথ রায়ের পুত্রবধূ হিমি ডেকে বললে—ও বড়দি, দেখি নি যে কদ্দিন!

তিলু বললে—এ ঘাটে আর আসি নে—

—কেন? কোন্ ঘাটে যান তবে?

বিরাজ বললে—তোরা খবর দিস তোদের লুকোনো নাগরালির? ও কেন বলবে ওর নিজের? আমি তো বলতুম না!

হিমি বললে—বড়দিদির বয়েসটা আমার মা'র বয়সী। ওকথা আর ওঁকে বোলো না। তোমার মুখ সুন্দর, বয়েস কচি, ওসব তোমাদের কাজ। ওতে কি?

—এতে ভাই খোল। গা-টায় ময়লা হয়েচে, ক্ষারখোল মাখবো বলে নিয়ে এলুম। মাখবি?

—না। তুমি সুন্দরী, তুমি ওসব মাখো।

সবাই খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। এতগুলি তরুণীর হাসির লহরে, কথাবার্তার ঝিলিকে স্নানের ঘাট মুখর হয়ে উঠেছে, আর কিছু পরে সপ্তমীর চাঁদ উঠবে ঘাটের ওপরকার শিরীষ আর পুয়োঁ গাছের মাথায়। পটপটি গাছের ফুল ঝরে পড়চে জলের ওপর, বিরাজের মনে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব এল, যেন এ সংসারে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, তার রূপের প্রশংসা সব স্থানে শোনা যাবে, বড় পিঁড়িখানা এয়োস্ত্রী সমাজে তার জন্যেই পাতা থাকবে সর্বত্র। ফেনি বাতাসার থালা তার দিকে এগিয়ে ধরবে সবাই চিরকাল, কোন কুয়াসা-ছাড়া পাখী-ডাকা ভোরে শাঁখ বাজিয়ে ডালা সাজিয়ে জল সইতে বেরুবে তার খোকার অন্নপ্রাশনে কি বিয়ে-পৈতেতে, শান্তিপুরী শাড়ী

পরে সে ফুলের সাজি আর তেলহলুদের কাঁসার বাটি নিয়ে ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে, গুজরীপঞ্চম আর পৈঁছে পরে সেজেগুজে চলবে এয়োস্ত্রীদের আগে আগে·· আরও কত কি, কত কি মনে আসে·· মনের খুশিতে সে টুপ টুপ ক'রে ডুব দেয়, একবার ডুব দিয়ে উঠে সে যেন সামনের চরের প্রান্তে উদার আকাশের কোণে দেখতে পেলে তার মায়ের হাসিমুখ, আর একবার দেখলে বিয়ের ফুলশয্যার রাতে ছোবা খেলা করতে করতে উনি আড়চোখে তার দিকে চেয়েছিলেন, সেই সলজ্জ, সসঙ্কোচ হাসি মুখখানা।···:

জীবনে শুধু সুখ! শুধু আনন্দ! শুধু খাওয়া-দাওয়া, জলকেলি, হাসিখুশি, কন্দুকেলি, তাস নিয়ে বিস্তি খেলার ধুম! হি হি হি— কি মজা!

— হ্যাঁরে, ওকি ও বিরাজদিদি, অবহেলায় তুই জলে ডুব দিচ্ছিস্ কি মনে ক'রে?

অবাক হয়ে হিমি বললে কথাটা।

নিলু বললে— তাই তো, ছাখ বড়দি কাণ্ড। হ্যাঁরে চুল ভিজুলি যে, ওই চুলডার রাশ শুকুবে? কি আক্কেল তোর?

বিরাজের গ্রাহ্য নেই ওদের কথার দিকে। সে নিজের ভাবে নিজে বিভোরা, বললে—এই। একটা গান গাইবো শুনবি?

মনের বাসনা তোরে সবিশেষ শোন রে বলি—

হিমি বললে— ওরে চুপ, কে যেন আসচে— ভারিক্কি দলের কেউ—

নিস্তারিণী গুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ঘাটের ওপর এসে হাজির হোলো। সবাই একসঙ্গে তাকে দেখলে তাকিয়ে, কিন্তু কেউ কথা বললে না। এ গাঁয়ের ঝি-বৌদের অনেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে না, ওর সম্বন্ধে নানারকম কথা রটনা আছে পাড়ায় পাড়ায়। কেউ কিছু দেখে নি, বলতে পারে না, তবুও ওর পাড়ার রাস্তা দিয়ে একা একা বেরুনো, যার তার সঙ্গে (মেয়েমানুষদের মধ্যে) কথা বলা— এ সব নিয়ে ঘরে ঘরে কথা হয়েচে। এই সব জন্যেই কেউ ওর সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে চায় না সাহস ক'রে, পাছে ওর সঙ্গে কথা কইলে কেউ খারাপ বলে।

তিলু ও নিলুর সাতখুন মাপ এ গাঁয়ে। তিলু কোনো কিছু মেনে চলার মত মেয়েও নয়, সবাই জানে। কিন্তু মজাও এই, তার বা তাদের ক'বোনের নামে কখনো এ গাঁয়ে কিছু রটে নি। কেন তার কারণ বলা শক্ত। তিলু মমতাভরা চোখের দৃষ্টি নিস্তারিণীর দিকে তুলে বললে—আয় ভাই আয়। এত অবেলা?

নিস্তারিণী ঘাটভরা বৌ-ঝিদের দিকে একবার তাচ্ছিল্যভরা চোখে চেয়ে দেখে নিয়ে অনেকটা যেন আপন মনে বললে, তেঁতুল কুটতে কুটতে বেলাডা টের পাই নি!

—ওমা, আমরাও আজ তেঁতুল কুটছিলাম রে। নিলু আর আমি। আমাদের ওপর রাগ হয়েচে নাকি?

—সেডা কি কথা? কেন?

—আমাদের বাড়িতে যাস্ নি ক'দিন।

—কখন যাই বলো ঠাকুরঝি। ক্ষার সেদ্ধ করলাম, ক্ষার কাচলাম। চিঁড়ে কোটা, ধান ভানা সবই তো একা হাতে করচি। শাশুড়ী আজকাল আর লগি ছান না বড় একটা—

নিস্তারিণী সুরূপা বৌ, যদিও তার বয়েস হয়েচে এদের অনেকের চেয়ে বেশি। তার হাত পা নেড়ে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে চেপে কথাটা বলবার ভঙ্গিতে হিমি আর বিরাজ একসঙ্গে কৌতুকে হি হি ক'রে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথাকার একটা বাঁধ খুলে গেল, হাসির ঢেউয়ের রোল উঠলো চারিদিক থেকে।

হিমি বললে—নিস্তারদি কি হাসাতেই পারে। এসো না, জলে নামো না নিস্তারদি।

বিরাজ বললে—সেই গানটা গান না দিদি। নিধুবাবুর—কি চমৎকার গাইতে পারেন ওটা! বিধুদিদি যেটা গাইতো।

সবাই জানে নিস্তারিণী সুস্বরে গান গায়। হাসি গানে গল্পে মজলিস জমাতে ওর জুড়ি বৌ নেই গাঁয়ে। সেই জন্যেই মুখ ফিরিয়ে অনেকে বলে—অতট

ভালো না মেয়েমানুষের। যা রয় সয় সেভাই না ভালো।

নিস্তারিণী হাত নেড়ে গান ধরলে—

ভালবাসা কি কথার কথা সই
মন যার মনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িত লতা--
প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা—

সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।

কেমন হাতের ভঙ্গি, কেমন গলার সুর! কেমন চমৎকার দেখায় ওকে হাত নেড়ে নেড়ে গান গাইলে! একজন বললে—নীলবরণী গানটাও বড় ভালো গান আপনি।

নিস্তারিণীও খুশী হোলো। সে ভুলে গেল সাত বছর বয়েসে তার বাবা অনেক টাকা পণ পেয়ে শ্রোত্রিয় ঘরে মেয়েকে বিক্রি করেছিলেন—খুব বেশী টাকা, পঁচাত্তর টাকা। খোঁড়া স্বামীর সঙ্গে সে খাপখাইয়ে চলতে পারে নি কোনোদিন, শাশুড়ীর সঙ্গেও নয়। যদিও স্বামী তার ভালোই। শ্বশুর ভজগোবিন্দ বাঁড়ুয্যে আরো ভালো। কখনো ওর মতের বিরুদ্ধে যায় নি। ইদানীং গরীব হয়ে পড়েচে, খেতে পরতে দিতে পারে না, ছেলেমেয়েদের পেটপুরে ভাত জোটে না—তবুও নিস্তারিণী খুশী থাকে। সে জানে গ্রামে তাকে ভালোচোখে অনেকেই দেখে না, না দেখলে বয়েই গেল! কলা! যত সব কলাবতী বিদ্যেধরী সতীসাধ্বীর দল! মারো ঝাঁটা।

ও জলে নেমেচে। বিরাজ ওর সিক্ত সুঠাম দেহটা আদরে জড়িয়ে ধরে বললে—নিস্তারদিদি, সোনার দিদি!...কি সুন্দর গান, কি সুন্দর ভঙ্গি তোমার! আমি যদি পুরুষ হতুম, তবে তোর সঙ্গে দিদি পীরিতে পড়ে যেতুম—মাইরি বলচি কিন্তু—একদিন বনভোজন করবি চল্।

কেন হঠাৎ নিস্তারিণীর মনে অনেকদিন আগেকার ও ছবিটা ভেসে উঠলো? মনের অদ্ভুত চরিত্র। কখন কি ক'রে বসে সেটা কেউ বলতে পারে? সেই যে তার প্রণয়ীর সঙ্গে একদিন নদীর ধারে বসেছিল—সেই ছবিটা। আর একটা

খুব সাহসের কাজ ক'রে বসলো নিস্তারিণী। যা কখনো কেউ গাঁয়ে করে না, মেয়েমানুষ হয়ে। বললে—ঠাকুরজামাই ভালো আছেন, বড়দি ?

পুরুষের কথা একা এভাবে জিগ্যেস করা বেনিয়ম। তবে নিস্তারিণীকে সবাই জানে। ওর কাছ থেকে অদ্ভুত কিছু আসাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে।

পূজো প্রায় এসে গেল। ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে বসে গ্রামস্থ সজ্জনগণের মজলিস চলচে। তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার হবার উপক্রম হয়েচে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া। ব্রাহ্মণদের জন্যে একদিকে মাদুর পাতা, অন্য জাতির জন্যে অপর দিকে খেজুরের চ্যাটাই পাতা। মাঝখান দিয়ে যাবার রাস্তা।

নীলমণি সমাদ্দার বললেন—কালে কালে কি হোলো হে!

ফণি চক্কত্তি বললেন—ও সব হোলো হঠাৎ-বড়লোকের কাণ্ড। তুমি আমি করবোডা কি ? তোমার ভালো না লাগে, সেখানে যাবা না। মিটে গেল।

শ্যামলাল মুখুয্যে বললেন—তুমি যাবা না, আবাইপুরের বামুনেরা আসবে এখন। তখন কোথায় থাকবে মানডা ?

—কেন, কি রকম শুনলে ?

—গাঁয়ের ব্রাহ্মণ সব নেমতন্ন করবে এবার ওর বাড়ি দুর্গোৎসবে।

—আস্পদ্দাডা বেড়ে গিয়েচে ব্যাটার। ব্যাটা হঠাৎ-বড়লোক কিনা!

লালমোহন পাল গ্রামের কোনো লোকের কোনো সমালোচনা না মেনে মহাধুমধামে চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা তুললে। এবার অনেক দুর্গাপূজা এ গ্রামে ও পাশের সব গ্রামগুলিতে। প্রতি বছর যেমন হয়, গ্রামের গরীব দুঃখীরা পেটভরে নারকোলনাড়ু, সরু ধানের চিঁড়ে ও মুড়কি খায়। নেমতন্ন ক'বাড়ীতে খাবে ? সুক্তুনি, কচুরশাক, ডুমুরের ডালনা, সোনামুগের ডাল, মাছ ও মাংস, দই, রসকরা সব বাড়িতেই। লালমোহন পালের নিমন্ত্রণ এ গাঁয়ের কোনো ব্রাহ্মণ নেন নি। এ পর্যন্ত নালু পাল ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে এসেচে পরের বাড়িতে টাকা দিয়ে···কিন্তু তার নিজের বাড়িতেই ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে, এতে সমাজপতিদের মত হোলো না। নালু পাল হাত জোড় ক'রে

বাড়ি বাড়ি দাঁড়ালো, ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে একদিন এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ফুলবেঞ্চের বিচার চললো। শেষ পর্যন্ত ওর আপীল ডিস্‌মিস হয়ে গেল।

তুলসী এল ষষ্ঠীর দিন তিলু-নিলুর কাছে। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরনে, গলায় সোনার মুড়কি মাদুলি, হাতে যশম। গড় হয়ে তিলুর পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে বললে—হ্যাঁ দিদি, আমার ওপরে গাঁয়ের ঠাকুরদের এ কি অত্যাচার দেখুন!

—সে সব শুনলাম।

—ভাত কেউ খাবেন না। আমি গাওয়া ঘি আনিয়েচি, লুচি ভেজে খাওয়াবো। আপনি একটু জামাইঠাকুরকে বলুন দিদি। আপনাদের বাড়িতি তো হয়ই, আমার নিজের বাড়িতি পাতা পেড়ে বেরাহ্মণরা খাবেন, আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ুক আমার বাড়িতি, এ সাধ আমার হয় না? লুচি-চিনির ফলারে অমত কেন করবেন ঠাকুরমশাইরা?

ভবানী বাঁড়ুয্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিলুর মুখে সব শুনে তিনি বললেন—আমার সাধ্য না। এ কুলীনের গাঁয়ে ও সব হবে না। তবে আংরালি গদাধরপুর আর নসরাপুরের ব্রাহ্মণদের অনেকে আসবে। সেখানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বেশি। নালু পালকে তিনি সেইরকম পরামর্শ দিলেন।

নালু পাল হাত জোড় ক'রে বললে—আপনি থাকবেন কি না আমায় বলুন জামাইঠাকুর!

—থাকবো।

—কথা দেচ্চেন?

—নইলে তোমার এখানে আসতাম?

—ব্যাস। কোনো ব্রাহ্মণ-দেবতাকে আমার দরকার নেই, আপনি আর দিদিরা থাকলি ষোলকলা পুন্ন্য হোলো আমার।

—তা হয় না নালু। তুমি ওগাঁয়ের ব্রাহ্মণদের কাছে লোক পাঠাও, নয়তো নিজে যাও। তাদের মত নাও।

আংরালি থেকে এলেন রামহরি চক্রবর্তী বলে একজন ব্যক্তি আর নসরাপুর থেকে এলেন সাতকড়ি ঘোষাল। তাঁরা সমাজের দালাল। তাঁরা সন্ধির শর্ত

করতে এলেন নালু পালের সঙ্গে।

রামহরি চক্রবর্তীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে, বেঁটে, কালো, একমুখ দাড়ি গোঁফ। মাথার টিকিতে একটি মাতুলি। বাহুতে রামকবচ। বিদ্যা ঐ গ্রামের সেকালের হরু গুরুমশায়ের পাঠশালার নামতার ডাক পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ঘোষার সর্দার। অর্থাৎ নামতা ঘোষবার বা চেঁচিয়ে ডাক পড়াবার তিনিই ছিলেন সর্দার।

রামহরি সব শুনে বললেন—এই সাতকড়ি ভায়াও আছে। পালমশায়, আপনি ধনী লোক, আমরা সব জানি। কিন্তু আপনার বাড়িতে পাতা পাড়িয়ে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো, এ কখনো এ দেশে হয় নি। তবে তা আমরা দুজনে করিয়ে দেবো। কি বল হে সাতকড়ি?

সাতকড়ি ঘোষাল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের লোক, তবে বেশ ফর্সা আর একটু দীর্ঘাকৃতি। কৃশকায়ও বটে। মুখ দেখে মনে হয় নিরীহ, ভালোমানুষ, হয়তো কিছু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, সাংসারিক দিক থেকে।

সাতকড়ি মাথা নেড়ে বললেন—কথাই তাই।

—তুমি কি বলচ?

—আপনি যা করেন দাদা।

—তা হোলে আমি বলে দিই?

—দিন।

নালু পালের দিকে ফিরে রামহরি ডানহাতের আঙুলগুলো সব ফাঁক ক'রে তুলে দেখিয়ে বললেন—পাঁচ টাকা ক'রে লাগবে আমাদের দুজনের।

—দেবো।

—ব্রাহ্মণদের ভোজন-দক্ষিণে দিতি হবে এক টাকা।

—ওইটে কমিয়ে আট আনা করতি হবে।

—আর এক মালসা ছাঁদা দিতি হবে—লুচি, চিনি, নারকেলের নাড়ু। খাওয়ার আগে।

—তাও দেবো, কিন্তু দক্ষিণেটা আট আনা করুন।

—আমাদের পাঁচ টাকা করে দিতে হবে, খাওয়ার আগে কিন্তু। এর কম হবে না।

—তাই দেবো। তবে কম্‌সে কম একশো ব্রাহ্মণ এনে হাজির করতি হবে। তার কম হলি আপনাদের মান রাখতি পারবো না।

রামহরি চক্রবর্তী মাথার মাদুলিসুদ্ধ টিকিটা দুলিয়ে বললে—আলবৎ এনে দেবো। আমার নিজের বাড়িতিই তো ভাগ্নে, ভাগ্নীজামাই, তিন খুড়তুতো ভাই, আমার নিজের চার ছেলে, দুই ছোট মেয়ে—তারা সবাই আসবে। সাতকড়ি ভায়ারও শত্তুরের মুখি ছাই দিয়ে পাঁচটি, তারাও আসবে। একশোর অর্ধেক তো এখেনেই হয়ে গেল। গেল কিনা?

ক্ষমতা আছে রামহরি চক্রবর্তীর। ব্রাহ্মণভোজনের দিন দলে দলে ব্রাহ্মণ আসতে লাগলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে। বড় উঠোনে সামিয়ানার তলায় সকলের জায়গা ধরলো না। "দীয়তাং ভূজ্যতাং" ব্যাপার চললো। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি আর চিনি এক এক ব্রাহ্মণে যা টানলে! দেখবার মত হোলো দৃশ্যটা। কখনো এ অঞ্চলে এত বৃহৎ ও এত উচ্চশ্রেণীর ভোজ কেউ দেন নি। যে যত পারে পেট ভরে গরম লুচি, মালপুয়া, চিনি ও নারকোলের রসকরা দেওয়া হোলো—তার সঙ্গে ছিল বৈকুণ্ঠপুরের সোনা গোয়ালিনীর উৎকৃষ্ট শুকো দই, এদেশেরমধ্যে নামডাকী জিনিস। ব্রাহ্মণেরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো খেতে খেতেই। কে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললে—বাবা নালু, পড়াই ছিল কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে—

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই—

খাই নি কখনো। কে খাওয়াচ্ছে এ গরীব অঞ্চলে? তা আজ বাবা তোমার বাড়ী এসে খেয়ে—

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—যা বললেন, দাদামশাই। যা বললেন—

দক্ষিণা নিয়ে ও ছাঁদার মালসা নিয়ে ব্রাহ্মণের দল চলে গেলে দালাল রামহরি চক্রবর্তী নালু পালের সামনে এসে বললেন—কেমন পালমশাই? কি বলেছিলাম

আপনারে? ভাত ছড়ালি কাকের অভাব?

নালুপাল সঙ্কুচিত হয়ে হাত জোড় ক'রে বললে—ছি ছি, ও কথা বলবেন না! ওতে আমার অপরাধ হয়। আমার কত বড় ভাগ্যি আজকে, যে আজ আমার বাড়ি আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লো। আপনাদের দালালি নিয়ে যান। ক্ষ্যামতা আছে আপনাদের।

—কিছু ক্ষ্যামতা নেই। এ ক্ষ্যামতার কথা না পালমশাই। সত্যি কথা আর হক কথা ছাড়া রামহরি বলে না। তেমন বাপে জম্মো দেয় নি। লুচি চিনির ফলার এ অঞ্চলে ক'দিন ক'জনে খাইয়েচে শুনি? ঐ নাম শুনে সবাই ছুটে এসেচে। এ গাঁয়ের কেউ বুঝি আসে নি? তা আসবে না। এদের পায়া ভারি অনেক কিনা!

—একজন এসেচেন, ভবানী বাঁড়ুয্যে মশায়।

রামহরি আশ্চর্য হয়ে বললেন—কি রকম কথা! দেওয়ানজির জামাই?

—তিনিই।

—আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দ্যান না পালমশাই?

সব ব্রাহ্মণের খাওয়া চুকে যাওয়ার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে নিয়ে নিরিবিলি জায়গায় বসে আহার করছিলেন। খোকা জীবনে লুচি এই প্রথম খেলে। বলছিল—এরে লুচি বলে বাবা?

—খাও বাবা ভালো ক'রে। আর নিবি?

বালক ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

ভবানীর ইঙ্গিতে তিলু খানকতক গরম লুচি খোকার পাতে দিয়ে গেল। ভবানীকে তিলু ও নিলুই খাবার পরিবেশন করছিল। এমন সময় নালু পাল সেখানে রামহরি চক্রবর্তীকে নিয়ে ঢুকে ভোজনরত ভবানীর সামনে অথচ হাত-দশেক দূরে জোড়হাতে দাঁড়ালো।

—কি?

—ইনি এসেচেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতি।

রামহরি চক্রবর্তী প্রণাম ক'রে বললেন—দেখে বোঝলাম আজ কার মুখ

দেখেই উঠিচি।

ভবানী হেসে বললেন—খুব খারাপ লোকের মুখ তো?

—অমন কথাই বলবেন না জামাইবাবু। আমি যদি আগে জানতাম আপনি আর আমার মা এখেনে এসে খাবেন, তবে পালমশায়কে বলতাম আর অন্য কোনো বামুন এল না এল, আমার এলেই গেল। এমন নিধি পেয়ে আবার বামুন খাওয়ানোর জন্যি পয়সা খরচ? কই, মা কোথায়? ছেলে একবার না দেখে যাবে না যে, বার হও মা আমার সামনে।

তিলু আধঘোমটা দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই রামহরি হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বললেন—যেমন শিব, তেমনি শিবানী। দিনডা বড্ড ভালো গেল আজ পালমশাই। মা, ছেলেডারে মনে রেখো।

ভবানীকে তিলু ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—পুন্নিমের দিন আমাদের বাড়িতি দেবেন পায়ের ধুলো? খোকার জন্মদিনের পরবন্ন হবে। এসে খাবেন।

এই রকমই বিধি। পরপুরুষের সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম নেই, এমন কি সামনেও কথা বলবার নিয়ম নেই। একজনকে মধ্যস্থ ক'রে কথা বলা যায় কিন্তু সরাসরি নয়। ভবানী বুঝিয়ে বলবার আগেই রামহরি চক্রবর্তী বললেন—আমি তাই করবো মা। পরবন্ন খেয়ে আসবো। এ আমার ভাগ্যি। এ ভাগ্যির কথা বাড়ি গিয়ে তোমার বৌমার কাছে গল্প করতি হবে।

—তাঁকেও আনবেন না?

—না মা, সে সেকেলে। আপনাদের মত আজকালের উপযুক্ত নয়। সে পুরুষমানুষের সামনে বেরুবেই না। আমিই এসে আমার খোকন ভাইয়ের সঙ্গে পরবন্ন ভাগ করে খেয়ে যাবো আর আপনাদের গুণ গেয়ে যাবো।

নীলমণি সমাদ্দারের স্ত্রী আন্নাকালী তাঁর পুত্রবধূ সুবাসীকে বললেন—হ্যাঁ বৌমা, কিছু শুনলে নাকি গাঁয়ে? ও দিকির খবর?

পুত্রবধূ জানে শাশুড়ী ঠাকরুণ বলচেন, বড়লোকের বাড়ীর দুর্গোৎসবে কাঙালী নেমতন্নটা ফস্‌কে যাবে, না টিকে থাকবে! ওদের অবস্থা হীন

বলে এবং কখনো কিছু খেতে পায় না বলে ক্রিয়াকর্মের নিমন্ত্রণের আমন্ত্রণের দিকে ওদের নজরটা একটু প্রখর।

সুবাসী ভালোমানুষ বৌ। লাজুক আগে ছিল, এখন ক্রমাগত পরের বাড়িতে ধার চাইতে গিয়ে গিয়ে লজ্জা হারিয়ে ফেলেচে। খবরাখবর সেও কিছু সংগ্রহ করেচে। যা শুনেচে তাই বললে। গাঁয়ের ব্রাহ্মণেরা কেউ খাবে না নালু পালের বাড়ি।

আন্নাকালী বললে - যাও দিকি একবার স্বর্ণদের বাড়ি।

—তুমি যাবে মা?

—আমি ডাল বাটি। ডাল ক'টা ভিজতি দিয়েলাম, না বাটলি নষ্ট হয়ে যাবে, বচ্ছরের পোড়ানি তো উঠলোই না। শোন্ তোরে বলি বৌমা—

—কি মা?

আন্নাকালী এদিক ওদিক চেয়ে গলার সুর নিচু ক'রে বললেন—স্বর্ণকে বলে আয়, আর যদি কেউ না যায়, আমরা দু'ঘর লুকিয়ে যাবো একটু বেশী রাত্তিরি। তুই কি বলিস?

—ফণি জ্যাঠামশাই কি ওঁর বৌ দেখতি পেলি বাঁচবে?

—রাত হলি যাবো। কেডা টের পাচ্চে!

— এ গাঁয়ে গাছপালার কান আছে।

—তুই জেনে আয় তো।

সুবাসী গেল যতীনের বৌ স্বর্ণের কাছে। এরাও গাঁয়ের মধ্যে বড্ড গরীব। একরাশ থোড় কুটছে বসে বসে স্বর্ণ। পাশে দুটো ডেঙো ডাঁটার পাকা ঝাড়। সুবাসী বললে—কি রান্না করচো স্বর্ণদিদি?

—এসো সুবাসী। উনি বাড়ি নেই, তাই ভাবলাম মেয়েমান্ষির রান্না আর কি করবো, ডাঁটা শাকের চচ্চড়ি করি আর কলায়ের ডাল রাঁধি।

—সত্যি তো।

—বোস্ সুবাসী।

—বসবো না দিদি। শাশুড়ী বলে, পাঠালে, তোমরা কি তুলসীদিদিদের

বাড়ি নেমন্তন্নে যাবা ?

—ননদ তো বলছিল, যাবা নাকি বৌদিদি ? আমি বললাম, গাঁয়ের কোনো বামুন যাবে না, সেখানে কি করে যাই বল। তোরা যাবি ?

—তোমরা যদি যাও, তবে যাই।

—একবার নন্দরাণীকে ডেকে নিয়ে আয় দিকি।

যতীনের বোন নন্দরাণীকে ফেলে ওর স্বামী আজ অনেকদিন কোথায় চলে গিয়েচে। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। যতীনের বাবা ৺রূপলাল মুখুয্যে কুলীন পাত্রেই মেয়ে দিয়েছিলেন অনেক যোগাড়যন্ত্র করে। কিন্তু সে পাত্রটির আরো অনেক বিয়ে ছিল, একবার এসে কিছু প্রণামী আদায় করে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে যেতো। নন্দরাণীর ঘাড়ে দু'তিনটি কুলীন কন্যার বোঝা চাপিয়ে আজ বছর চার-পাঁচ একেবারে গা-ঢাকা দিয়েচে। কুলীনের ঘরে এই রকমই নাকি হয়।

নন্দরাণী পিঁড়ি পেতে বসে রোদে চুল শুকুচ্ছিল। সুবাসীর ডাকে সে উঠে এল। তিনজনে মিলে পরামর্শ করতে বসলো।

নন্দরাণী বললে—বেশি রাতে গেলি কেডা ত্যাখচে ?

স্বর্ণ বললে—তবে তাই চলো। তুলসীকে চটিয়ে লাভ নেই। আপদে বিপদে তুলসী বরং দেখে, আর কেডা দেখবে ? একঘরে করার বেলা সবাই আছে।

অনেক রাত্রে ওরা লুকিয়ে গেল তুলসীদের বাড়ি। তুলসী যত্ন করে খাওয়ালে ওদের। সঙ্গে এক এক পুঁটুলি ছাঁদা বেঁধে দিলে। যতীন সে রাত্রেই বাড়ি এল। স্বর্ণ এসে দেখলে, স্বামী শেকল খুলে ঘরের আলো জেলে বসে আছে। স্ত্রীকে দেখে বললে—কোথায় গিইছিলে ? হাতে ও কি ? গাইঘাটা থেকে দু'কাঠা সোনা মুগ চেয়ে আনলাম এক প্রজা-বাড়ি থেকে। ছেলেপিলে খাবে আনন্দ ক'রে। তোমার হাতে ও কি গা ?

—সে খোঁজে দরকার নেই। খাবে তো ?

—খিদে পেয়েচে খুব। ভাত আছে ?

—বোসো না। যা দিই খাও না।

স্বামীর পাতে অনেকদিন পরে সুখাদ্য পরিবেশন করে দিতে পেরে স্বর্ণ বড় খুশী হোলো। দরিদ্রের ঘরণী সে, শ্বশুর বেঁচে থাকতেও দেখেচে মোটা চালভাজা ছাড়া কোনো জলপান জুটতো না তাঁর। ইদানীং দাঁত ছিল না বলে স্বর্ণ শ্বশুরকে চালভাজা গুঁড়ো করে দিত।

যতীন বললে—বাঃ, এ সব পেলে কোথায় ?

—কাউকে বোলো না। তুলসীদের বাড়ি। তুলসী নিজে এসে হাত জোড় করে সেদিন নেমন্তন্ন করে গেল। বড্ড ভালো মেয়ে। ঠ্যাকার অংকার নেই এতটুকু।

—কে কে গিয়েছিলে ?

—নন্দরাণী আর সুবাসী। ছেলেমেয়েরা। তুলসী দিদি কি খুশি ! সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়ালে। আসবার সময় জোর করে এক মালসা লুচি চিনি ছাঁদা দিলে।

—ভালো করেচ। খেতে পায় না কিছু, কেডা দিচ্চে ভালো খেতি একটু ?

—যদি টের পায় গাঁয়ে ?

—ফাঁসি দেবে, না শূলে দেবে ? বেশ করেচ। নেমন্তন্ন করেছিল, গিয়েচ ? বিনি নেমন্তন্নে তো যাও নি।

—ঠাকুরজামাই ছিলেন। তিলুদিদি ছিল।

—ওদের কেউ কিছু বলতি সাহস করবে না। আমরা গরীব, আমাদের ওপর যত দোষ এসে পড়বে। তা হোক। পেট ভরে লুচি খেয়েচ ? ছেলেমেয়েদের খাইয়েচ ? ওদের জন্যে রেখে দ্যাও, সকালে উঠে খাবে এখন। কাউকে গল্প করে বেড়িও না যেখানে সেখানে। মিটে গেল। তুমি বেশ করে খেয়েচ কিনা বলো।

—না খেলি তুলসীদিদি শোনে ? হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। সুদ্ধ, বলবে, খ্যালেন না, পেট ভরলো না—

খোকার জন্মতিথিতে রামহরি চক্রবর্তী এলেন ভবানীর বাড়িতে। সঙ্গে তাঁর দুটি ছেলে। সঙ্গে নিয়ে এলেন খোকনের জন্যে স্ত্রীর প্রদত্ত সরু ধানের খই ও ক্ষীরের ছাঁচ। ভবানীর বাড়ির পশ্চিম পোতার ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছানো রয়েচে অতিথিদের জন্যে। বেশি লোক নয়, রামকানাই কবিরাজ, ফণি চক্কত্তি, শ্যাম মুখুয্যে, নীলমণি সমাদ্দার আর যতীন। মেয়েদের মধ্যে নিস্তারিণী, যতীনের স্ত্রী স্বর্ণ আর নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূ সুবাসী।

ফণি চক্কত্তি বললেন—আরে রামহরি যে! ভালো আছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রণাম দাদা। আপনি কেমন?

—আর কেমন! এখন বয়েস হয়েচে, গেলেই হোলো। বুড়োদের মধ্যি আমি আর নীলমণি দাদা এখনো ভালোই আছি, এবং টিকে আছি। আর তো একে একে সব চলে গেল।

—দাদার বয়েস হোলো কত?

—এই উনসত্তর যাচ্চে।

—বলেন কি? দেখলি তো মনে হয় না। এখনো দাঁত পড়ে নি।

—এখনো আধসের চালির ভাত খাবো। আধ কাঠা চিঁড়ের ফলার খাবো। আধখানা পাকা কাঁটাল এক জায়গায় বসে খাবো। দু'বেলা আড়াইসের দুধ খাই এখনো, খেয়ে হজম করি।

—সেই খাওয়ার ভোগ আছে বলে এখনো এমনডা শরীল রয়েচে। নইলি—

—আচ্ছা, একটা কথা বলি রামহরি। সেদিন কি কাণ্ডটা করলে তোমরা! সাতবেড়ে আর গদাধরপুরির বাঁওনদের কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? নেমন্তন্ন করেচে বলেই পাতা পাড়তি হবে যেয়ে শুদ্দুর বাড়ি! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণ তো? গলায় পৈতে রয়েচে তো? নাই বা হোলো কুলীন। কুলীন সকলে হয় না, কিন্তু মান অপমান জ্ঞান সবার থাকা দরকার।

কথাগুলোতে নীলমণি সমাদ্দার বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূও সেদিন যে বেশি রাত্রে লুকিয়ে ওদের বাড়ি গিয়ে ভোজ খেয়ে

এসেচে একথা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। পড়লেই বড় মুস্কিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ঠিক সেই সময় ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে ওদের খাবার জন্যে আহ্বান করলেন। কথা চাপা পড়ে গেল।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রামহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ফণি চক্কত্তি ও এঁরা খাবেন না। অন্য জায়গায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়ানো হোলো এবং শুধু তাই নয়, খোকাকে তার জন্মদিনের পায়েস খাওয়ানোর ভার পড়লো তাঁর ওপর। রামহরি চক্রবর্তীর পাশেই খোকার পিঁড়ি পাতা। ঘোমটা দিয়ে তিলু ওদের দুজনকে বাতাস করতে লাগল বসে।

রামহরি বললেন—তোমার নাম কি দাদু?

খোকা লাজুক সুরে বললে—শ্রীরাজ্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—কি পড়?

এবার উৎসাহ পেয়ে খোকা বললে—হরু গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ি। কলকাতায় থাকে শম্ভুদাদা, তার কাছে ইংরিজি পড়তি চেয়েচি, সে শেখাবে বলেচে।

—বাঃ বাঃ, এইটুকু ছেলে নাকি ইঙ্গিরি পড়বে! তবে তো তুমি দেশের হাকিম হবা। বেশ দাদু বেশ। হাকিম হওয়ার মত চেহারাখানা বটে।

—মা বলচে, আপনি আর কিছু নেবেন না?

—না, না, যথেষ্ট হয়েচে। তিনবার পায়েস নিইচি, আবার কি? বেঁচে থাকো দাদু।

বামুন ভোজনের দালাল রামহরি চক্রবর্তীকে এমন সম্মান কেউ দেয় নি কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে রামহরি তিলুকে প্রণাম করে বললেন—চলি মা, চেরডা কাল মনে থাকবে, আজ যা করলে মা আমার। এ যত্ন কখনো ভোলবো না। আজ বোঝলাম আপনারা এ দিগরের রামা শামার মত লোক নন। দু'হাত দু'পা থাকলি মানুষ হয় না মা। গলায় পৈতি ঝোলালি কুলীন ব্রাহ্মণ হয় না—

কত কি পরিবর্তন হয়ে গেল গ্রামে। রেল খুললো চাকদা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত। একদিন তিলু ও নিলু স্বামীর সঙ্গে আড়ংঘাটায় ঠাকুর দেখতে গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে। ওরা গরুর গাড়ি করে চাকদা পর্যন্ত এসে গঙ্গাস্নান করে সেখানে বেঁধেবেড়ে খেলে। সঙ্গে খোকা ছিল, তার খুব উৎসাহ রেলগাড়ি দেখবার। শেষকালে রেলগাড়ি এসে গেল। ওরা সবাই সেই পরমাশ্চর্য জিনিসটিতে চড়ে গেল আড়ংঘাটা। ফিরে এসে বছর খানেক ধরে তার গল্প আর ফুরোয় না ওদের কারো মুখে।

খোকা এদিকে পাঠশালার পড়া শেষ করলে। ভবানী একদিন তিলুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন ওকে ছাত্রবৃত্তি পড়িয়ে মোক্তারী পড়াবেন, না টোলে সংস্কৃত পড়তে দেবেন। মোক্তারী পড়লে সতীশ মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

তিলু বললে—নিলুকে ডাকো।

নিলুর আর সে স্বভাব নেই। এখন সে পাকা গিন্নী। সংসারের সব কাজ নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে করতে ওর জুড়ি নেই। সে এসে বললে—টুলুকে জিগ্যেস করো না? আহা, কি সব বুদ্ধি!

টুলুর ভালো নাম রাজেশ্বর! সে গম্ভীর স্বভাবের ছেলে, চেহারা খুব সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি। বাবাকে বড় ভালোবাসে। বিশেষ পিতৃভক্ত। সে এসে হেসে বললে—বাবা বলো না? আমি কি জানি? আর ছোট মা তো কিছু জানেই না। কলের গাড়িতে উঠে সেদিন দেখলে না? পান সাজতে বসলো। রানাঘাট থেকে কলের গাড়ি ছাড়লো তো টুক করে এলো আড়ংঘাটা। আর ছোট মা'র কি কষ্ট! বললে, দুটো পান সাজতি সাজতি গাড়ি এসে গেল তিনকোশ রাস্তা! হি-হি—

নিলু বললে—তা কি জানি বাবা, আমরা বুড়োসুড়ো মানুষ। চাকদাতে আগে আগে গঙ্গাস্নান করতি য্যাতাম পানের বাটা নিয়ে পান সাজতি সাজতি। অন হাসতি হবে না তোমারে—

—আমি অন্যায় কি বল্লাম? তুমি কি জানো পড়াশুনোর? মা তবুও সংস্কৃত

পড়েচে কিছু কিছু। তুমি একেবারে মুকখু।

—তুই শেখাস আমায় খোকা।

—আমি শেখাবো? এই বয়সে উনি ক, খ, অ, আ—ভারি মজা!

—তোরে ছানার পায়েস খাওয়াবো ওবেলা।

—ঠিক?

—ঠিক।

—তাহলি তুমি খুব ভালো। মোটেই মুকখু না।

ভবানী বললেন—আঃ, এই টুলু! ওসব এখন রাখো। আসল কথার জবাব দে।

—তুমি বলো বাবা।

—কি ইচ্ছে তোমার?

এই সময় নিলু আবার বললে—ওকে মোক্তারি-টোক্তারি করতি দিও না। ইংরিজি পড়াও ওকে। কলকেতায় পাঠাতি হবে। ওই শম্ভু ছাখো কেমন করেচে কলকেতায় চাকরি করে। তার চেয়ে কম বুদ্ধিমান কি টুলু?

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—কি বলো খোকা?

—ছোট মা ঠিক বলেচে। তাই হোক বাবা। মা কি বলো? ছোট মা ঠিক বলে নি?

নিলু অভিমানের সুরে বললে—কেন মুক্‌খু যে? আমি আবার কি জানি?

টুলু বললে—না ছোট মা। হাসি না। তোমার কথাডা আমার মনে লেগেচে। ইংরিজি পড়তি আমারও ইচ্ছে—তাই তুমি ঠিক করো বাবা! ইংরিজি শেখাবে কে?

নিলু বললে—তা আমি কি করে বলবো? সেডা তোমরা ঠিক কর।

তাই তো, কথাডা ঠিক বলেচে খোকা। ইংরিজি পড়বে কার কাছে খোকা। গ্রামে কেউ ইংরিজি জানে না, কেবল জানে ইংরিজি-নবীশ শম্ভু রায়। সে বহুকাল থেকে আমুটি কোম্পানীর হৌসে কাজ করে, সায়েব-সুবোদের সঙ্গে ইংরিজি বলে। গাঁয়ে এজন্যে তার খুব সম্মান—মাঝে মাঝে

অকারণে গাঁয়ের লোকদের সামনে ইংরিজি বলে বাহাদুরি নেবার জন্যে।

তিলু হেসে বললে—এই খোকা, তোর শম্ভুদাদা কেমন ইংরিজি বলে রে?

—ইট্ সেইস্ট মাট্ ফুট্—ইট স্নটু-ফুট্-ফিট্—

ভবানী বললেন—বা রে! কখন শিখলি এত?

টুলু বললেন—শুনে শিখিচি। বলে তাই শুনি কিনা। যা বলে, সেরকম বলি।

ভবানী বললেন—সত্যি, ঠিক ইংরিজি শিখেচে দ্যাখো। কেমন বলচে।

নিলু বললে—সত্যি, ঠিক বলচে তো!

তিনজনেই খুব খুশি হোলো খোকার বুদ্ধি দেখে। খোকা উৎসাহ পেয়ে বললে—আমি আরো জানি, বলবো বাবা? সিট্ এ হিপ্-সিট্-ফুট-এ পট-আই মাই—ও বাবা এ দুটো কথা খুব বলে আই আর মাই—সত্যি বলচি বাবা—

নিলু অবাক হয়ে ভাবলে—কি আশ্চর্য বুদ্ধিমান তাদের খোকা।

প্রসন্ন চক্রবর্তী নীলকুঠির চাকরি যাওয়ার পরে দু'বছর বড় কষ্ট পেয়েচে। আমীনের চাকরি জোটানো বড় কষ্ট। বসে বসে সংসার চলে কোথা থেকে। অনেক সন্ধানের পর বর্তমান চাকরিটা জুটে গিয়েচে বটে কিন্তু নীলকুঠির মত অমন সুখ আর কোথায় পাওয়া যাবে চাকরির? তেমন ঘরবাড়ি, তেমন পসার-প্রতিপত্তি দিশী জমিদারের কাছারীতে হবে না, হতে পারে না। চার বছর তবু কাটলো এদের এখানকার চাকরিতে। এটা পাল এস্টেটের বাহাদুরপুরের কাছারী। সকালে নায়েব ঘনশ্যাম চাকলাদার পাল্কি করে বেরিয়ে গেলেন চিতলমারির খাসখামারের তদারক করতে। প্রসন্ন আমীন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এরা নতুন মনিব, অনেক বুঝে চলতে হয় এদের কাছে, আর সে রাজারাম দেওয়ানও নেই, সেই নরহরি পেশ্কারও নেই, সে বড়সায়েবও নেই। নায়েবের চাকর রতিলাল নাপিত ঘরে ঢুকে বললে—ও আমীনবাবু, কি করচেন?

—এই বসে আছি। কেন?

—নায়েববাবুর হাঁসটা এদিকি এয়েল? দেখেচেন?

—দেখি নি।

—তামাক খাবেন ?

—সাজ, দিকি এট্টু।

রতিলাল তামাক সেজে নিয়ে এল। সে নিজে নিয়ে না এলে নায়েবের চাকরকে হুকুম করার মত সাহস নেই প্রসন্ন চক্রবর্তীর।

রতিলাল বললে—আমীনবাবু, সকালে তো মাছ দিয়ে গেলো না গিরে জেলে ?

—দেবার কথা ছিল ? গিরে কাল বিকেলে হাটে মাছ বেচছিল দেখেচি। আড় মাছ।

—রোজ তো দ্যায়, আজ এলো না কেন কি জানি ? নায়েবমশায় মাছ না হলি ভাত খেতি পারেন না মোটে। দেখি আর খানিক। যদি না আনে, জেলেপাড়া পানে দৌড়ুতি হবে মাছের জন্যি।

রতিলালের ভ্যাজ ভ্যাজ ভালো লাগছিল না প্রসন্ন চক্কত্তির। তার মন ভালো না আজ, তাছাড়া নায়েবের চাকরের সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করবার প্রবৃত্তি হয় না। আজই না হয় অবস্থার বৈগুণ্যে প্রসন্ন চক্কত্তি এখানে এসে পড়েচে বেঘোরে, কিন্তু কি সম্মানে ও রোবদাবে কাটিয়ে এসেচে এতকাল মোল্লাহাটির কুঠিতে, তা তো ভুলতে পারচে না সে।

আপদ বিদায় করার উদ্দেশ্যে প্রসন্ন আমীন তাড়াতাড়ি বললে—তা মাছ যদি নিতি হয়, এই বেলা যাও, বেশি বেলা হয়ে গেলি মাছ সব নিয়ে যাবে এখন সোনাখালির বাজারে।

—যাই, কি বলেন ?

—এখুনি যাও। আর দ্রিং কোরো না।

রতিলাল চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সে মাছের খাড়ুই হাতে বার হয়ে গেল কাছারীর হাতা থেকে। প্রসন্ন চক্কত্তির মন শান্ত হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। রোদে বসে তেল মেখে এইবার নেয়ে নেওয়া যাক। কাঁঠাল গাছতলায় রোদে পিঁড়ি পেতে সে রাঙা গামছা পরে তেল মাখতে বসলো। স্নান সেরে এসে রান্না করতে হবে।

কত বেগুন এ সময়ে দিয়ে যেতো প্রজারা। বেগুন, ঝিঙে, নতুন মূলো। শুধু তাকে নয়, সব আমলাই পেতো। নরহরি পেশকার তাকে সব তার পাওনা দিনিস দিয়ে বলতো,—প্রসন্নদা, আপনি হোলেন ব্রাহ্মণ মানুষ। রান্নাভা আপনাদের বংশগত জিনিস। আমার দুটো ভাত আপনি রেঁধে রাখবেন দাদা।

সুবিধে ছিল। একটা লোকের জন্যে রাঁধতেও যা, দুজন লোকের রাঁধতেও প্রায় সেই খরচ, টাকা তিন-চার পড়তো দুজনের মাসিক খরচ। নরহরি চাল ডাল সবি যোগাতো। চমৎকার খাঁটি দুধটুকু পাওয়া যেতো, এ ও দিয়ে যেতো, পয়সা দিয়ে বড় একটা হয় নি জিনিস কিনতে। আহা, গয়ার কথা মনে পড়ে।

গয়া!…গয়ামেম!

না। তার কথা ভাবলেই কেন তার মন ওরকম খারাপ হয়ে যায়? গয়ামেম তার দিকে ভালো চোখে তাকিয়েছিল। দুঃখের তো পারাপার নেই জীবনে. ছেলেবেলা থেকেই দুঃখের পেছনে ধোঁয়া দিতে দিতে জীবনটা কেটে গেল। কেউ কখনো হেসে কথা বলে নি, মিষ্টি গলায় কেউ কখনো ডাকে নি। গয়া কেবল সেই সাধটা পূর্ণ করেছিল জীবনের। অমন সুঠাম সুন্দরী, একরাশ কালো চুল। বড়সায়েবের আদরিণী আয়া গয়ামেম তার মত লোকের দিকে যে কেন ভালো চোখে চাইবে—এর কোন হেতু খুঁজে মেলে? তবু সে চেয়েছিল।

কেমন মিষ্টি গলায় ডাকতো—খুড়োমশাই, অ খুড়োমশাই—

বয়েসে সে বুড়ো ওর তুলনায়। তবু তো গয়া তাকে তাচ্ছিল্য করে নি। কেন করে নি? কেন ছলছুতো খুঁজে তার সঙ্গে গয়া হাসিমস্করা করতো, কেন তাকে প্রশয় দিত? কেন অমন ভাবে সুন্দর হাসি হাসতো তার দিকে চেয়ে? কেন তাকে নাচিয়ে ও অমন আনন্দ পেতো? আজকাল গয়া কেমন আছে? কতকাল দেখা হয় নি। বড় কষ্টে পড়েচে হয়তো, কে জানে? কত দিন রাত্রে মন-কেমন করে ওর জন্যে। অনেক কাল দেখা হয় নি।

—ও আমীনমশাই, মাছ প্যালাম না—

রতিলালের মাছের খাড়ুই হাতে প্রবেশ। সর্বশরীর জ্বলে গেল প্রসন্ন চক্কত্তির। আ মোলো যা, আমি তোমার এয়ার, তোমার দরের লোক? ব্যাটা জলটানা

বাসন-মাজা চাকর, সমানে সমানে আজ খোশগল্প করতে এসেচে একগাল দাঁত বার করে তার সঙ্গে। চেনে না সে প্রসন্ন আমীনকে? দিন চলে গিয়েচে, আজ বিষহীন ঢোঁড়া সাপ প্রসন্ন চক্কত্তি এ কথার উত্তর কি করে দেবে? সে মোল্লাহাটির নীলকুঠি নেই, সে বড়সায়েব শিপ্‌টনও নেই, সে রাজারাম দেওয়ানও নেই।

নীলকুঠির আমলে শাসন বলে জিনিস ছিল, লোকে ভয়ে কাঁপতো লাল মুখ দেখলে, এসব দিশী জমিদারের কাছারীতে ভূতের কেত্তন। কেউ কাকে মানে? মারো ঝুশো ঝাঁট্টা।

বিরক্তি সহকারে আমীন রতিলালের কত্তার উত্তরে বললে—ও। নীরস কণ্ঠেই বলে।

রতিলাল বললে—তেল মাখচেন?

—হু।

—নাইতি যাবেন?

—হুঁ।

—কি রান্না করবেন ভাবচেন?

—কি এমন আর? ডাল আর উচ্ছেচচ্চড়ি। ঘোল আছে।

—ঘোল না থাকে দেবানি। সনকা গোয়ালিনী আধ কলসী মাঠাওয়ালা ঘোল দিয়ে গিয়েচে। নেবেন?

—না, আমার আছে।

বলেই প্রসন্ন চক্কত্তি রতিলালকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি গামছা কাঁধে নিয়ে ইছামতীতে নাইতে চলে গেল। কি বিপদই হয়েছে। ওর সঙ্গে এখন বক্ বক্ করো বসে বসে। খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। ব্যাটা বেয়াদবের নাজির কোথাকার।

রান্না করতে করতেও ভাবে, কতদিন ধরে সে আজ একা রান্না করচে। বিশ বছর? না, তারও বেশি। স্ত্রী সরস্বতী সাধনোচিত ধামে গমন করেচেন বহুদিন। তারপর থেকেই হাঁড়িবেড়ি হাতে উঠেচে। আর নামলো কই? রান্না করলে

যা রোজই রেঁধে থাকে প্রসন্ন, তার অতি প্রিয় খাদ্য। খুব বেশি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাসকলাইয়ের ডাল, উচ্ছেভাজা। ব্যস ! হয়ে গেল। কে বেশি ঝঞ্ঝাট করে। তার আবিশ্যি ঘোল আছে।

—ডাল রান্না করলেন নাকি ?

জলের ঘটি উঁচু করে আলগোছে খেতে খেতে প্রায় বিষম খেতে হয়েছিল আর কি ! কোথাকার ভূত এ ব্যাটা, দেখচিস একটা মানুষ তেওপ্পরে দুটো খেতে বসেচে। এক ঘটি জল খাচ্চে, ঠিক সেই সময় তোমার কথা না বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল. না ? তোমার বাপের জমিদারি লাটে উঠেছিল. বদমাইশ পাজি ? বিরক্তির সুরে জবাব দেয় প্রসন্ন চক্কত্তি—হুঁ। কেন ?

—কিসের ডাল ?

—মাসকলাইয়ের।

—আমারে একটু দেবেন ? বাটি আনবো ?

—নেই আর। এক কাঁসি রেঁধেছিলাম, খেয়ে ফেললাম।

—আমি যে ঘোল এনিচি আপনার জন্যি—

—আমার ঘোল আছে। কিনিছিলাম।

—এ খুব ভালো ঘোল। সনকা গোয়ালিনীর নামডাকী ঘোল। বিষ্টু ঘোষের বিধবা দিদি। চেনেন ? মাঠাওয়ালা ঘোল ও ছাড়া কেউ কত্তি জানেও না। খেয়ে দ্যাখেন।

নামটা বেশ। মরুক গে। ঘোল খারাপ করে নি। বেশ জিনিসটা। এ গাঁয়ে থাকে সনকা গোয়ালিনী ? বয়েস কত ?

এক কল্কে তামাক সেজে খেয়ে প্রসন্ন একটু শুয়ে নিলে ময়লা বিছানায়। সবে সে চোখ একটু বুজেচে, এমন সময় পাইক এসে ডাক দিলে—নায়েবমশাই ডাকচেন আপনারে—

ধড়মড় করে উঠে প্রসন্ন চক্কত্তি কাছারীঘরে ঢুকলো। অনেক প্রজার ভিড় হয়েচে। আমীনের জরীপী চিঠার নকল নিতে এসেচে আট-দশটি লোক। নায়েব ঘনশ্যাম চাকলাদার রাশভারি লোক, পাকা গোঁপ, মুখ গম্ভীর, মোটা ধুতি পরনে,

কোঁচার মুড়ো গায়ে দিয়ে ফরাসে বসেছিলেন আধময়লা একটা গির্দে হেলান দিয়ে। রূপো বাঁধানো ফর্সিতে তামাক দিয়ে গেল রতিলাল নাপিত।

আমীনের দিকে চেয়ে বললেন—খাসমহলের চিঠা তৈরি করেচেন?

—প্রায় সব হয়েচে। সামান্য কিছু বাকি।

—ওদের দিতি পারবেন? যাও, তোমরা আমীনমশাইয়ের কাছে যাও। এদের একটু দেখে দেবেন তো চিঠাগুলো। দূর থেকে এসেচে সব, আজই চলে যাবে।

প্রসন্ন চক্কত্তি বহুকাল এই কাজ করে এসেচে, গুড়ের কলসীর কোন্ দিকে সার গুড় থাকে আর কোন্ দিকে ঝোলাগুড় থাকে, তাকে সেটা দেখাতে হবে না। খাসমহলের চিঠা তৈরি থাকলেই কি আর সব গোলমাল মিটে যায়? সীমানা সরহদ্দ নিয়ে গোলমাল থাকে, অনেক কিছু গোলমাল থাকে, চিঠাতে নায়েবের সই করাতে হবে—অনেক কিছু হাঙ্গামা। এখন অবেলায় অত শত কাজ কি হয়ে উঠবে? বলা যায় না। চেষ্টা করে অবিশ্যি দেখা যাক।

নীলকুঠির দিনে এমন সব ব্যাপারে দু'পয়সা আসতো। সে সব অনেক দিনের কথা হোলো। এখন যেন মনে হয় সব স্বপ্ন।

প্রজাদের তরফ থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—করে গান আমীনবাবু! আপনারে পান খেতি কিছু দেবো এখন—

—কিছু কত?

—এক আনা করে মাথা পিছু দেবো এখন।

প্রসন্ন চক্কত্তি হাতের খেরো বাঁধা দপ্তর নামিয়ে রেখে বললে—তাহলি এখন হবে না। তোমার নায়েব মশাইকে গিয়ে বলতি পারো। চিঠে তৈরি হয়েচে বটে, এখনো সাবেক রেকর্ডের সঙ্গে মেলানো হয় নি, সই হয় নি। এখনো দশ পনেরো দিন কি মাস খানেক বিলম্ব। চিঠে তৈরি থাকলিই কাজ ফতে হয় না। অনেক কাঠ খড় পোড়াতি হয়।

প্রজাদের মোড়ল বিনীত ভাবে বললে—তা আপনি কত বলেচো আমীনবাবু?

সেও অভিজ্ঞ লোক, আইন আদালত জমিদারি কাছারীর গতিক এবং নাড়ী বিলক্ষণ জানে। কেন আমীনবাবু বেঁকে দাঁড়িয়েচে তাকে বোঝাতে হবে না।

প্রসন্ন চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বললে—না না, সে হবে না। তোমরা নায়েবের কাছেই যাও—আমার কাজ এখনো মেটে নি। দেরি হবে দশ-পনেরো দিন।

মোড়ল মশাই হাতজোড় করে বললে—তা মোদের উপর রাগ করবেন না আমীন মশাই। ছ' পয়সা করে মাথা-পিছু দেবানি—

—ছ' আনার এক কড়ি কম হলি পারবো না।

—গরীব মরে যাবে তাহলি—

—না। পারবো না।

বাধ্য হয়ে দশজন প্রজার পাঁচসিকে মোড়ল মশাইকে ভালো ছেলের মত সুড়সুড় করে এগিয়ে দিতে হোলো প্রসন্ন চক্কত্তির হাতে। পথে এসো বাপধন। চক্কত্তিকে আর কাজ শেখাতি হবে না ঘনশ্যাম চাকলাদারের। কি করে উপরি রোজগার করতে হয়, নীলকুঠির আমীনকে সে কৌশল শিখতে হবে পচা জমিদারি কাছারীর আমলার কাছে? শাসন করতে এসেছেন! দেখেচিস শিপ্‌টন্ সাহেবকে?

বেলা তিন প্রহর। ঘনশ্যাম চাকলাদার আবার ডেকে পাঠালেন প্রসন্ন চক্কত্তিকে। ঘনশ্যাম নায়েব অত্যন্ত কর্মঠ, দুপুরে ঘুম অভ্যেস নেই, গির্দে বালিশ বুকে দিয়ে জমার খাতা সই করবেন, পেশ্‌কার কাছে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টে দিচ্চে। ফর্সিতে তামাক পুড়চে।

প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে চেয়ে বললে—ওদের চিঠা দিয়ে দেলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ঘোড়া চড়তি পারেন?

—আজ্ঞে।

—এখুনি একবার রাহাতুনপুর যেতি হচ্চে আপনাকে। বিলাতালি সর্দার আর ওসমান গনির মামলায় আপনি প্রধান সাক্ষী হবেন। সরেজমিন দেখে

আসুন। সেখানে নকুড় কাপালী কাছারীর পক্ষে উপস্থিত আছে। সে আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবে। ওসমান গনির ভিটের পেছনে যে শিমূলগাছটা আছে---সেটা কত চেন রাস্তা থেকে হবে মেপে আসবেন তো।

—চেন নিয়ে যাবো?

—নিয়ে যান। আমার কানকাটা ঘোড়াটা নিয়ে যান, ছাড় ভোক দেবেন না, বাঁ পায়ে ঠোকা মারবেন পেটে। খুব দৌড়ুবে।

এখন অবেলায় আবার চল রাহাতুনপুর! সে কি এখানে! ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। নকুড় কাপালী সেখানে সব শেখাবে প্রসন্ন চক্কত্তিকে! হাসিও পায় সে কি জানে জরীপের কাজের? আমীনের পিছু পিছু খোঁটা নিয়ে দৌড়োয়, বড়সায়েব যাকে বলতো 'পিনম্যান', সেই নকুড় কাপালী জরীপের খুঁটিনাটি তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে তাকে, যে পঁচিশ বছর এক কলমে কাজ চালিয়ে এল সাহেব-সুবোদের কড়া নজরে! শালুক চিনেচেন গোপাল ঠাকুর। নকুড় কাপালী।

ঘোড়া বেশ জোরেই চললো যশোর চূয়াডাঙ্গার পাকা সড়ক দিয়ে। আজকাল রেল লাইন হয়ে গিয়েচে এদিকে। ক্রোশ খানেক দূর দিয়ে রেল গাড়ি চলাচল করচে, ধোঁয়া ওড়ে, শব্দ হয়, বাঁশি বাজে। একদিন চড়তে হবে রেলের গাড়িতে। ভয় করে। এই বুড়ো বয়েসে আবার একটা বিপদ বাধবে ও সব নতুন কাণ্ডকারখানার মধ্যে গিয়ে? মানিক মুখুয্যে মুহুরী সেদিন বলছিল, চলুন আমীন মশাই, একদিন কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করে আসা যাক রেলগাড়িতে চড়ে। ছ' আনা নাকি ভাড়া রাণাঘাট পর্যন্ত। সাহস হয় না।

বড় বড় শিউলি গাছের ছায়া পথের দু'ধারে, শ্যামলতা ফুলের সুগন্ধ যেন কোন বিস্মৃত অতীত দিনের কার চুলের গন্ধের মত মনে হয়। কিছুই আজ আর মনে নেই। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। হাতও খালি। সামনে কতদিন বেঁচে থাকতে হবে, কি করে চলবে, অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকলে কে দেবে খেতে? কেউ নেই সংসারে। বুড়ো বয়েসে যদি চেন টেনে জমি মাপামাপির খাটাখাটুনি না করতে পারে মাঠে মাঠে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, তবে কে দু'মুঠো ভাত

দেবে ? কেউ নেই। সামনে অন্ধকার। যেমন অন্ধকার ওই বাঁশঝাড়ের তলায় তলায় জমে আসবে আর একটু পরে।

রাহাতুনপুর পৌঁছে গেল ঘোড়া তিন ঘণ্টার মধ্যে। প্রায় এগারো ক্রোশ পথ। এখানে সকলেই ওকে চেনে। নীলকুঠির আমলে কতবার এখানে সে আর কারকুন আসতো নীলের দাগ মারতি। এখানে একবার দাঙ্গা হয় দেওয়ান রাজারাম রায়ের আমলে। খুব গোলমাল হয়, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন প্রজাদের দরখাস্ত পেয়ে।

বড় মোড়ল আবদুল লতিফ মারা গিয়েচে, তার ছেলে সামসুল এসে প্রসন্ন চক্কত্তিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। বেলা এখনো দণ্ড-দুই আছে। বড় রোদে ঘোড়া ছুটিয়ে আসা হয়েচে।

সামসুল বললে—সালাম, আমীনমশায়। আজকাল কনে আছেন ?

—তোমাদের সব ভালো ? আবদুল বুঝি মারা গিয়েচে ? কদ্দিন ? আহা, বড্ড ভালো লোক ছিল। আমি আছি বাহাদুরপুরি। বড্ড দূর পড়ে গিয়েচে, কাজেই আর দেখাশুনো হবে কি করে বলো।

—তামাক খান। সাজি।

—নকুড় কাপালী কোথায় আছে জানো ? তাকে পাই কোথায় ?

—বাঁওড়ের ধারে যে খড়ের চালা আছে, জরীপির সময় আমীনের বাসা হয়েল, সেখানে আছেন। ঠেঙোয়।

প্রসন্ন চক্কত্তি অনেকক্ষণ থেকে কিন্তু একটা কথা ভাবচে। পুরনো কুঠিটা আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

বেলা পড়ে এসেচে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোল্লাহাটির নীলকুঠি এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে এক ঘণ্টা। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে ঘোড়া। খানিক ভেবেচিন্তে ঘোড়ায় চড়ে সে রওনা হোলো মোল্লাহাটি। অনেকদিন সেখানে যায় নি। ধুঁধুঁল বনে হলদে ফুল ফুটেচে, জিউলি গাছের আঁটা ঝরচে কাঁচা কদমার শাকের মত। হু হু হাওয়া ফাঁকা মাঠের ওপার থেকে মড়িঘাটার বাঁওড়ের কুমুদ ফুলের গন্ধ বয়ে আনচে। শেঁয়াকুল কাঁটার

ঝোপে বেজি খস খস করচে পথের ধারে।

জীবনটা ফাঁকা, একদম ফাঁকা। মড়িঘাটার ওই বড় মাঠের মত। কিছু ভালো লাগে না। চাকরি করা চলচে, খাওয়া-দাওয়া চলচে, সব যেন কলের পুতুলের মত। ভালো লাগে না। করতে হয় তাই করা। কি যেন হয়ে গিয়েচে জীবনে।

সন্ধ্যা হোলো পথেই। পঞ্চমীর কাটা চাঁদ কুমড়োর ফালির মত উঠেচে পশ্চিমের দিকে। কি কড়া তামাক খায় ব্যাটারা। ওই আবার দেয় নাকি মানুষকে খেতে? কাসির ধাক্কা এখানো সামলানো যায় নি।

দিগন্তের মেখলা-রেখা বন-নীল দূরত্বে বিলীন। অনেকক্ষণ ঘোড়া চলেচে। ঘেমে গিয়েচে ঘোড়ার সর্বাঙ্গ। এইবার প্রসন্ন চক্কত্তির চোখে পড়লো দূরে উঁচু সাদা নীলকুঠিটা দীর্ঘ দীর্ঘ ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে। প্রসন্ন আমীনের মনটা ফুলে উঠলো। তার যৌবনের লীলাভূমি, তার কতদিনের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার জায়গা, কত পয়সা হাত ফেরতা হয়েচে ওই জায়গায়। আজকাল নিশাচরের আড্ডা। লালমোহন পাল ব্যবসায়ী জমিদার, তার হাতে কুঠির মান থাকে?

প্রসন্ন চক্কত্তির হঠাৎ চমক ভাঙলো। সে রাস্তা ভুল করে এসে পড়েচে কুঠি থেকে কিছুদূরের গোরস্থানটার মধ্যে। দু'পাশে ঘন বন বাগান, বিলিতি কি সব বড় বড় গাছ রবসন্ সায়েবের আমলে এনে পোঁতা হয়েছিল, এখন ঘন অন্ধকার জমিয়ে এনেচে গোরস্থানে। ওইটে রবসন্ সায়েবের মেয়ের কবর। পাশে ওইটে ডানিয়েল সায়েবের। এ সব সায়েবকে প্রসন্ন চক্কত্তি দেখে নি। নীলকুঠির প্রথম আমলে রবসন্ সায়েব ঐ বড় সাদা কুঠিটা তৈরি করেছিল গল্প শুনেচে সে।

কি বনজঙ্গল গজিয়েচে কবরখানার মধ্যে। নীলকুঠির জমজমাটের দিনে সায়েবদের হুকুমে এই কবরখানা থেকে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেতো, আর আজকাল কেই বা দেখচে আর কেই বা যত্ন করচে এ জায়গার?

ঘোড়াটা হঠাৎ যেন থমকে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তি সামনের দিকে তাকালে, ওর সারা গা ডোল দিয়ে উঠলো। মনে ছিল না, এইখানেই আছে শিপ্‌টন্ সায়েবের

কবরটা। কিন্তু কি ওটা নড়চে সাদা মতন? বড়সাহেব শিপ্‌টনের কবরখানায় লম্বা লম্বা উলুখড়ের সাদা ফুলগুলোর আড়ালে?

নির্জন কুঠির পরিত্যক্ত কবরখানা, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঢাকা। প্রেত-যোনির ছবি স্বভাবতই মনে না এসে পারে না, যতই সাহসী হোক আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তী। সে ভীতিজড়িত আড়ষ্ট অস্বাভাবিক সুরে বললে—কে ওখানে? কে ও? কে গা?

শিপ্‌টন্ সাহেবের সমাধির উলুখড়ের ফুলের ঢেউয়ের আড়াল থেকে একটি নারীমূর্তি চকিত ও ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে রইল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় পাথরের মূর্ত্তিরই মত।

—কে গা? কে তুমি?

—কে? খুড়োমশাই! ও খুড়োমশাই!

ওর কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়ের সুর। আরও এগিয়ে এসে বললে—আমি গয়া।

প্রসন্নর মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনো কথা বার হোলো না বিস্ময়ে। সে তাড়াতাড়ি রেকাবে পা দিয়ে নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে, আহ্লাদের সুরে বললে—গয়া! তুমি! এখানে? চলো চলো, বাইরে চলো, এ জঙ্গল থেকে—এখানে কোথায় এইছিলে?

জ্যোৎস্নায় প্রসন্ন দেখলে গয়ার চোখের কোণে জলের রেখা। এর আগেই সে কাঁদছিল ওখানে বসে বসে এই রকম মনে হয়। কান্নার চিহ্ন ওর চোখেমুখে চিকচিকে জ্যোৎস্নায় সুস্পষ্ট।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—চলো গয়া, ওই দিকে বার হয়ে চলো—এঃ, কি ভয়ানক জঙ্গল হয়ে গিয়েচে এদিকটা!

গয়ামেম ওর কথায় ভালো করে কর্ণপাত না করে বললে—আসুন খুড়োমশাই, বড়সায়েবের কবরটা দেখবেন না? আসুন। আলেন যখন, দেখেই যান—

পরে সে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। শিপ্‌টনের সমাধির ওপর টাটকা সন্ধ্যা-মালতী আর কুঠির বাগানের গাছেরই বকফুল চড়ানো। তা থেকে এক গোছা সন্ধ্যামালতী তুলে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বললে—ছান, ছড়িয়ে ছান।

আজ মরবার তারিখ সায়েবের, মনে আছে না? কত মুনভা খেয়েছেন এক সময়। ছান, দুটো উলুখড়ের ফুলও ছান তুলে টাটকা। ছান ওই সঙ্গে—

প্রসন্ন চক্কত্তি দেখলে ওর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে নতুন করে।

তারপর দুজনে কবরখানার ঝোপজঙ্গল থেকে বার হয়ে একটা বিলিতি গাছের তলায় গিয়ে বসলো। খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। দুজনেই দুজনকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে বেজায় খুশি যে হয়েচে সেটা ওদের মুখের ভাবে পরিস্ফুট। কত যুগ আগেকার পাষাণ-পুরীর ভিত্তির গাত্রে উৎকীর্ণ কোন্ অতীত সভ্যতার দুটি নায়ক-নায়িকা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেচে আজ এই সন্ধ্যারাত্রে মোল্লাহাটির পোড়ো নীলকুঠিতে রবসন্ সাহেবের আনীত প্রাচীন জুনিপার গাছটার তলায়। গয়া রোগা হয়ে গিয়েচে, সে চেহারা নেই। সামনের দাঁত পড়ে গিয়েচে। বুড়ো হয়ে আসচে। দুঃখের দিনের ছাপ ওর মুখে, সারা অঙ্গে, চোখের চাউনিতে, মুখের ম্লান হাসিতে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল গয়া।

—কেমন আছ গয়া?

—ভালো আছি। আপনি কনে থেকে? আজকাল আছেন কনে?

—আছি অনেক দূর। বাহাদুরপুরি। কাছারীতে আমীনি করি। তুমি কেমন আছ তাই আগে কও শুনি। চেহারা এমন খারাপ হোলো কেন?

—আর চেহারার কথা বলবেন না। খেতি পেতাম না যদি সায়েব সেই জমির বিলি না করে দিত আর আপনি মেপে না দেতেন। যদ্দিন সময় ভালো ছেল, আমারে দিয়ে কাজ আদায় করে নেবে বুঝতো, তদ্দিন লোকে মানতো, আদর করতো। এখন আমারে পুঁছবে কেডা? উল্টে আরো হেনস্থা করে, এক-ঘরে করে রেখেচে পাড়ায়—সেবার তো আপনারে বলিচি।

—এখনো তাই চলচে?

—যদ্দিন বাঁচবো, এর সুরাহা হবে ভাবচেন খুড়োমশাই? আমার জাত গিয়েচে যে! একঘটি জল কেউ দেয় না অসুখে পড়ে থাকলি, কেউ উঁকি মেরে

দেখে না। দুঃখির কথা কি বলবো। আমি একা মেয়েমানুষ, আমার জমির ধানডা লোকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায় রাত্তিরবেলা কেটে। কার সঙ্গে ঝগড়া করবো? সেদিন কি আমার আছে!

প্রসন্ন চক্কত্তি চুপ করে শুনছিল। ওর চোখে জল। চাঁদ দেখা যাচ্চে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে। কি খারাপ দিনের মধ্যে দিয়ে জীবন তার কেটে যাচ্চে। তারও জীবনে ঠিক ওর মতনই দুর্দিন নেমেচে.

গয়া ওর দিকে চেয়ে বললে—আপনার কথা বলুন। কদ্দিন দেখি নি আপনারে। আপনার ঘোড়া পালালো খুড়োমশাই, বাঁধুন—

প্রসন্ন চক্কত্তি উঠে গিয়ে ঘোড়াটাকে ভালো করে বেঁধে এল বিলিতি গাছটার গায়ে। আবার এসে বসলো ওর পাশে। আজ যেন কত আনন্দ ওর মনে। কে শুনতে চায় দুঃখের কাহিনী? সব মানুষের কাছে কি বলা যায় সব কথা? এ যেন বড্ড আপন। বলেও সুখ এর কাছে. এর কানে পৌঁছে দিয়ে সব ভার থেকে সে যেন মুক্ত হবে।

বললেও প্রসন্ন। হেসে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—বুড়ো হয়ে গিইচি গয়া। মাথার চুল পেকেচে। মনের মধ্যি সর্বদা ভয়-ভয় করে। উন্নতি করবার কত ইচ্ছে ছিল, এখন ভাবি বুড়ো বয়েস পরের চাকরিডা খোয়ালি কে একমুঠো ভাত দেবে খেতি? মনের বল হারিয়ে ফেলিচি। দেখচি যেমন চারিধারে, তোমার আমার রুক্ষু মাথায় একপলা তেল কেউ দেবে না, গয়া।

—কিছু ভাববেন না খুড়োমশাই। আমার কাছে থাকবেন আপনি। আপনার মেপে দেওয়া সেই ধানের জমি আছে, দুজনের চলে যাবে। আমারে আর লোকে এর চেয়ে কি বলবে? ডুবিচি না ডুবতি আছি। মাথার ওপরে একজন আছেন, যিনি ফ্যালবেন না আপনারে আমারে। আমার বাবা বড্ড সন্ধানডা দিয়েচেন। আগে ভাবতাম কেউ নেই। চলুন আমার সঙ্গে খুড়োমশাই। যতদিন আমি আছি, এ গরীব মেয়েডার সেবাযত্ন পাবেন আপনি যতই ছোট জাত হই।

এক অপূর্ব অনুভূতিতে বৃদ্ধ প্রসন্ন চক্কত্তির মন ভরে উঠলো। তার বড় সুখের দিনেও সে কখনো এমন অনুভূতির মুখোমুখি হয় নি। সব হারিয়ে

আজ যেন সে সব পেয়েচে এই জনশূন্য, পোড়ো কবরখানায় বসে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আচ্ছা, চললাম এখন গয়া।

গয়া অবাক হয়ে বললে—এত রাত্তিরি কোথায় যাবেন খুড়োমশাই?

—পরের ঘোড়া এনিচি। রাত্তিরিই চলে যাবো কাছারীতি। পরের চাকরি করে যখন খাই, তখন তাদের কাজ আগে দেখতি হবে। না যদি আর দেখা হয়, মনে রেখো বুড়োটারে। তুমি চলে যাও, অন্ধকারে সাপ-খোপের ভয়।

আর মোটেই না দাঁড়িয়ে প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়া খুলে নিয়ে রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলো। ঘোড়ার মুখ ফেরাতে ফেরাতে অনেকটা যেন আপন মনেই বললে—মুখের কথাডা তো বললে, গয়া, এই যথেষ্ট, এই বা কেডা বলে এ ছুনিয়ায়, আপনজন ভিন্ন কেডা বলে? বড্ড আপন বলে যে ভাবি তোমারে—

ষষ্ঠীর চাঁদ জুনিপার গাছের আড়াল থেকে হেলে পড়েচে মড়িঘাটার বাঁওড়ের দিকে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা ডাকচে পুরনো নীলকুঠির পুরনো বিস্মৃত সাহেব-সুবোদের ভগ্ন সমাধিক্ষেত্রের বনেজঙ্গলে ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে।···

ইছামতীর বাঁকে বাঁকে বনে বনে নতুন কত লতাপাতার বংশ গজিয়ে উঠলো। বলরাম ভাঙনের ওপরকার সোঁদালি গাছের ছোট চারাগুলো দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়ে ওঠে, কত অনাবাদী পতিত মাঠে আগে গজালো ঘেঁটুবন, তারপর এল কাকজঙ্ঘা, কুঁচকাঁটা নাটা আর বনমরিচের জঙ্গল, ঝোপে ঝোপে কত নতুন ফুল ফুটলো, যাযাবর বিহঙ্গকুলের মত কি কলকূজন। আমরা দেখেচি জলিধানের ক্ষেতের ওপরে মুক্তপক্ষ বলাকার সাবলীল গতি মেঘপদবীর ওপারে মৃণালসূত্র মুখে। আমরা দেখেছি বনসিমফুলের সুন্দর বেগুনী রং প্রতি বর্ষাশেষে নদীর ধারে ধারে।

ঐ বর্ষাশেষেই আবার কাশফুল উড়ে উড়ে জল-সরা কাদায় পড়ে বীজ পুঁতে পুঁতে কত কাশঝাড়ের সৃষ্টি করলো বছরে বছরে। কাশবন কালে সরে গিয়ে শেওড়াবন, সোঁদালি গাছ গজালো—তারপরে এল কত কুমুরে লতা, কাঁটাবাঁশ, বনচালতা। দুললো গুলঞ্চলতা, মটরফলের লতা, ছোট গয়ালে, বড় গোয়ালে। সুবাসভরা বসন্ত মূর্তিমান হয়ে উঠলো কতবার ইছামতীর নির্জন চরের ঘেঁটফুলের দলে···সেই ফাল্গুন-চৈত্রে আবার কত মহাজনী নৌকা নোঙর করে বেঁধে খেল বনগাছের ছায়ায়, ওরা বড় গাঙ বেয়ে যাবে এই পথে সুন্দরবনে মোমমধু সংগ্রহ করতে, বেনেহার মধু, ফুলপটির মধু, গেঁয়ো, গরান, সুঁদুরি, কেওড়াগাছের নব প্রস্ফুটিত ফুলের মধু। জেলেরা সলা-জাল পাতে গলদা চিংড়ি আর ইটে মাছ ধরতে।

পাঁচপোতার গ্রামের দু'দিকের ডাঙাতেই নীলচাষ উঠে যাওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বন্যেবুড়ো, পিটুলি, গামার, তিত্তিরাজ গাছের জঙ্গল ঘন হোলো, জেলেরা সেখানে আর ডিঙি বাঁধে না, অসংখ্য নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়িতে আর সাঁইবাবলা, শেঁয়াকুল কাঁটাবনের উপদ্রবে ডাঙা দিয়ে এসে জলে নামবার পথ নেই, কবে স্বাতী আর উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জল পড়ে ঝিনুকের গর্ভে মুক্তো জন্মাবে, তারই দুরাশায় গ্রামান্তরের মুক্তো-ডুবুরির দল জোংড়া আর ঝিনুক

স্তূপাকার করে তুলে রাখে ওকড়াফলের বনের পাশে, যেখানে রাধালতার হলুদ রঙের ফুল টুপটাপ করে ঝরে ঝরে পড়ে ঝিনুক-রাশির ওপরে।

অথচ কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায় আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বার বার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে। যে কত আশা করে কলাবাগান করেছিল উত্তর মাঠে, দোয়াড়ি পেতেছিল বাঁশের কঞ্চি চিরে বুনে ঘোলডুবরির বাঁকে, আজ হয়তো তার দেহের অস্থি রোদবৃষ্টিতে সাদা হয়ে পড়ে রইল ইছামতীর ডাঙায়। কত তরুণী সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দু'ধারে, ঘাটের পথে, আবার কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধার পায়ের দাগ মিলিয়ে যায়...গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খের আনন্দধ্বনি বেজে ওঠে বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, দুর্গাপূজোয়, লক্ষ্মীপূজোয়...সে সব [illegible]দের পায়ের আলতা ধুয়ে যায় কালে কালে, ধূপের ধোঁয়া ক্ষীণ হয়ে আসে। মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যু মাতাকে? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মত জীবনের পথে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে, কখনো বৃদ্ধের কাছে...তেলাকুচো ফুলের তুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে.. কানে আসে বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে। বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা টল টল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার [illegible] দেখতে পায় কেউ কেউ। কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐ সব মাঠ, ঐ সব নির্জন ভিটের ঢিপি—কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মুখের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো।

ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেছে লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।...

সমাপ্ত